মাঘোৎসবের উপদেশ

শিবনাথ শাস্ত্রী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা

১১ই মাঘের উপদেশাবলী

প্রথম প্রকাশ ১৩০৮

পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৬৩ মাঘ

এই সংস্করণের সম্পাদনা করিয়াছেন

শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ মিত্র

প্রকাশক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

মুদ্রক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস। ২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট ১

পরিশিষ্ট ২

মাঘোৎসবের উপদেশ

কৃষকের আশা

জগতের ধর্মপ্রবর্তক মহাজনগণের জীবনের একটি গূঢ় রহস্য এই, তাঁহারা মানব-সমাজের পাপতাপ যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এইরূপ সাধারণ মানুষকে করিতে দেখা যায় না। অথচ তাঁহারা মানবজাতির ভবিষ্যতের প্রতি যেরূপ আশা স্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ সাধারণ মানুষ পারে না। বলিতে কি, এই আশাই তাঁহাদের মহত্ত্বের বিশেষ লক্ষণ ও তাঁহাদের শক্তির প্রধান উৎস স্বরূপ ছিল। তাঁহারা যে বলিতেন, মানব-সমাজ একদিন পূর্ণ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা মানবের দুর্বলতা জানিতেন না বলিয়া নহে, কিন্তু তাহা এইজন্য যে, তাঁহারা মানবের বিবিধ দুর্বলতার মধ্যে আরো কিছু দেখিতেন বলিয়া। তাঁহারা দেখিতেন, মানব যে শাসনের অধীন তাহা ধর্মের শাসন, চরমে সে শাসন জয়যুক্ত হইবেই হইবে। এইজন্য এই সকল সাধুজনের চরিত্রে দুইটি ভাব একসঙ্গে দেখিতে পাই, বর্তমান দেখিয়া শোক ও ভবিষ্যতের জন্য আশা। একদিকে ক্রন্দন অপর দিকে আনন্দ। আমাদেরও দশা আজ যেন কতকটা সেই প্রকার দেখিতেছি। আজ আমাদেরও হৃদয়ে বিষাদ ও হর্ষ একত্র মিলিত হইতেছে।

ব্রাহ্মবন্ধু! তুমি যে রজনী প্রভাত হইতে না হইতে উৎসাহপূর্ণ অন্তরে ও প্রফুল্ল বদনে এইস্থানে সমাগত হইলে, তুমি অদ্য কি করিতে আসিয়াছ? তুমি কি কাঁদিবে বলিয়া আসিয়াছ না হাসিবার ইচ্ছাতে আসিয়াছ? দেশবিদেশ হইতে সমাগত প্রবীণগণ! আপনারা যে এত ব্যয় ও পথশ্রম করিয়া আসিলেন, আপনারা কি কাঁদিতে না হাসিতে আসিলেন? ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ! তোমরা যে প্রভাত না হইতেই গৃহকার্য ফেলিয়া আসিলে, তোমরা আজ কাঁদিবে না হাসিবে? যদি

আমাকে জিজ্ঞাসা কর আমি আজ কি করিব, তাহা হইলে বলি, আমি আজ কাঁদিব এবং হাসিব। শরৎকালে যেমন এক-একদিন আকাশের একদিকে রৌদ্র এবং অপরদিকে বৃষ্টি দেখিতে পাও, সেইরূপ আমিও আজ এক চক্ষে কাঁদিব ও অপর চক্ষে হাসিব। শিশু যেমন কাঁদিতে কাঁদিতে হাসে এবং হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া থাকে, আমিও আজ সেইরূপ হাসিকান্না মিশাইব। যদি জিজ্ঞাসা কর, সে কি প্রকার? যদি হাসিব তবে আবার কাঁদিব কেন? এবং যদি কাঁদিব তবে আবার হাসিব কেন? ইহার কিছু তাৎপর্য আছে।

একজন দরিদ্র কৃষকের বিষয় স্মরণ কর। সে ব্যক্তি যেখানে নিজ পর্ণকুটীরে বাস করিতেছে, চল সেই স্থানে যাই। এই ভারতের কৃষকের ন্যায় দরিদ্র কে আছে? তাহার গৃহে গিয়া কি দেখিতেছ? সেখানে দরিদ্রতার ভীষণ মূর্তি। উদরে অন্ন নাই, স্ত্রীপুত্রের গাত্রাবরণ নাই, গৃহে হয়ত আচ্ছাদন নাই। ইহার উপরে ধনীর দৌরাত্ম্য। তাহার পরিশ্রমের অন্ন সুখে উদরস্থ হয় না। প্রহারে, অত্যাচারে, উপদ্রবে তাহার চিন্তাকুল প্রাণ জর্জরিত হইয়া রহিয়াছে। বল দেখি, এই দৃশ্যের মধ্যে কি দেখিতেছ? সেখানে কি হাস্যের ছবি দেখিতেছ, না, ক্রন্দনের ছবি দেখিতেছ? সকলেই বলিবে, সেখানে ক্রন্দন, সেখানে অশ্রুপাত ও হাহাকার। কিন্তু প্রাতে সেই কৃষক যখন স্বীয় ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতেছে, তখন সেখানে গিয়া আর এক ছবি দর্শন কর। সে যখন আপনার ক্ষেত্রের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদু সমীরণে ঈষদান্দোলিত শস্যের অঙ্কুরগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তখন কোথা হইতে তাহার সেই চিরমলিন ঘন-বিষাদপূর্ণ মুখেও প্রসন্নতার উদয় হইল। সে চিত্রপুত্তলির ন্যায় হৃদয়ের প্রিয় শস্যক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে হাস্য করিতে

লাগিল। এই আর-এক ছবি দর্শন কর। এখানে তাহার হর্ষে বিষাদে মিশিল কিনা দেখ। আমাদেরও দশা কি অদ্য সেইরূপ নয়?

কৃষকের বর্তমানের দিকে দেখিলে যেরূপ অন্ধকার ও বিষাদ, সেইরূপ আমাদের নিজ নিজ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলেও শোকের সমাচার। আমাদের স্ব স্ব দুর্বলতা ও অপরাধ স্মরণ করিলে অশ্রুপাত করিতে হয়। অদ্য উৎসবের দিনে সেই অপরাধ ও দুর্বলতা স্মরণ করিতেছি, আমাদের অপদার্থতা প্রতীতি করিয়া বিষাদে ম্লান হইতেছি। দেখ তবে আমাদের বিষাদের কারণ রহিয়াছে। আবার হাস্যেরও কারণ আছে। ঐ যে এক পার্শ্বে ভাই ভগিনী মিলিয়া গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিলাম, ঐ দিকে যখন দৃষ্টিপাত করিতেছি, তখন দুঃখের মধ্যে সুখের উদয় হইতেছে। কৃষকের শস্যক্ষেত্রের ন্যায় ঐ স্থান আজ নয়ন-মনকে তৃপ্ত করিতেছে। বর্তমানের দিকে দেখিলে হয়ত চক্ষু আবরণ করিতে হয়; কিন্তু ঐ যে ভবিষ্যৎ কার্যের সূচনা করিলাম, ইচ্ছা হয় চারি চক্ষু পাইলে ঐ ভবিষ্যতের দিকেই চাহিয়া থাকি। ভবিষ্যতের রাজ্য ব্রহ্ম-কৃপার রাজ্য। ঐ দিকে চাহিলেই ব্রহ্মকৃপা স্মরণ হয়; ঐ রাজ্যে আমাদের ইচ্ছা যায়, কিন্তু চেষ্টা যায় না; আশা যায়, কিন্তু সামর্থ্য যায় না। সুতরাং ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন আর সহায় কি আছে? আজ যে কেবল আমাদের উৎসব-মণ্ডপের দ্বারে 'ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্' এই পতাকা উড়িতেছে তাহা নহে; কিন্তু আজ আমাদের প্রত্যেক হৃদয়ে উহার প্রতিধ্বনি হইতেছে। সমাগত ব্রাহ্মবন্ধু! আজ কি ব্রহ্মকৃপা বিশেষ রূপে স্মরণ করিতেছ না? আজ কি কৃষকের ন্যায় ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া প্রফুল্ল হইতেছ না? আজ কি আমাদের হৃদয়ে হর্ষ-বিষাদ মিশ্রিত হইতেছে না? ঈশ্বর করুন যেন আমাদের এই আশা ও আনন্দ সফল হয়।

১২৮৫

ঈশ্বরের প্রেমের সহিষ্ণুতা

কোনও স্থানে একজন ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার বিষয়-বিভব সুখসমৃদ্ধির অভাব ছিল না। তাঁহার একটিমাত্র পুত্রসন্তান ছিল। পুত্রটি যতদিন নিতান্ত শিশু ছিল, ধনী ততদিন তাহাকে আদরের সহিত লালনপালন করিতেন; তাহার যখন যে ইচ্ছা হইত, তাহা পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব হইত না। তাহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি ধনকে ধন বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। তাহার জন্য কত আয়োজন! তাহার জন্য কত দাসদাসী পরিজন! ধনিসন্তান পিতার আদর ও স্নেহের মধ্যে বর্ধিত হইয়া ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল এবং তাহার বিপথের সঙ্গীও জুটিতে আরম্ভ হইল। যতদিন সে শিশু ছিল, পিতা ততদিন তাহাকে আবশ্যকমত আদেশ উপদেশ তিরস্কার প্রভৃতি দ্বারা চালিত করিতেন, কিন্তু সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে প্রণালী পরিবর্তন করিয়া অপরবিধ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। তিনি একদিন সন্তানকে নির্জনে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রিয় পুত্র! তুমি এখন আর শিশু নও, যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছ; তোমাকে আর শিশুর ন্যায় ব্যবহার করা আমার পক্ষে উচিত নয়। আমি অদ্যাবধি তোমার সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিব। আর তোমার স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইব না। তোমার প্রবৃত্তিসকলকে বলপূর্বক বাধা দিব না, তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বে বলপূর্বক তোমাকে কোনও কার্যে রত করিব না, তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বে তোমাকে কোনও পথে চলিতে বলিব না। তুমি স্বাধীনভাবে কার্য কর। কিন্তু পুত্র, একটি বিষয়ে সাবধান থাকিও; আমি যখন অদ্যাবধি মিত্রভাব অবলম্বন করিলাম, তুমিও মিত্রের ন্যায় হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিও। আশা করি,

যে কার্যে আমাদের বংশের অগৌরব হয়, আমাদের কুলে কলঙ্ক পড়ে, এমন কার্যে তুমি লিপ্ত হইবে না। তুমি আমার একমাত্র সন্তান, তোমার দ্বারা যদি আমার মুখ ম্লান হয়, আমি তোমাকে বিরক্তির কথা বলিব না, কিন্তু নিশ্চয়ই জানিও যে, আমি মর্মান্তিক ক্লেশ পাইব, আমার প্রাণে ব্যথা লাগিবে। যাও পুত্র, যাও, তুমি স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার কর। এ ধনসম্পদ তোমার, এ প্রাসাদ তোমার, এ বিষয়-বিভব তোমার।”

ধনী এই বলিয়া পুত্রকে বিদায় করিলেন। কিন্তু হায়! যৌবনের চপলতা -বশত পিতার সে সদুপদেশ সে যুবকের মনে অধিকদিন স্থানপ্রাপ্ত হইল না। সে কুসঙ্গীদিগের প্ররোচনায় আবার অল্পে অল্পে সে সমুদয় বিস্মৃত হইল। পিতা তাহাকে আর তিরস্কার করেন না; কেবল মধ্যে মধ্যে উপদেশ- ও পরামর্শচ্ছলে আপনার মনের ক্লেশ জানাইয়া থাকেন। ইহাও সেই উদ্ধত যুবকের পক্ষে ভার-স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। পিতা আর তাহাকে তিরস্কার করেন না সত্য, কিন্তু তিনি যে বাটীতে আছেন, ইহাতেও তাহার স্বচ্ছন্দে আমোদপ্রমোদ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। অবশেষে সেই ধনি সন্তান পিতৃভবন ত্যাগ করাই কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করিল। পিতার বিষণ্ন মুখ ও গম্ভীর ভাব আর সে সহ্য করিতে পারে না; তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ উপদেশও আর সে বহন করিতে পারে না; যে দেশে গেলে আর পিতার মুখ দেখিতে হইবে না, যে দেশে অবাধে ও অকুণ্ঠিতভাবে আমোদপ্রমোদে রত হওয়া যায়, যেখানে দুরাচার দেখিয়া মুখ বিষণ্ন করিবার লোক নাই, মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিবার কেহ নাই, তখন এরূপ দেশের জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইতে লাগিল।

অবশেষে নিশীথকালে একদিন সে গৃহত্যাগ করিবার সংকল্প করিল।

যৌবনের ঔদ্ধত্য এত যে, সে কোথায় যাইবে, কি খাইয়া থাকিবে, বিদেশে কিরূপে চলিবে, এ সকল চিন্তাও তাহার হৃদয়ে একবার উদিত হইল না। মধ্য রাত্রে সমুদয় বসুমতী যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পরিজন যখন নিদ্রিত, রাজপথে যখন জনপ্রাণীর সঞ্চার নাই, সেই ধনিসন্তান এরূপ সময়ে জাগ্রত হইয়া পিতার গৃহ ত্যাগের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। দ্রব্যসামগ্রী অধিক লইলে পথে যাইতে অসুবিধা, সুতরাং সে একবস্ত্র হইয়াই গৃহ ছাড়িল।

ধনীর দ্বারে দ্বারবান সর্বদা জাগ্রত, যুবাপুরুষ দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বাররক্ষী পুরুষ জানিতে পারিল এবং তাহার গতিরোধ করিতে লাগিল। পিতার দাসদাসীর দ্বারা গতিরোধ হয় ইহা গর্বিত সন্তানের প্রাণে কখনই সহ্য হয় না, সে ক্রুদ্ধ হইয়া দাসদাসীদিগের প্রতি তর্জন-গর্জন আরম্ভ করিল। তখন দ্বারবান তাহাকে দ্বারে দণ্ডায়মান রাখিয়া অবিলম্বে স্বীয় প্রভুর আদেশ জানিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিল। পিতা বলিলেন, "আমি আমার পুত্রের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব আমি আজ তাহাকে বাধা দিব না। আমার একমাত্র পুত্র আজ গৃহ ছাড়িয়া যায়, আমি বুঝিতেছি; আমার মর্মস্থানে আজ ব্যথা লাগিতেছে, কিন্তু আমি বাধা দিব না। দাও, তাহাকে যাইতে দাও। আমার এই দুঃখ রহিল, নিরপরাধে পুত্র আমাকে অত্যাচারী পিতার ন্যায় ত্যাগ করিয়া গেল।"

দ্বারবান আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ধনিসন্তান গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উল্লসিত অন্তরে যেদিকে দৃষ্টি যায় সেই দিকে চলিল। কোথা যায় জানে না—কিন্তু নূতন স্থানে যাইব, নূতন আনন্দ লাভ করিব, এই আশাতেই প্রধাবিত হইল।

ঈশ্বরের প্রেমের সহিষ্ণুতা

ক্রমে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। সে ক্রমাগত পথ চলিতেছে। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। ধনীর সন্তান কখনও পথশ্রম স্বীকার করে নাই, সুতরাং অল্প বেলা বাড়িতে না বাড়িতে তাহার শরীর অবসন্ন ও চরণদ্বয় ক্লান্ত হইয়া আসিতে লাগিল; তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল; ক্ষুধায় শরীরের বল ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন যুবকের মনে কোনও স্থানে আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করিবার বাসনা উদিত হইল। ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অদূরে পথপ্রান্তে একখানি দোকান দৃষ্ট হইল। আশ্রয় লাভের আশায় উপস্থিত হইবা-মাত্র উক্ত গৃহের প্রভু অতি সমাদরে অভ্যর্থনা পূর্বক তাহাকে গ্রহণ করিল এবং ক্লান্তি নিবারণ করিয়া, ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিল। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর যুবাপুরুষ আবার বহির্গত হইল এবং ক্রমাগত চলিতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি উপস্থিত, পুনরায় আশ্রয়ের প্রয়োজন; পুনরায় উত্তম আশ্রয় জুটিয়া গেল। এক গ্রামে উপস্থিত হইবামাত্র কয়েক ব্যক্তি অতি সমাদরে তাহাকে একটি সুন্দর গৃহে লইয়া গেল। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, তন্মধ্যে সুন্দর সুকোমল শয্যা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসকল প্রস্তুত। পান-ভোজন সমাধা করিয়া যুবক সুনিদ্রায় সেই স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

পরদিন প্রাতে চলিতে চলিতে একটি নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত। নদী উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই। ধনিসন্তান চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমন সময়ে হঠাৎ একখানি নৌকা আসিয়া উপস্থিত। তাহারা অতি সমাদরে তাহাকে পার করিয়া দিল। এইরূপে অনেক গ্রাম, জনপদ, নদনদী উত্তীর্ণ হইয়া সেই উদ্ধত যুবক অবশেষে কোন-এক নূতন দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে একদিন আমোদপ্রমোদের তরঙ্গের মধ্যে হঠাৎ তাহাদের গৃহের চিরপরিচিত প্রাচীন ভৃত্যকে নিজের পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। মানবের ভালবাসার স্বভাবই এইরূপ যে, বহুদিনের পর চিরপরিচিত প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিলে হৃদয় সহসা নবভাব প্রাপ্ত হয়। ধনিসন্তান বাল্যকালে ঐ প্রাচীন ভৃত্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিল; তাহার ক্রোড়ে বসিয়া অশন, তাহার শয্যাতে শয়ন ও তাহার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া কত দিন কাটাইয়াছে। এতদিন আর তাহার পিতার কথা বা পিতার ভৃত্যের কথা মনে ছিল না। অদ্য হঠাৎ তাহার মুখ-দর্শনমাত্র যেন সকল কথা যুগপৎ তাহার স্মরণ হইল; সুকোমল বাল্যকালের মনোহর চিত্রসকল মনে পড়িতে লাগিল; পিতার স্নেহ ও উদার ভাব হঠাৎ স্মৃতিপথে উদিত হইল; সে আর শোকের বেগ ধারণ করিতে সক্ষম হইল না। অধোবদনে জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক লুকাইয়া বিন্দু-বিন্দু অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে কিরূপে এলি? আমার পিতা ভাল আছেন ত? আমি বাহির হইয়া আসিলে তিনি কি বলিলেন? তিনি কি মনে বড় ক্লেশ পাইয়াছেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল, "কুমার! যে দিন হইতে আপনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন, সে দিন হইতে আপনার পিতা আমাদিগকে আর সুস্থির হইতে দেন নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আপনার স্বাধীনতার প্রতি হস্তার্পণ করিবেন না; সুতরাং আপনাকে তিনি নিষেধ করেন নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত হইতেই তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া এই আদেশ করিয়াছেন, 'ওরে আমার ভৃত্যগণ, যে যেখানে আছিস, শীঘ্র আমার সন্তানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হ। দেখিস যেন আমার

একমাত্র সন্তান পথে ক্লেশ না পায়। সাবধান, বলপ্রকাশ করিস না, রুক্ষ ভাব ধারণ করিস না, তাহার কোমল অঙ্গে ব্যথা দিস না, তাহার মনের বিরক্তি বৃদ্ধি করিস না। সে যেখানে যায়, দূরে দূরে প্রহরীর ন্যায় থাকিস এবং পথের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিস।' কুমার! আপনি প্রথম দিবসে পথশ্রান্ত হইলে যে ব্যক্তি আপনাকে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিয়াছিল, সে আপনারই পিতার আদেশ-ক্রমে দিয়াছিল। রাত্রিকালে যে গৃহে আপনি পরিশ্রান্ত মস্তক রাখিয়া-ছিলেন, সে গৃহ আপনারই পিতার অনুমতিতে সজ্জিত হইয়াছিল। পরদিন নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় যে নৌকা দেখিয়াছিলেন, তাহা আপনারই পিতার অনুমতিক্রমে আনীত হইয়াছিল। আমরা প্রহরীর ন্যায় আপনার দূরে দূরে ফিরিতেছি ও কবে আপনার সুমতি হয় তাহার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছি।"

শুনিতে শুনিতে ধনীর পুত্র চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "পিতার বিশ্বাসী ভৃত্য, আমার সুমতি হইবার দিনের অপেক্ষায় আছ? আজি হইতে আমার সুমতি হইল। আমাকে ঘরে লইয়া চল। আজ যে পিতার সেই মুখ স্মরণ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! আমি নিরপরাধে এমন উদার পিতার গৃহ ছাড়িলাম কেন? সুখের কোলে পালিত হইয়া আমি সাধ করিয়া দুঃখের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় আত্মসমর্পণ করিলাম কেন? ওরে চল্, শীঘ্র আমাকে লইয়া চল্, এ দেশ যে আমার পক্ষে বিষসমান হইয়া পড়িল। তোরা আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চল্, যে স্বাধীনতাতে আমার সর্বনাশ হইয়াছে আমার সে স্বাধীনতা চূর্ণ করিয়া লইয়া চল্। হায়, আমি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়াছিলাম, আজ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতে হইল।"

অনেক ঈশ্বর-সন্তানের এরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর দুরন্ত রাজা

নন, অত্যাচারী পিতা নন। তাঁহার যে শাসন তাহা স্নেহানুরঞ্জিত ও উদার শাসন। তিনি সন্তানের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হন না, কেবল উপদেশ ও আদেশ দ্বারা সস্নেহ ভাবে সন্তানকে সুপথে থাকিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। সে উপদেশও অনেকের সহ্য হয় না। তাহারা বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরের ঘর ছাড়িয়া যায়। বাস্তবিক কেহই ঈশ্বরের একমাত্র সন্তান নয়; কিন্তু পাপী যখন ঈশ্বরের গৃহ ত্যাগ করে, তখন তাহার উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের যেরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বোধ হয় যেন সেই পাপীই ঈশ্বরের সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী ও একমাত্র সন্তান এবং তাহার অভাবে তাঁহার স্বর্গধামের সকল আয়োজন যেন বৃথা হইয়া যাইবে। সন্তান যখন ঈশ্বরের গৃহ ছাড়িল, ঈশ্বর তখন কি করিলেন? তিনি আপন পরিবার ও পরিজনকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "তোমরা যে যেখানে আছ, শ্রবণ কর, আমার এই সন্তান না ফিরিলে আমি ছাড়িব না। তোমরা সকলে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হও, দূরে দূরে থাকিও, প্রহরীর ন্যায় কার্য করিও, ক্ষুধার সময় অন্ন, তৃষ্ণার সময় জল দিয়া প্রাণরক্ষা করিও, সংকটে পড়িলে উদ্ধার করিও, যেন আমার সন্তান মারা না যায়। আমার দ্রব্য জানিলে যদি গ্রহণ না করে এজন্য প্রচ্ছন্নভাবে সেবা করিও। আমার কি ক্ষমতা নাই যে সন্তানকে বন্দী করিয়া রাখি? আমার কি শক্তি নাই যে দুর্বৃত্ত পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করি? কিন্তু আমি তাহা করিব না, যে প্রেম সন্তান আপনা হইতে না দিবে আমি তাহা লইব না; কিন্তু আমার সন্তানকে উদ্ধার করা চাই।"

এই বলিয়া তিনি কত দিকে কত চর প্রেরণ করিলেন। বৃক্ষের অন্তরালে, নদীর জলে, রাত্রির অন্ধকারে, পুষ্পের কাননে, তাঁহার শুভ ইচ্ছাকে দূতস্বরূপ করিয়া পাপীর উদ্ধার-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া

দিলেন। পাপীর নরকে গিয়াও নিস্তার নাই, ঈশ্বরের প্রাণপ্রদ ইচ্ছা সেখান পর্যন্তও গমন করে। তবে আর ছুটাছুটি কেন? যেখানে যাও, ঈশ্বরের দুর্বিনীত সন্তান, ঈশ্বরের প্রাঙ্গণ ব্যতীত আর স্থান নাই। সন্তানের চরণ যদি প্রাঙ্গণের প্রান্ত পর্যন্ত যায়, মাতার চরণ যে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে পারে। ধৃত হওয়া ভিন্ন যদি গত্যন্তর না থাকে, তবে বৃথা পলায়নের চেষ্টা একেবারে চলিয়া যাউক। যে স্বাধীনতার জন্য নয়নের জল ফেলিতে হয়, তাহা চূর্ণ হউক। গৃহের বাহির হইলে যদি কাঁদিয়া ফিরিতে হয়, তবে বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তি নিরস্ত হউক।

১২৮৬

সমর্পণ

কোনও পরিবারের জননী একদা প্রাতঃকালে উঠিয়া সন্তানদিগকে ডাকিয়া উপাদেয় দ্রব্য কিছু কিছু প্রদান করিলেন, তাহা লইয়া তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইল। তাহাদের আনন্দ-কোলাহলে গৃহপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে মা আবার সকলকে ডাকিলেন। প্রথমে একটি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক শিশুকে বলিলেন, "দাও দেখি তোমার ঐ ফলটি।" শিশু মার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি, যদি মা আবার চাহিয়া লইবেন, তবে দিলেন কেন ? মা জিদ করিতে লাগিলেন, তখন কি করে অগত্যা মাকে নখে কাটিয়া একটু দিল। মা বার বার চাহিতে লাগিলেন, শিশু কিছু কিছু দিতে লাগিল, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, মা কি স্বার্থপর! যাহারা বড় ছিল তাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা বলিল, "চল ভাই পালাই, এখানে থাকিলে মা সব কাড়িয়া লইবেন।" এই বলিয়া অধিকবয়স্কেরা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মা আবার আর একটি শিশুকে ডাকিলেন, সেও তেমনি ভাবে নখে কাটিয়া অল্প অল্প দিতে লাগিল।

অবশেষে মাতা সর্বকনিষ্ঠ শিশুর নিকট চাহিলেন। চাহিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া জননীর হাতে ফলটি ধরিয়া দিল। তাহার নাকি স্বার্থপরতা পাকে নাই—মায়ের প্রতি ভালবাসা আছে, তাই সে সব দিল। মা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন, আহ্লাদে দুই হস্ত পূরিয়া ফল দিলেন। ক্ষুদ্র হাতে ফল ধরিল না, অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন।

যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা আসিয়া দেখে, সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে মা হাত পূরিয়া সুমিষ্ট ফল দিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইল,

বলিল, "মা, এ কি তোমার অন্যায় ব্যবহার? কোথায় তুমি সকলকে সমান ভালবাসিবে, না তুমি তোমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তানকে বেশি ভালবাসিয়া ইহার হাতে ফল পুরিয়া দিয়াছ? আর আমাদিগকে এক-একটি ফল দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছ।" মা বলিলেন, "ওরে স্বার্থপর সন্তানগণ, এ কি আমার অন্যায় ব্যবহার? পাছে তোদের হস্ত হইতে চাহিয়া লই এই ভয়ে তোরা পরের বাড়ি চলিয়া গেলি, আবার কথা বলিতেছিস?"

ভাবিয়া দেখিলে পরম প্রভুর সহিত আমাদের যে ব্যবহার তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন, "দাও, আমার প্রদত্ত প্রীতি আমায় দাও।" আমাদের এত পাষণ্ডতা যে, পাছে তাঁহাকে দিতে হয় এই ভাবিয়া পরের বাড়ি সংসারে পলায়ন করি। বলি, "চল, এখানে থাকার প্রয়োজন নাই। ঐ 'দাও' বলিয়া জগন্মাতা ডাকিতেছেন, চল, পলায়ন করি।"

ভাল, ইঁহার এইরূপ ব্যবহারের অর্থ কি? ইনি ভালবাসা দিলেন কেন? দিলেন ত আবার ফিরিয়া চান কেন? তিনি কি আমাদিগকে পশুর মত করিয়া রাখিতে পারিতেন না? পারিতেন বই কি, কিন্তু তিনি যে সে প্রীতি চান না যাহা স্বাধীনভাবে দেওয়া না হয়। তাই তিনি প্রীতি ও স্বাধীনতা দুইই দিয়াছেন।

তাঁহার যে সকল সন্তান বিষয়ের ঘরে লুকাইয়া আছে তাহারা বলিতেছে, "ভাই, ও পথে যাস নে, যদি প্রীতি দিতেই হবে তবে সংসারে অনেককে দিবার আছে, উনি যদি কেড়ে নেন?" যাঁহারা সংসারী তাঁহারা গর্ব করিয়া বলিতেছেন, "দেখ আমরা কি সুচতুর, ও পথে যাই না, যাহারা নির্বোধ তাহারাই ওখানে গিয়া থাকে।" তাই সংসারী বুদ্ধিমান্ সন্তান হইয়া জননীর কথার উত্তর দিল না, মার ডাক

শুনিল না। ধন্য তিনি, যিনি মাতার ক্ষুদ্র শিশুর মত যাই ঈশ্বর বলেন "তোমার প্রাণটি দাও" অমনি "এই লও আমার প্রাণমন" বলিয়া তাহার হস্তে সকল সমর্পণ করেন।

আজ মহোৎসবের দিন বল দেখি, ভ্রাতা-ভগিনি! বল দেখি নখে কাটিয়া দিয়া জগজ্জননীকে বিদায় করিতে চাও কিনা? নখে কাটিয়া দিলে হইবে না। সমস্ত দিলে কি ক্ষতি হয়? কখনই না। এই বড় যন্ত্রণার কথা রহিল যে, আমরা আমাদের হৃদয়নাথকে হৃদয় দিতে পারিলাম না। কাড়িয়া লইবার ভয়ে আমরা সংসারে লুকাই—পাছে ঠকি, পাছে ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু তাঁহাকে প্রাণমন দিলে কি ক্লেশ পাইতে হয়? না, ক্লেশ পাইতে হয় না, একগুণ দিলে যে দশগুণ পাওয়া যায়, ইহা কি দেখিতেছ না? এই যে সুন্দর ঘর পাইয়াছ কিসের গুণে? সামান্য ভাবে একবার পিতা বলিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজল ফেলিয়াছিলে, তাহারই পুরস্কারস্বরূপ, দেখ, এই দেখ, পিতা কি দিয়াছেন! এখনও যে তাঁহার দিবার আছে, তাঁহার দানের কি শেষ আছে? যখন সমুদায় প্রাণ—একাংশ নয়, দশাংশ নয়—সমস্ত হৃদয় তাঁহাকে দিব, তখন তাঁহার হইব। এখনও তাঁহার হই নাই। "তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন আমি হে" এই গান ত আমরা এখনও গাইতে পারি না। আমরা কতক যে মান-সম্ভ্রমের, কতক সংসারের, কতক বন্ধুবান্ধব ও স্ত্রীপুত্রের। ঈশ্বর দশ-ভাগের একভাগী হইয়াছেন। এস ভাইভগিনীগণ, প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে পাপ-মলিনতা রাখিব না। তাহা হইলে তাঁহাকে উপহাস করা হইবে। জীবন-সর্বস্ব তাঁহাকে প্রদান করিব, তাঁহার চরণে চিরদিনের জন্য মনপ্রাণ বিকাইব। দীনবন্ধু বিশেষ ভাবে আমাদের সহায় হউন।

১২৮৭

পোষা পাখি ও বনের পাখি

বালককালে অনেক যত্নে একটি পাখি পুষিয়াছিলাম। সে যতদিন শিশু ছিল, উত্তম তণ্ডুল ও জল সংগ্রহ করিয়া মাতা যেমন সন্তান পালন করে সেইরূপ যত্নে তাহাকে পালিতাম। ঈশ্বর-কৃপায় পাখিটি বড় হইল, উঠিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইল, আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। নড়িয়া চড়িয়া কাজ করি, আর পাখি কি করিতেছে তাহাই দেখি। পাখিটি যত বড় হইতে লাগিল আমার আহ্লাদ ততই বাড়িতে লাগিল। যখন চঞ্চুপুটে খাইতে শিখিল, অমনি আনন্দে দৌড়িয়া গিয়া পল্লীর সকলকে এ সুখ-সংবাদ দিলাম।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে পাখিটির অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদিত হইল। সকলে দেখিয়া বলিল, এ পাখির জাত ভাল, খুব কথা বলিবে। ক্রমে সে কথা বলিতে শিখিল। পাখি নিজের মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়া মানুষের ডাক ডাকিতে লাগিল। বাড়ির শিশুরা যে কথা বলিত তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া অপূর্ব সুখে কর্ণকুহর ভাসাইল। পাখিটির উপর প্রাণের ভালবাসা গেল, তাহাকে কত যত্ন করিতে লাগিলাম, মানুষ মানুষের এত যত্ন করে না। সন্ধ্যার সময় অতি যত্নে বস্ত্র দ্বারা পিঞ্জর আবরণ করিতাম, রাত্রে উঠিয়া দেখিতাম, পাখির কোনও বিপদ হইয়াছে কিনা।

এমন করিয়া তাহার সেবা চলিতেছে, কিন্তু তবু দুষ্ট পাখি পোষ মানিল না। একদিন অসাবধানতাবশত পিঞ্জর-দ্বার খোলা ছিল, এই সুযোগে আমার দুষ্ট প্রিয় পাখিটি পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া বৃক্ষশাখে উঠিয়া বসিল। পিঞ্জর শূন্য দেখিয়া আমারও প্রাণ শূন্য হইল। দুর্দান্ত দস্যু মাতার অঙ্ক হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইতে জননীর প্রাণ যেরূপ হয়, আমারও সেই দশা হইল। 'আয় আয়' বলিয়া কত ডাকিলাম, সে যেন বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দিতে লাগিল, নামিল না।

তণ্ডুল আনিলাম, জল আনিলাম, শূন্য পিঞ্জর দেখাইলাম, কিছুতেই সে নামিল না।

এমন সময়ে একটি বনের পাখি আসিয়া সেই শাখায় বসিল, কোনও বুলি বলিল না, অথচ যাই সে বনপাখি উড়িল অমনি আমার পাখিও উড়িয়া চলিল। কই, বনরাজ্যের কোনও সুসমাচার ত বলিল না, সেখানকার প্রমুক্ত বায়ু, বৃক্ষলতার সুশ্যাম সৌন্দর্য, স্বাধীনতার মাধুর্য, কিছুই ত বলিল না, তবে কি প্রলোভনে আমার এতদিনের পাখি উড়িয়া গেল? পাখি ক্রমে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। আমার চক্ষু আর পৃথিবীতে নাই, বৃক্ষের ডালে। পাখি যেখানে গেল, আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। তাহার পর আরও দশ-বারটি পাখি আসিয়া আমার পাখিকে ঘেরিয়া বসিল, মহা আনন্দে কোলাহল উঠাইয়া দিল। এবার সে যে উড়িল, আর তাহাকে দেখা গেল না। কেহ তাহার উদ্দেশ বলিতে পারিল না। আমি রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, শূন্য পিঞ্জর নিকটে রাখিয়া কত কাঁদিলাম।

যাও, দেখ যাইয়া সংসারে, অনেক পিতামাতার পিঞ্জর শূন্য করিয়া কে যেন দুষ্ট পাপী সন্তানকে উড়াইয়া ব্রহ্মরাজ্যে লইয়া গিয়াছে। এক সূত্রধর-তনয় অপর দশজনের ন্যায় এই পৃথিবীতে ছিল, কোথা হইতে এক সাধু আসিলেন, কি মন্ত্রণা দিলেন, সে অমনি সংসার ছাড়িল। যাহারা যত্ন করিয়া লালনপালন করিয়াছিল, ভবিষ্যতের জন্য কত আশা করিয়া ছিল, তাহাদের না হইয়া সে উড়িয়া গেল। তাহার পিতামাতা বন্ধুবান্ধব কত কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু সে উড়িয়া গেল। বনের পাখি, ঈশ্বরের মুক্তি-কাননের পাখি, যাহারা মধুর গান করে, তাহারা মধ্যে মধ্যে এমনি করিয়া এই সংসারের পাপীদিগকে উড়াইয়া থাকে। এমনি করিয়া যীশু ও চৈতন্য অনেক পাপীকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

কি আকর্ষণে উড়াইয়া লইয়াছিলেন? কথার আকর্ষণে? না, তাহা নহে। যেমন বনের পাখি কথা না বলিয়া আমার পাখিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল, ইঁহারাও ঠিক তেমনি করিয়া পৃথিবীর পাপীদিগকে উড়াইয়া লইয়াছিলেন। যে সকল ধর্মাত্মার কথা আমরা জানি, তাঁহারা নরনারীর প্রাণের কপাট খুলিয়া দিতেন, আর তাহার মধ্যে অভূতপূর্ব আলোক আসিয়া প্রবেশ করিত।

এ পাখি বড় ডাকে না, যে পাখি মুক্তির আস্বাদন করে, তাহার দুই একটি কথাতেই সর্বনাশ! তাঁহারা ভাইএর মত পাপীদের পার্শ্বে উপবেশন করেন, নিমেষে মনপ্রাণ হরণ করেন, আর উড়াইয়া লইয়া যান। কি মন্ত্র তাঁহারা দেন? দেখামাত্র যে উড়িয়া যায়, কি আকর্ষণে? বনের পাখি আসিয়া স্বাধীনতার মাধুর্য ও স্ফূর্তি প্রকাশ করিল, আমার পাখি স্বাধীনতার আস্বাদ পাইল, আর ফিরিবে কেন? পলায়ন করিল। পৃথিবীর সাধুগণ যখন পাপীদিগকে উড়াইয়া লইয়া যান, তখন তাহাদিগকে স্বাধীনতার সংবাদ দেন। ঈশ্বরকে পাইলে আত্মার কিরূপ স্বাধীনতা, কিরূপ নির্মুক্ত ভাব, তাহা প্রদর্শন করিয়া মনপ্রাণ হরণ করেন। তাঁহারা পাপীর কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে বলেন, "হে পৃথিবীর ভাই, তোমার চক্ষে জল কেন? তুমি কি মুক্তি পাইতে চাও? তবে এস।" আর মুক্তির আশায় পাপী উড়িয়া যায়।

আমার পাখিটি যখন উড়িয়া চলিল তখন আর দশ-বারটি পাখি যেমন তাহাকে ঘেরিয়া কত আনন্দ-কোলাহল করিয়াছিল, তেমনি যখন একজন লোক পাপের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হয় অমনি সাধুদের মধ্যে আনন্দ-কোলাহল উঠে। একটি ভাই জন্মিল বলিয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। যখন আমাদের গৃহে সন্তান জন্মে তখন কত আমোদ-আহ্লাদ হয়, যাহারা দীন-দরিদ্র তাহাদের গৃহেও

তখন কেমন প্রফুল্ল ভাব দেখা যায়। তেমনি যদি একজন পাপী ঈশ্বরের রাজ্যে গমন করে, সাধুদের কত আহ্লাদ হয়। এই আনন্দ দেখিলে পাপী কি আর গৃহে ফিরিতে পারে? এইরূপে সাধুজন পাপ-পথ হইতে কত লোককে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাপীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া চিরদিনের মত সুখী করিয়াছেন। মুখের স্ফুরিত মাধুর্যে তাঁহারা মনপ্রাণ হরণ করিয়াছেন।

যখন পাপী মুক্তির আস্বাদ পাইয়া উড়িয়া যায়, তখন লোকে শূন্য পিঞ্জর দেখায়, "এই তোমার বিষয়-বিভব ফেলিয়া তুমি কোথায় যাও" বলিয়া কতরূপে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে আর ডাক শুনে না, সে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, আর তাহার তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কদর্য ভাষা ভুলিয়া যায়, স্বর্গের ভাষা বলিতে শিখে। পিতামাতা ক্রন্দন করেন, বন্ধুবান্ধব ক্ষুব্ধ হয়, সকলে জিজ্ঞাসা করে, সে কোথায় গেল? কিন্তু সে রাজ্য হইতে কেহ আর তাহার সংবাদ লইয়া আসে না। সে এখন ব্রহ্মের উদ্যানে বিচরণ করে, ব্রহ্মতরুতে উড়িয়া বসে। সংসারের লোক কাঁদ, সে আর ফিরিবে না।

এমনি বন্দী হইতে কে চাও বল দেখি? অমৃত-ফলের আস্বাদন করিয়া কে বাঁচিতে চাও বল দেখি? স্বর্গের ফুল যেখানে প্রস্ফুটিত হয় সেখানে কে যাইতে চাও বল দেখি? পাপী যদি কেহ থাক সেখানে উড়িয়া যাও। ঐ শোন, দূর হইতে সাধুদের কণ্ঠধ্বনি আসিতেছে। শোন, শোন, উড়িয়া যাও, যেখানে পবিত্রতার বাতাস সেখানে চলিয়া যাও। পৃথিবীর পাপ ঘৃণা কর। আমরা তাঁহার উদ্যানের দিকে চল উড়িয়া যাই।

১২৮৮

নবজীবন

শাক্যসিংহের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি যখন সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বীয় পিতার রাজপুরী ত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি রাজভবনকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন, "ওরে রাজপুরী, যে ঘোরতর সমস্যার মীমাংসার জন্য প্রাণ আকুল, যদি তাহার সদুত্তর প্রাপ্ত হই, যদি মানবকে রোগ শোক জরা মৃত্যুর যাতনা হইতে মুক্ত করিবার কোনও পথ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আবার আসিব, তোকে মুখ দেখাইব, তদ্‌ভিন্ন এ মুখ আর দেখাইব না।"

এই প্রতিজ্ঞা তাঁহার মনে ছিল। তিনি যখন দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং যখন তাঁহার সমস্যার মীমাংসা হইল, যখন তিনি অবশেষে স্বীয় ধর্ম প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন, তখন তিনি বহুকালের পর পুনরায় কপিলাবস্তু নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি সশিষ্যে নগরপ্রান্তে উপবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে প্রতিদিন বহুলোকের জনতা হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতে বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ সংবাদ মহারাজ শুদ্ধোদনের নিকট নীত হইলে তিনি আপনাকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিলেন। ত্বরায় পুত্রের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র, তোমার এ কি ব্যবহার? তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে বংশে কে কবে এরূপ ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ করিয়াছে?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাতে আমার পূর্বপুরুষগণ সকলেই অপরের প্রদত্ত সামান্য দ্রব্যের দ্বারা উদর পূরণ করিতেন, তাঁহারা সকলেই ভিক্ষুক ছিলেন।"

রাজা কুপিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রপিতামহ পিতামহ প্রভৃতি কাহাকে কবে ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করিতে শুনিয়াছ?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন "মহারাজ! আপনি কুপিত হইবেন না। আমি রাজবংশে জন্মের কথা বলিতেছি না। আমি দিব্যজ্ঞান লাভের পর নবজন্ম লাভ করিয়া যে সাধুদিগের বংশে জন্মিয়াছি, সে বংশের পূর্বপুরুষগণ সকলেই নিঃস্ব ও ভিক্ষুক ছিলেন।"

বিষয়াসক্ত ও উত্তেজিত রাজা বোধ হয় এই মহা উক্তির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বুদ্ধের উক্তি উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায়। এইরূপ যখনই পৃথিবীর পাপিগণ নবজীবন লাভ করিয়াছে, তখনই সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে উন্মত্ত বাতুল প্রভৃতি শব্দে উপহাস করিয়াছে।

যদি পাপী ঈশ্বরকে ডাকিয়া নবজীবন লাভ না করে, তাহা হইলে তাঁহার শক্তি যে পাপীর পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার কোনও প্রমাণ থাকে না। নবজীবনই তাঁহার শক্তি ও করুণার প্রধান পরিচায়ক। যখন পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া উপাসক আর-এক প্রকার হইয়া যান তখনই প্রমাণ হয় যে, সত্যস্বরূপের আধ্যাত্মিক উপাসনাতে কিছু আছে।

ব্রহ্মের উপাসকগণ, তোমাদের জীবনে কি নবজীবনের লক্ষণ-সকল প্রকাশ পাইতেছে? সংসার-রাজ্যে মৃত্যু না ঘটিলে ধর্মের রাজ্যে জন্ম হয় না, তাহা কি জান না? যখন তোমাদের জন্য সংসার-রাজ্যে ক্রন্দনধ্বনি উঠিবে, তখনই স্বর্গরাজ্যে সাধুগণ একটি নবজীবন জন্মিল বলিয়া আনন্দধ্বনি করিবেন। গৃহস্থের গৃহে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পুরনারীগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহার আগমনবার্তা প্রচার

করেন। ঈশ্বরের রাজ্যেও সাধুগণ সেইরূপ আনন্দধ্বনি করিয়া থাকেন।

এই ঈশ্বরের রাজ্য অতি বিষম স্থান। এখানে যে একবার প্রকৃত ভাবে প্রবিষ্ট হয় তাহার আর সংসারের আকার থাকে না। ঈশ্বর তাহার আর-এক প্রকার আকার করিয়া দেন। পাপী ভাবিয়া আসিয়াছিল যে, ঈশ্বরের ঘরে সভ্য হইয়া থাকিব, এইজন্য সে যত আসক্তি বিলাস ও স্বার্থের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে নির্জনে পাইয়া প্রভু তাহার সকল পরিচ্ছদ হরণ করিয়া তাহাকে ভিখারী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বন্ধুবান্ধব সকলে আশা করিয়াছিলেন যে, সে ধনমান অর্জন করিবে, দশজনের মধ্যে একজন হইবে, সংসারে প্রতাপ প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। কিন্তু তাহার এমনি অবস্থা ঘটিল যে, দেখিয়া সংসারের লোক শোক করিতে লাগিল, বলিল, "ধর্ম ধর্ম করিয়া ইহার কি দশা ঘটিল দেখ! কেন ইহার এমন দশা হইল?" সে কহিল, "আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল মুক্তিপ্রার্থী হইয়াছিলাম, আমি কেবল মনপ্রাণের সহিত পরমেশ্বরকে ডাকিয়াছিলাম, তাহার পর তিনি আমার এই অবস্থা ঘটাইলেন।"

১২৮৯

স্বাধীনতা ও প্রেম

এ কথা সকলেই জানেন যে, জলের দ্বারা অনেক কল চলে এবং পালের দ্বারাও নৌকা চলে। লোকে কখন-কখনও নদীর ধারে কল বসাইয়া জলের স্রোত দ্বারা তাহা চালাইয়া থাকে। আবার পালের গায়ে বায়ুর স্রোত লাগিয়াও নৌকা চলে। বায়ুর স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত রহিয়াছে। কাহাকেও বায়ু সৃষ্টি করিতে হয় না, বায়ুকে ডাকিয়া আনিতে হয় না, কেবলমাত্র বায়ুর গতি নিরূপণ করিয়া তদনুসারে পাল তুলিয়া দিলেই নৌকা চলিতে পারে। সেইরূপ জলের স্রোতও প্রবাহিত হইতেছে, কলখানিকে ঠিকভাবে বসাইলেই তাহা চলিতে পারে।

সাধুরা বলিয়াছেন যে, ঠিক এইরূপে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সকল কার্য সাধিত হয়। যেমন তেমন করিয়া একটা পাল উঠাইয়া দিলেই নৌকা চলে না। আবার যেমন তেমন করিয়া স্রোতে কল বসাইলেও কল চলে না। ইহাতে বিশেষ কৌশল আবশ্যক। ঠিক করিয়া কলটি স্রোতের পার্শ্বে বসাইতে না পারিলে চলে না। ঠিক সেইরূপ পরমেশ্বরের ইচ্ছার স্রোত নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু সেই ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইতে হইলে মনটিকে তৎসম্বন্ধে ঠিকভাবে বসাইতে হইবে।

তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য, তাঁহার জাগ্রত ইচ্ছা ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে কার্য করিতেছে, এ সত্য অনেকে অনুভব করেন না। তাঁহাদের কথার ভাবে বোধ হয়, তাঁহারা যেন বিশ্বাস করেন যে, ঘটিকা-যন্ত্রের নির্মাতা যেমন ঘটিকাযন্ত্র নির্মাণ করিয়া তাহাকে চালাইয়া দিয়া দূরে যায়, আর বার বার তাহাতে হস্তার্পণ করা প্রয়োজন হয় না, তেমনি এই জগদ্‌যন্ত্রের নির্মাতাও যেন ইহাকে রচনা করিয়া ও ইহাতে

নিয়মাবলী স্থাপন করিয়া ইহার কার্য হইতে দূরে রহিয়াছেন, ইহাতে হস্তার্পণ করা আর তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন হয় না। এইরূপে যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের কার্য হইতে ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দূরে দর্শন করেন, তাঁহাদের ধর্মভাব ত্বরায় শুষ্ক হইয়া যায়। তাঁহারা অনুভব করেন যে, এই জগৎ ও মানবের ভাগ্য অনতিক্রমণীয়রূপে কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে, মানবের বিলাপ ও প্রার্থনা শুনিবার কেহ নাই।

এক জীবন্ত পুরুষের সহিত হৃদয়ের ও প্রেমের যোগ না হইলে ধর্ম হয় না। সর্বশক্তিমানের পূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে না পারিলে আবার ধর্ম কি? তাঁহার ইচ্ছা নিরন্তর জগৎকে চালাইতেছে, ইহার প্রত্যেক পরমাণুকে চালাইতেছে—কেহ বা জ্ঞাতসারে তাঁহার অনুগত হইতেছে, কেহ বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার কার্য করিতেছে। এই জন্যই একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে অনির্বচনীয় শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্যকে চালাইতেছে তাহাই ঈশ্বর।

বাস্তবিক ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, কি এক আশ্চর্য শক্তি নিরন্তর জগৎকে মঙ্গলের দিকে চালাইতেছে। আপাতত যে সকল কার্যকে আমরা অমঙ্গল ভাবি, তাহাও মঙ্গলময়। এই শক্তির কার্য দেখিয়াই ভাবুকগণ তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন হইয়াছেন। কি জড়, কি চেতন, সকলেতেই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় কার্য করিতেছে। প্রাতঃকালের সূর্য তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে, আবার প্রচণ্ড অগ্নিসম উত্তাপ বর্ষণ করিয়াও তাঁহারই বিধান পূর্ণ করিতেছে। প্রবল ঝটিকা ও সুগন্ধ সমীরণ উভয়ই তাঁহার অভিপ্রায়ে হইতেছে। প্রকৃতি-রাজ্য ছাড়িয়া যখন মানবকুলে যাই তখন দেখি, তাহারা জানিতেছে না, অথচ তাহাদের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা সাধিত হইতেছে, অসত্যের উপরে সত্যের

জয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপে সকল প্রকার বিপ্লব তাঁহারই কার্য সাধন করিতেছে।

এই জাগ্রত ইচ্ছার সহিত মানব-ইচ্ছা যে পরিমাণে মিলিত হয় সেই পরিমাণে তাহা ধর্মপথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়।

এই জাগ্রত ইচ্ছাকে ডাকিয়া আনিতে হয় না, ইহা নিরন্তর প্রবাহিত রহিয়াছে। কিন্তু তিনি আমাদের মনে এমন এক ভাব দিয়াছেন, যাহাতে তিনি আমাদিগকে স্বাধীন রাখিয়াছেন। মানব বাধ্য হইয়া তাঁহার সেবা করিবে, মানব তাঁহার ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে, তিনি তাহা চাহেন না। এইজন্যই তিনি আমাদের মনে দুই আশ্চর্য ভাব দিয়াছেন, স্বাধীনতা ও প্রেম। আপাতত বোধ হয় দুইটি ভাব পরস্পরবিরোধী। কিন্তু ইহারা একই সূত্রে আমাদের মনে গ্রথিত রহিয়াছে। মানুষ স্বাভাবিক স্বাধীন, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনে যেমন স্বাধীনতাপ্রিয়তা দিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি প্রেম দিয়াছেন। যেখানে প্রেম নাই বাধ্যতা আছে সেখানেই দাসত্ব, আর যেখানে প্রেম আছে আনুগত্যও আছে সেইখানেই স্বাধীনতা। তিনি ক্রীতদাসের সেবা চাহেন না, কিন্তু প্রেমিকের উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের পূজা চাহেন।

এই প্রেমের বশীভূত বলিয়াই আমরা একদিকে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত, ঘোর পরাধীন। অপ্রেমিকের কার্যে আত্মগরিমা উৎপন্ন হয়। "আমি এত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, এত করিয়াছি" প্রভৃতি কথা সর্বদাই তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রেমের ভাষা এরূপ নহে। প্রেম করে অনেক, দেয় অনেক, কিন্তু করিয়াছি বা দিয়াছি বলিয়া বুঝিতে পারে না। যেখানে প্রেমবিহীন কার্য হয়, সেইখানে আত্মার বড় দুর্গতি। যতই পরিশ্রম করে ততই বিদ্বেষ বাড়িয়া যায়, মনে

যতটুকু সদ্‌ভাব থাকে, তাহাও তিক্ত হইয়া যায়। অতএব মানুষ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য করিতে গিয়া যদি প্রেমকে রক্ষা করিতে না পারে, তবেই আত্মগরিমা জন্মিবে।

অপ্রেম লইয়া তাঁহার কার্য করিলে হৃদয় তিক্ত, বিরক্ত ও নীরস হইয়া যায়, মনের ভাব ও প্রবৃত্তি নীচ হইয়া যায়। কিন্তু যখন প্রেম গুরু হইয়া হাত ধরিয়া লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত করে, তখন যত পরিশ্রম করা যায় ততই মনে হয়, কিছুই করা হইল না, আরও হৃদয়মন তাঁহাকে সমর্পণ করিব, আরও তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন হইব। তখন যত দেওয়া যায়, ততই শ্রমের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। প্রেমের ঋণ বড় ভয়ানক, পরিশোধ করিতে গেলে উত্তরোত্তর ঋণ বর্ধিত হয়। সেই ঋণভারে প্রাণ অবনত হইয়া পড়ে, সমুদয় মন-প্রাণ সেই প্রেমাগ্নিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, চিন্তা কল্পনা রুচি সকলকেই তাঁহার ইচ্ছা অধিকার করে, সমুদয় মন সেই জাগ্রত ইচ্ছার অনুগত হইয়া পড়ে।

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য সাধনের ন্যায় আত্মশাসনেও এই প্রেমের প্রয়োজন। যদি কেহ মনে করেন যে, তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞার বলেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকুলকে বশীভূত রাখিবেন, তবে অচিরে তাঁহাকে ভগ্ন-মনোরথ হইতে হইবে। জীবনের অভিজ্ঞতাতে জানি যে, এই গজ-কচ্ছপের যুদ্ধে মন ত্বরায় পরিশ্রান্ত হইয়া যায়। মন কখনও প্রবৃত্তিকুলের উপরে, প্রবৃত্তিকুল কখনও মনের উপরে, এইরূপ সংগ্রামে মন হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে; কিন্তু যখন প্রেম আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে ও অগ্নির ন্যায় প্রাণে সংযুক্ত হয়, তখন প্রবৃত্তিকুল স্বতঃই বশীভূত হইয়া পড়ে।

সেই প্রেম ভাল করিয়া হৃদয়কে অধিকার না করিলে ও তাঁহার ইচ্ছায় সর্বতোভাবে আপনাকে সমর্পণ না করিলে মানুষ নবজীবন

প্রাপ্ত হয় না। কিরূপে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হওয়া যায়? কুম্ভকার যখন ঘট প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন মাটি প্রস্তুত করিতে তাহার যত পরিশ্রম হয়, ঘট প্রস্তুত করিতে তাহার দশভাগের একভাগও আবশ্যক হয় না। সেইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা নবজীবন প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা আমাদের মনকে তাঁহার ইচ্ছার অধীন করা কঠিনতর কার্য। কুম্ভকারের হস্তে মৃত্তিকা যখন এরূপ হয় যে আর তাহাতে অঙ্গুলি বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তখন অতি সহজেই ঘট প্রস্তুত হয়। সেইরূপ অহংকার, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ-সকল আমাদের অন্তর হইতে দূর হইলে তাহা ঈশ্বরের হস্তে আকার প্রাপ্ত হইবার উপযোগী হয়।

১২৯১

পাপের বীজ

সংসারে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুদিনের পর যদি বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহারা পরস্পর কুশল-প্রশ্নের পর বিচ্ছেদ-কালে কি কি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে থাকেন ; ঐ কালের মধ্যে কি বিশেষ সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তাহার বর্ণন করিতে থাকেন। আজ উৎসবের দিনে বহু দূর হইতে ধর্মবন্ধুগণ এখানে সমাগত হইয়াছেন; আমি অনেক দিন হইতে একটি ঘটনার কথা ইঁহাদিগকে বলিব বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি, আজ তাহাই বলিব। সে ঘটনাটি এই—

কিছুদিন পূর্বে আমার অন্তরে কোন একটি বিশেষ সুখের জন্য লালসার উদয় হয়। যে সুখটির প্রতি আমার অন্তরের বাসনা জন্মে, তাহার মধ্যে কোনও পাপ-কামনা বা অবিশুদ্ধ প্রবৃত্তি ছিল না, অথচ দেখিলাম যে, যে কয়েক দিন সেই ইচ্ছা আমার অন্তরে প্রবল রহিল, সেই কয়েক দিন আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা বিশেষ মলিন বোধ হইতে লাগিল। অর্থাৎ আর আমি দৈনিক উপাসনাতে পূর্বের ন্যায় তৃপ্তি অনুভব করি না; যাহা করি, যেখানে যাই, প্রাণটা বিরস বোধ হয়। দর্পণের উপর জলীয় বাষ্প পড়িলে তাহা যেমন ম্লান ভাব ধারণ করে এবং তাহাতে আর পার্থিব পদার্থের প্রতিবিম্ব যেমন উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ কোনও গূঢ় কারণে আমার চিত্তেরও সেই অবস্থা ঘটিল। আর তাহাতে প্রেমময়ের প্রসন্ন মুখ উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত দেখিতে পাইলাম না। এই অবস্থাতে আমার অন্তর অত্যন্ত অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। চিত্তের ম্লান ভাবের কারণ কি? গভীররূপে এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম।

নগরের কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জন উদ্যানে আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত

হইলাম। গভীর আত্মানুসন্ধানের পর অবশেষে একটি মহাসত্য প্রতীত হইল। আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম, যে সুখটি আমি পাইতে ইচ্ছা করিতেছিলাম, সেই সুখের ইচ্ছা করিবার সময় তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা -সঙ্গত কি না—এ চিন্তা একবারও আমার মনে উদিত হয় নাই। আমি আমি তাঁহাকে ভুলিয়া কেবলমাত্র স্বীয় আসক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ঐ সুখ কামনা করিতেছিলাম। তখন আমি মনকে এই প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, আচ্ছা, ঐ সুখ যে আমার আত্মার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তাহা কে বলিল? প্রভু কি ইচ্ছা করেন, ঐ সুখ আমি পাই? সুখ আমি কেন চাহিব? সেবাই যাহার লক্ষ্য, সুখ ত তাহার লক্ষ্য নয়। ঐ সুখ দিতে হয় তিনি দিবেন, না দিতে হয় না দিবেন, আমি চাহিব কেন? তখন আমি বুঝিলাম, আমি অবিশ্বাসী ও নাস্তিকের ন্যায় তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আসক্তির জন্য সুখ কামনা করিয়াছিলাম বলিয়া আমার মন মলিন হইয়া গিয়াছে। যে সুখের মধ্যে তিনি প্রাণরূপে বিদ্যমান নহেন, সেরূপ সুখ কামনা করাই বিশ্বাসীর পক্ষে অপরাধ। এই অপরাধেই আমার অন্তরাত্মা মলিন হইয়া গিয়াছে।

এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি আরও একটি গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করিলাম। আমি ভাবিলাম, মানবের পাপের বীজ কোথায়? আমাদের দেশে কোন কোনও পণ্ডিত বলিয়াছেন, অজ্ঞতাই পাপের বীজ, অর্থাৎ মানব মোহবশত সর্বদাই অসারকে সার বোধ করিতেছে—এই ভ্রান্তিরূপ বীজ হইতেই পাপের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আসক্তিই পাপের বীজ। মানুষ নিকৃষ্ট সুখে এত আসক্ত যে তাহারা তাহার অন্বেষণেই সর্বদা ব্যস্ত, ধর্মাধর্ম বিচার করিতে পারে না, এই কারণেই পাপের উৎপত্তি হয়। আমার বোধ হইল, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া সুখেচ্ছা করাই পাপের বীজ-স্বরূপ। আমি যে ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া

সুখ কামনা করিতে পারি, এ স্থলেই আমার মৃত্যুর দ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। এই মূল হইতেই সকল পাপের উৎপত্তি হইতে পারে।

প্রকৃত বিশ্বাসীর সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল বাসনা সত্য-স্বরূপ প্রভুর উপর প্রতিষ্ঠিত। যে চিন্তা, যে ভাব বা যে বাসনা ঈশ্বরের পবিত্র আবির্ভাবের মধ্যে লইয়া যাইতে পারে না, প্রকৃত বিশ্বাসী তাহা অস্পৃশ্য বস্তুর ন্যায় হৃদয় হইতে বর্জন করেন। ধর্মের চক্ষে ইহার দ্বারাই ভাব ও কার্যের বিচার। ভাব হাজার সুন্দর হউক, কার্য হাজার মহৎ হউক, যতক্ষণ তাহা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ তাহার কোনও আধ্যাত্মিক মূল্য নাই। কেবল প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া মানুষ যদি অন্ধের ন্যায় সদনুষ্ঠান করে এবং তাহার সহিত যদি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ না থাকে, তবে সেই প্রকার কার্য দ্বারাই সে ব্যক্তি পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতে পারে। যে জ্ঞানের প্রাণ তিনি নহেন, সে জ্ঞান গর্ব ও অজ্ঞতার অন্ধকার মাত্র। যে প্রীতির প্রাণ তিনি নহেন, সে প্রীতি ত্বরায় আসক্তি ও মোহের আকার ধারণ করে এবং চিত্তকে মায়াজালে বদ্ধ করিয়া ফেলে। যে সদনুষ্ঠানের প্রাণ তিনি নহেন, তাহা অহংকার ও প্রশংসাপ্রিয়তা উৎপন্ন করিয়া আত্মাকে উচ্চ ভূমি হইতে ভ্রষ্ট করে। অতএব বিশ্বাসী মাত্রেরই এই চেষ্টা হওয়া কর্তব্য, কিসে তাঁহাদের সমুদয় চিন্তা বাসনা ও কার্য সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের সহিত যাহার যোগ নাই, সে চিন্তা, ভাব ও কার্য আমাদিগকে তাঁহা হইতে দূরে লইয়া যায়, মুক্তিপ্রার্থী বিশ্বাসীর নিকট তাহার কোনও মূল্য নাই, তাহা অতি হেয়।

১২৯৩

রসনা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা

বৃদ্ধ দায়ুদ নৃপতির নাম অনেকে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তিনি যে একজন ঈশ্বরভক্ত ছিলেন তাহাও আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন। তৎকৃত স্তুতিবন্দনা পাঠ করিতে গিয়া একটা কথা দেখিতে পাইলাম। ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া দায়ুদ বলিতেছেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, রসনা দ্বারা এমন কথা বলিব না যাহাতে তোমার মহিমার হ্রাস বা করুণার খর্বতা হয়।" ভক্তদলের অগ্রগণ্য প্রাচীন দায়ুদ নৃপতি বলিয়াছেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, রসনা দ্বারা এমন কথা ব্যবহার করিব না যাহাতে তোমার প্রতি নির্ভরের অভাব প্রকাশ করিবে।"

কেমন করিয়া আমরা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করি? অসাধু আলাপ, অসাধু কথা দ্বারাই কি কেবল ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা হয়? রসনা দ্বারা পরনিন্দা, কুৎসা ঘোষণা করা অথবা প্রকাশ্য ভাবে ঈশ্বর নাই, উপাসনা-প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি কথা প্রচার করিলেই কি কেবল ঈশ্বরের মহিমা হ্রাস করা হয়? দায়ুদের পক্ষে ঐ কথা কি অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে? যে ব্যক্তি উপাসক ও ভক্ত, তিনি অবিশ্বাসী হইয়া অসাধু কথা বলিবেন, লোকের প্রতি বিদ্বেষ, কটূক্তি অথবা লোকের কুৎসা ও নিন্দাবাদ করিবেন, সে আশঙ্কায় যে দায়ুদ ব্যস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা ও শপথ করিতেছেন, ইহা সম্ভব নহে। যিনি ঈশ্বরের নামে এত স্তবস্তুতি রাখিয়া গিয়াছেন, দুর্মতিবশত তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মহিমা ও করুণা অস্বীকার করিয়া ফেলিবেন, সেই জন্য যে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ অর্থও যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রাচীন নৃপতি তবে ওরূপ কথা কেন বলিলেন? অবশ্যই উহার কোনও গভীর অর্থ আছে। গূঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখি যে, কেবল নাস্তিক,

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, পাপী, অবিশ্বাসী ও সংশয়ী ব্যক্তিই ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করে, তাহা নহে। বিশ্বাসী বলিয়া যাঁহাকে জানি, রসনায় যিনি ঈশ্বরের নাম করেন, ঈশ্বরের সেবক ও উপাসক বলিয়া যিনি আপনার পরিচয় দেন, তাঁহারও এমন অবস্থা হইতে পারে যে, তিনি রসনা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করিতে পারেন। সে অবস্থা কি? মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখি যে, অধিক কথা কি, প্রার্থনা দ্বারাও ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা যাইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল সত্য আছে, তাহা ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। সে সকল সত্যের উপর যাহাতে সন্দেহ প্রকাশ পায় এমন ভাষা যদি উচ্চারণ করি, তাহা হইলে ঈশ্বরের মহিমা বিশেষরূপে খর্ব করা হয়। প্রথম সহজ কথা, ঈশ্বর সত্য। কোনও কথায় যদি উহার বিরুদ্ধ ভাব প্রচার করি, তাহা হইলেই তাঁহার মহিমা খর্ব করা হয়। দয়াময় মহাসত্য, সত্যসত্যই কৃপা করেন, তিনি কৃপার আধার—ভাষায় যদি ইহা ম্লান করিবার ও ইহার বিরুদ্ধ ভাব উৎপাদন করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাঁহার মহিমার হ্রাস করা হয়। অনেক সময়ে বিশ্বাসীও এইরূপে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করিয়া শান্তিস্বরূপ আধ্যাত্মিক ধন লাভে ও করুণা সম্ভোগে বঞ্চিত থাকেন।

তিনটি বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করিয়া অবিশ্বাস প্রকাশ-করত শাস্তি পাই ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি করি। প্রথমত, যে নিরাশ হয় বা নিরাশার কথা উচ্চারণ করে, সে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করে। 'পাব না', 'পারিলাম না' এমন কথা যে বলে, সে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করে। কেননা ঈশ্বর আছেন ইহা যদি সত্য হয়, ঈশ্বরের কৃপা যদি সত্য হয়, তবে পাপীর উদ্ধারও যে হইবেই হইবে, ইহাও সত্য কথা। ইহার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলেই দেবতার মহিমা খর্ব করা হয়।

অনন্ত নরকের মতে আমাদের আস্থা নাই। পাপী অনন্তকাল

নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে, এ কথা আমাদের ভাল লাগে না। পাপী অনন্তকাল দগ্ধ হইবে, আর সৃষ্টিকর্তা ক্রুদ্ধ হইয়া অনন্তকাল তাহাকে দেখিবেন না, এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। কারণ, এ কথা বলিলে ঈশ্বরের করুণার বিরুদ্ধে বড় নিন্দাবাদ করা হয়। ইংলণ্ডীয় ব্রাহ্মবন্ধু ভয়সি সাহেব পূর্বে বিশ্বাসী খ্রীষ্টান ছিলেন এবং অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ভগিনীর কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস ছিল না। পাছে তিনি অনন্ত নরকে পড়েন এই ভয়ে ভয়সি সাহেব ভগিনীকে সর্বদাই বুঝাইতেন, ভগিনীর জন্য সর্বদাই ভাবিতেন। একদিন রাত্রে ভাই ভগিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া ধর্ম বিষয়ে বিতণ্ডা করিলেন। ভগিনীর বিষয় ভাবিয়া ভয়সি সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিলেন, অশ্রুজলে বালিশ ভিজিয়া গেল, সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণাতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। প্রভাতে তাঁহার অন্তরে আলোক প্রকাশ পাইল। প্রত্যাদেশ হইল, "তোমার একটি ভগিনী পাছে অনন্ত নরকে যায় বলিয়া তুমি সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিলে, আর আমি আমার কন্যাকে অনন্ত নরকে ফেলিয়া দিব—ইহা কি সম্ভবে?" ভয়সি অনন্ত নরকের মত বর্জন করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন।

যেজন্য আমরা অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, সেইজন্য এ কথাও মানিতে পারি না যে, ঈশ্বরের জয় হইবে না। প্রার্থনা দ্বারা, উপাসনা দ্বারা পাপীর ত্রাণ হইবে না, এ কথায় এই প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বর পাপের কাছে হারিয়া যান, পাপের জয় হয়। পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না, সাধুতার উপর অসাধুতা পাপ উঠিয়া দাঁড়াইবে, এ কথা বলিলে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা হয়। ইহা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের কথা নহে। ভাই-ভগিনি! আপনাকে খুব মলিন বিবেচনা কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু মনে মনে ভাব কি যে, ঈশ্বর পরাজিত হইবেন, তাঁহার

করুণা জয়যুক্ত হইবে না? নিরাশার কথা কেন বলি, তাহা জানি। কত শত, কত সহস্র বার প্রতিজ্ঞা, উপাসনা ও ঈশ্বরের চরণ আলিঙ্গন করিলাম, অথচ যেই পাপ আসিয়াছে, অমনি আমাদের প্রতিজ্ঞা শিথিল হইয়াছে। দুইবার নহে, দশবার নহে, শত-শতবার অনুতাপে কাঁদিয়াছি। নিজের দুর্বলতা দেখিয়া তাই মনে হয় যে, আমরা পারিব না।

ঈশ্বর সরলবিশ্বাসী বিনয়ীর উদ্ধারের জন্য সর্বদাই ব্যস্ত। 'আমি পড়িয়া আছি, আমার পরিত্রাণ হইবে না।' এমন কথা বলিলেই ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা হয়। এরূপ কথা কখনও বলিবে না। প্রতিজ্ঞা কর, অবিশ্বাসের কথা বলিয়া আর ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করিবে না। প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিতে পার নাই? কতবার তাহা গণিয়া রাখিয়াছ কি? একজন মহাপুরুষকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, শত্রুদিগকে কতবার ক্ষমা করিতে হইবে? তিনি বলিয়াছিলেন, সপ্ততিগুণ সাতবার। শতবার আমাদের প্রতিজ্ঞা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ভাঙিয়া গড়াগড়ি গিয়াছে। ছেলেরা যেমন খেলার ঘর তুলে, আমরা তেমনি কতবার বাস করিবার জন্য যত্ন করিয়া প্রেম ও পবিত্রতার ঘর তুলিয়াছি, দুর্দান্ত দস্যু আসিয়া ঘর ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে; হৃদয়প্রাঙ্গণে সে ঘর ভাঙিয়া গড়াগড়ি গিয়াছে। ভাই-ভগিনি! এমন দুর্দশা অনেকবার হইয়াছে। তাই বলিয়া কি তোমরা বলিতে চাও যে, ঈশ্বর পরাজিত হইবেন? হাজার-বার ভাঙিলেও আশা করিবে। নিরাশার কথা মুখে বলা আর ঈশ্বরকে অস্বীকার করা সমান কথা।

আর-এক ভাবে রসনা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা যাইতে পারে। পাইয়া যদি বলি, পাই না, তাহা হইলে প্রভুর মহিমা খর্ব করা হয়। পাইয়া যে সন্তান 'পাই না' বলে, মা তাহাকে কিছু দিতে চান না। যদি

আমরা সর্বদা বলি, পাই না, পাইলাম না, তাহা হইলে ঈশ্বরের মহিমা নিশ্চয়ই খর্ব করা হয়। যেটুকু পাও বুকে ধরিয়া আনন্দ কর। প্রকৃত বিশ্বাসী বলেন, প্রভু যা দিলেন আমার ঢের হইল। একজন ব্রাহ্ম বন্ধুর একটি সন্তান মরিয়া গেলে তিনি তাঁহার পত্নীকে শোক করিতে বারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, একটি গিয়াছে, আর-একটি ত বাঁচিয়া আছে। যতটুকু ঈশ্বর দেন, ততটুকুতেই অধিকার। বেশিতে কি অধিকার? ইহা বাস্তবিক কথা, কল্পনা নহে। কোনও জিনিসের উপর অধিকার স্থাপন করিতে গিয়া আমরা অন্ধকারে পড়ি। দাওয়া করিয়া বসি যে, চিরদিন যেন চক্ষু ঈশ্বরের প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া ধন্য হয়। কিসের দাওয়া? ঐ দাওয়াতেই অন্ধকার আসে। কিসের অধিকার? যদি জন্মান্ধ হইতাম, তাহা হইলে কি হইত? করুণার উপর আবার দাওয়া কি? আবার করুণা পাইয়া তাহার জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া যদি বলি, পেলাম না, দিলেন না, তাহা হইলে কি ঘোর অপরাধ করা হয় না? একবার একস্থানে কাঙ্গালী-বিদায় হইতেছিল। সেই কাঙ্গালীদের মধ্যে একজন বালক ছিল। তাহার মুখ দেখিয়া সকলের দয়া হইল, সকলে বলিল, একে একখানা ভাল কাপড় দাও। কাপড় পাইয়াও দেখা গেল, সে আবার হাত পাতিতেছে, সকলে তখন বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। যাহা পাইলে, তাহার জন্য যদি প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতা না দাও, তাহা হইলে বলি, তুমি ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করিলে। আমরা কি বলিব না যে, প্রভু, ঢের হইয়াছে। কোন্ পথে যাইতেছিলাম, আর তিনি কোথায় আনিলেন! সত্যসত্যই তিনি আমাদিগকে প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন; আনিয়া নিজের হাতে আমাদের মুখে অমৃতের পাত্র ধরিয়াছেন। তবে কেন বলিব, তিনি কৃপা করেন নাই?

রসনা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা

আর-এক ভাবে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা যায়। আমরা ভয় পাইয়া ঈশ্বরের দান হারাইয়া ফেলি। যখন আমরা পাই তখন ভয়ে ভয়ে হাত পাতি, ভাল করিয়া হাত পাতিতে পারি না; তাই ভাল করিয়া তাঁহার দান ধরিতে পারি না। কত দিয়াছিলেন, পথে সব ফেলিয়া দিয়াছি, আবার হয়ত ফেলিয়া দিব, এই চিন্তায় মন আকুল হয়। যদি জান যে থাকিবে না, তবে সত্যসত্যই থাকিবে না। ভয়ে অর্ধেক মৃত্যু হয়। যেখানে মারীভয় উপস্থিত হয়, সেখানে যে ভয় পায়, সে আগে মরে। ভয়ের কথা বলা হইবে না। মনে মনে যদি আমরা স্থির করি যে, কৃপা ভোগ করিব না, তাহা হইলে কাজেই কৃপা-ভোগ ঘটিবে না। যদি মনে করি, ঈশ্বরের ঘরে বাস করিব না, ঈশ্বরের চরণে থাকিব না, তাহা হইলে সত্যসত্যই সেখানে থাকা ঘটিবে না। যদি ভয় থাকে, তবে ঈশ্বরের কাছে থাকিতে পারিব না। আমরা তাঁহাকে প্রভু বলিতেছি কি দুদিনের জন্য? সেবার ব্রত, প্রচার-ব্রত, উপাসনা-ব্রত লইয়াছি কি দুদিনের জন্য? দুদিনের জন্য থাকিব বলিয়া হৃদয়মন দিই নাই। সকল দিন কিছু সমান থাকিবে না। কখনও অনুকূলতা কখনও প্রতিকূলতা, কখনও সুবিধা কখনও অসুবিধা ঘটিবে। কেবল অনুকূল অবস্থায় থাকিব, কেবল সরস হইয়া থাকিব, এমন সম্ভব নহে। আমাদের কর্তব্য এই যে, অনুকূল ও সরস অবস্থাতেই থাকি বা প্রতিকূল ও নীরস অবস্থাতেই থাকি, বৃদ্ধ দায়ুদের মত থাকিব। রসনাকে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করিতে কখনও দিব না। প্রতিজ্ঞা ইহ-পরকালের মত করিতে হইবে। দুদিনের জন্য জীবন বিক্রয় করিব বলিলে কে শুনিবে? উপাসক উপাস্য দেবতার জন্মের মত গোলাম হইয়া পড়ে, দু'বাহু তুলিয়া আনন্দে তাঁহার কার্য সাধন করে। চিরকালের জন্য তাঁহার দাসত্ব করিব, তাঁহার

হইয়া থাকিব, চিরকালের জন্য তাঁহার কৃপার সাক্ষ্য দিব, পাপের সাক্ষ্য দিব না, প্রত্যেককে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। হৃদয় দুইদিনের জন্য দিলে চলিবে না। ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বালকের খেলা করা উচিত নহে। ছেলেরা টলিতে টলিতে মার হাতে ফুল দেয়, আবার দুই মিনিট পরে তাহা তুলিয়া লয়। আমরা কি সেইরূপ প্রাণের ফুল একবার ঈশ্বরের হাতে দিব, আবার তুলিয়া লইব? দিয়াছ যাহা, তাহা একেবারে দিয়াছ। জন্মের মত তাঁহার হইয়া গিয়াছি, এই কথা বলিতে হইবে। পাপ ও সংসারাসক্তি আসিলে বলিব যে, আমরা ঈশ্বরের হইয়া গিয়াছি, আর আমাদিগকে পাইবে না। আমাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, রসনা দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা আর খর্ব করিব না।

আর-এক প্রকারে ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করা যাইতে পারে। নিরাশ হইয়া আমরা যদি বলি, ঈশ্বরের মহিমা ও নাম জয়যুক্ত হইতেছে না বা হইবে না, তাহা হইলে তাঁহার মহিমা খর্ব করা হয়। ঈশ্বর স্বয়ং যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহার জয় হইবে না ত কি আমাদের জয় হইবে? আমাদের ত ভারি যোগ্যতা! আমাদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করিতে হইলেই প্রতুল আর কি! রুগ্‌ণ-দুর্বল, দীন-হীন, আশ্রয়বিহীন, যাহাদের 'আহা' বলিবার লোক নাই, এরূপ লোক দিয়া কি যুদ্ধে জয়লাভ হয়? মানুষের দিকে চাহিতে গেলে সকল আশা উড়িয়া যায়। মানুষের দিকে চাও, দেখিবে আমাদের ধন নাই। আমাদের মধ্যে কয়টা ধনী আছে? কত ভিক্ষা করিয়া আমরা উৎসব করি। ধন, মান, বিদ্যা আমাদের নাই। যুদ্ধের সম্বল কিছুই নাই। একে ত দু-পাঁচটি সৈন্য, তাহারা আবার আপনারা আপনাদের ক্ষতি করে। আপনাদের উপর আপনারা তরবারি চালায়। নিরাশ হইবার কারণ যথেষ্ট

রহিয়াছে। মানুষের দিকে চাহিলে কথা কহিবারও বল থাকে না। সেই জন্য প্রভু নিজে ভার লইয়াছেন। তাই ত জলে ঝড়ে ভিজিয়া আমরা গান করিয়া আসিলাম, "ও ভাই শুন সমাচার, পাপীদের ভার লয়েছেন আপনি দয়াময়।"

মানুষের কি সাধ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে? ঈশ্বর আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। কাহার সঙ্গে? পাপ, দুর্নীতি, কুসংস্কার, ভ্রান্তি, দুর্গতির সঙ্গে। প্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ। যদি পৃথিবী জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের সৈন্য কই? আমরা বলিব, আমাদের সৈন্য কোথায়? অসম্ভব সম্ভব করিতে, আশ্চর্য দেখাইতে, খঞ্জ, অন্ধ, গলিতকুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত ভাঙা-চোরা লোক লইয়া স্বয়ং জগৎপতি অবতীর্ণ হইয়াছেন। পৃথিবীর রাজারা যুদ্ধের আয়োজনের জন্য কত ভাল ভাল সৈন্য সংগ্রহ করেন, টাকা জোগাড় করেন, কত ট্যাক্স স্থাপন করেন। আর জগৎপতি কিনা আজি কানা-খোঁড়া লোক লইয়া সংগ্রাম করিবেন! ভাঙাচোরা লোককে কোলে টানিয়া তিনি বলিতেছেন, "যা, তোরা আমার নাম প্রচার কর্।" আজ আশা কি হইতেছে? ইতিহাস পড় নাই? ঈশ্বর দেখাইতে চান যে, পৃথিবীর রাজাদের মত গোলাগুলি ডিনামাইট কামান লইয়া তিনি যুদ্ধ করেন না। স্বর্গরাজ পিতা বিধান-রূপ তৃণ কুড়াইয়া পাপের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করেন। সেই তৃণের দুর্জয় বল দেখিয়া পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইন্দ্র-করধৃত বজ্র অপেক্ষাও সে তৃণের বল অধিক।

মানুষ যজ্ঞ রন্ধন করিবার সময় কত ভাল ভাল রন্ধনপাত্র সংগ্রহ করে। আর জগজ্জননী যখন যজ্ঞ রাঁধেন তখন যে সকল ভাঙা হাঁড়ি সমাজ ফেলিয়া দিয়াছে তাহাই কুড়াইয়া লন। তিনি সেই হাঁড়িতে অমৃত রন্ধন করিয়া পাপীর মুখে তুলিয়া দেন। ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা! বিশ্বাস-নয়নে দেখ। আর অবিশ্বাসী হইয়া কি বলিবে যে, ঈশ্বরের জয়

হইবে না? আর অবিশ্বাসের কথা বলিও না। ওই শুন, রামমোহন রায় তোমাদের সঙ্গে বলিতেছেন, 'জয় ব্রহ্মকৃপার জয়।' কেশবচন্দ্র সেন তোমাদের সঙ্গে বলিতেছেন, 'জয় দয়াল প্রভুর জয়।' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তোমাদের সঙ্গে বলিতেছেন, 'জয় ব্রহ্মকৃপার জয়।' ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা! তোমরা ঢের অবিশ্বাস করিয়াছ, এখন বিশ্বাস কর। কে বলিল, তোমাদের পরিত্রাণ হইবে না? আমাদের ভার ঈশ্বর লইয়াছেন— আমাদের ত্রাণ হইবেই হইবে।

১২৯৪

ভক্তের আশা

ভগবদ্‌গীতার নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—

"হে অর্জুন, যখন তুমি কোনও কার্য কর, যখন আহার কর, যখন দানধ্যান কর, যখন তপস্যা কর, সমুদায় আমাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে তুমি শুভাশুভ ফল স্বরূপ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হইবে না, তোমার আত্মা প্রকৃত বৈরাগ্য ও যোগ লাভ করিবে, এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সকল প্রাণীতে সমান ভাবে আছি, কাহারও প্রতি আমার বিরাগ কাহারও প্রতি অনুরাগ নাই। যে কেহ আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, আমি সে জনে থাকি, সে জন আমাতে থাকে। সে যদি দুরাচারদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যও হয় এবং অনন্যগতি হইয়া ঐকান্তিক ভাবে আমাকে ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিতে হইবে ; সে ত্বরায় ধর্মাত্মা হইয়া অক্ষয় শান্তি লাভ করে। হে অর্জুন, নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।"

এইরূপ খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র বাইবেলের আইসেয়া নামক গ্রন্থের ৪১ পরিচ্ছেদে আছে, ঈশ্বর বলিতেছেন—

"তোমাকে আমি পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে আনিয়াছি ; জগতের বড় লোকদিগের মধ্য হইতে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি এবং তোমাকে বলিয়াছি যে তুমি আমার ভৃত্য। আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই।

"তুমি ভয় পাইও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি। ত্রাসযুক্ত হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সবল করিব। নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তোমাকে আমার পুণ্য ভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তুলিয়া ধরিব।

"দেখ, যাহারা তোমার প্রতি অতিশয় বিরক্ত, তাহারা লজ্জিত ও অপদস্থ হইবে ; তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মত হইবে। যাহারা তোমার পক্ষে বিঘ্নকারী হইয়া দণ্ডায়মান হইবে, তাহারা বিনষ্ট হইবে।

"তুমি আর তাহাদিগকে খুঁজিয়াও পাইবে না। সেই তাহারা যাহারা তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল, যাহারা আজ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তাহারা অকিঞ্চিৎকর বস্তুর ন্যায় হইবে। যাহার মূল্য নাই, এমন পদার্থের ন্যায় হইবে। কারণ আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমি তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তুলিব এবং বলিব, ভয় করিও না, আমি তোমাকে রাখিব।"

ভগবদ্গীতা ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র হইতে যে বচন দুটি উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করা গেল, হিন্দুগণ ও খ্রীষ্টানগণ সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন যে, ওগুলি ঈশ্বরের বাণী, স্বয়ং ঈশ্বর মানবকে আশ্বাস দিবার জন্য মানব-আকারে অবতীর্ণ হইয়া অথবা সাধুর মুখ দিয়া ঐ বাক্যগুলি বলিয়াছিলেন। ইঁহাদের মত ও বিশ্বাস দেখিলে এই প্রকার বোধ হয় যে, ইঁহাদের মতে এমন এক সময় ছিল যখন ঈশ্বর জগতের দুঃখভার হরণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং পথভ্রান্ত ও পাপে পতিত মানবকুলের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং মানবকে উৎসাহকর বাক্যসকল শুনাইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া বাস্তবিক বলিয়াছিলেন, "হে অর্জুন, নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।" অথবা মহাপুরুষ আইসেয়ার মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তোমাকে আমার পুণ্য ভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তুলিয়া ধরিব।"

কিন্তু ইঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এক সময়ে ঈশ্বর মানব-কুলের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মানবকে সৎপথ দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন, এখন কি সে কারণ অন্তর্হিত হইয়াছে? তিনি কি আর মানবের প্রতি কৃপাপরবশ নহেন? ইহার উত্তরে তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, মানবকুলের পাপ এত অধিক হইয়াছে, মানবের হৃদয় পাপান্ধকারে এত পূর্ণ হইয়াছে যে, ঈশ্বর মানবকুলকে ঘৃণাপূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন; এখন আর তিনি মানবের সহিত কথা কহেন না। তাঁহার উক্তি ও উপদেশাদি লাভ করিতে হইলে প্রাচীন গ্রন্থ গীতা বা বাইবেল প্রভৃতি খুলিয়া দেখিতে হইবে।

এ কথা কি সত্য, মানবকুল ক্রমাগত পাপরাশির মধ্যেই নিমগ্ন হইতেছে? সংসারে অনেক লোককে দেখা যায়, যাঁহাদের এই প্রকার ভাব; তাঁহারা সত্যসত্যই মনে করেন যে, পৃথিবী দিন দিন পাপভারে আক্রান্ত হইয়া গভীর কূপে নিমগ্ন হইতেছে, আর উঠিবার আশা-ভরসা নাই। কিন্তু আমরা কথনই এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না; এরূপ বলিলে এই কথা বলা হয় যে, ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহার করুণা জয়যুক্ত না হইয়া পাপই জয়যুক্ত হইবে। অর্থাৎ মানব-হৃদয়ে ঈশ্বর আর রাজা থাকিবেন না। এরূপ চিন্তা করাও ঘোর অবিশ্বাস, তাহাতেও অপরাধ আছে।

মানবের স্বভাবই এই, নিত্য যাহা দেখে, যাহা অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা আর হৃদয়মনকে উত্তেজিত করে না, সুতরাং তাহা আর স্মরণ থাকে না। কিন্তু বিশেষ কোনও সুখ বা দুঃখ যদি উপস্থিত হয়, দৈনিক জীবনের কোনও ব্যতিক্রম যদি ঘটে, মন যদি কোনও কারণে বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়, তবে সে ঘটনাটি বা সে বিষয়টি বহুদিন স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এ দেশে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের পর বর্ষা হইয়া থাকে। এইরূপ কত বর্ষা আসিয়াছে, কত বর্ষা গিয়াছে। কোনটির কথা বিশেষভাবে আমাদের স্মরণ নাই। কিন্তু এ বৎসর সকলের মুখেই শুনা যাইতেছে যে, এবার এমন বর্ষা হইয়াছিল যে কলিকাতার রাস্তায় নৌকা চলিয়াছিল।

সকলেই বলিতেছেন, দিনরাত্রের মধ্যে ১৩ ইঞ্চি জল পড়িয়াছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৩ ইঞ্চি বৃষ্টি— এই কথাটা অনেক দিন লোকের মুখে থাকিবে। এইরূপ স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৫০ দিন যে সুস্থদেহে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে আহার-বিহার করিয়াছি, সংসারের প্রতিদিনের কাজ করিয়াছি, প্রভাতকালের পবিত্র বায়ু ও নিশাকালের বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিয়াছি, তাহা আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু পনর দিন যে পীড়িত হইয়া শয্যাতে পড়িয়া ছিলাম, পনর দিন যে মুক্তভাবে আহার-বিহার করিতে পারি নাই, সেই কয়দিন যে রোগযন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে হইয়াছে, সেই সময় যে প্রাণসংশয় হইয়াছিল ও ঘোর সংকট হইতে উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে, সে কথা অক্ষরে অক্ষরে চিরদিনের মত স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। দুর্দিনের কষ্টটি যত মনে আছে, নিত্যপ্রাপ্ত সুখটি তত মনে নাই।

অনেক লোকের মনে যে এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে পৃথিবীতে পাপেরই জয় হইতেছে, তাহারও কারণ এই যে পাপগুলিই বিশেষভাবে তাহাদের চক্ষে পড়ে। যে সাধুতা মানব-হৃদয়ে নিত্য বিদ্যমান, যদ্‌ভিন্ন জনসমাজ এক দিন থাকে না, যাহা মানবের জীবন রক্ষা করিতেছে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রতিদিন কি পাইতেছি সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া, কি পাইলাম না সেই দিকেই অধিক দৃষ্টি করি। সুতরাং আমাদের প্রাণ বিষাদে পূর্ণ হয়। সমুচিত কৃতজ্ঞতার ভাব আমাদের অন্তরে থাকে না।

সংসারে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাঁহারা পাইবার জন্য যত ব্যগ্র, নিজে দিবার জন্য তত ব্যগ্র নহেন। এই সকল লোককে সর্বদাই অভিযোগ করিতে শুনা যায়, "অমুক বন্ধু আমার প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিলেন না; অমুক আমার সাহায্য করিলেন না; অমুক আমাকে আদর

করিলেন না।” কিন্তু “আমি মানুষের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিলাম না; আমি বন্ধুর কর্তব্য পালন করিলাম না” এরূপ বলিয়া দুঃখ করিতে শুনা যায় না। যাঁহারা আপনাদের ত্রুটি দেখিয়া সর্বদা দুঃখিত, তাঁহাদের অন্যের ত্রুটি উল্লেখের সময় হয় না। মানবের বন্ধুতা সম্বন্ধে যেরূপ, ঈশ্বরের বিধি সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাঁহাদের সুখের যদি একটু ব্যাঘাত হয়, পান হইতে যদি একটু চুণ খসে, অমনি যেন মনে হয় যে, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে পূর্ণসুখে রাখিবার জন্যই বাধ্য। পাঁচটি সন্তানের মধ্যে একটি যদি অকাল মৃত্যুতে পতিত হয়, অমনি ঘোর আর্তনাদ উপস্থিত হয়, “ঈশ্বর, তুমি কি করিলে।” আর চারিটি যে রহিল সেজন্য কৃতজ্ঞতা দিবার সময় হয় না। যদি দশদিন পীড়াতে পড়িয়া থাকিতে হয়, সে দুঃখ মনে ধরে না, তাহা কতদিন মনে থাকে, ঈশ্বর কেন এমন ক্লেশ দিলেন। কিন্তু সংবৎসর সুস্থ দেহে প্রতিদিন যে কত সুখভোগ করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা নাই। উষার পবিত্র শোভা কত দেখিয়াছেন; প্রস্ফুটিত পুষ্পবনের সুঘ্রাণ কত সেবন করিয়াছেন; প্রভাতের সুন্দর সমীরণ কত দেহকে পুলকিত করিয়াছে; বৃক্ষলতার সুস্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ, তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্রের শ্যামল কান্তি, গোধূলি-মুহূর্তের পশ্চিমাকাশের স্বর্ণরঞ্জিত মেঘমালা, এ সকল কত নয়ন-মন হরণ করিয়াছে; স্ত্রীপুত্র-পরিবারের অকৃত্রিম প্রেম, বন্ধুবান্ধবের আত্মীয়তা, শিশুসন্তানদিগের সরলতাপূর্ণ ব্যবহার সমুদয় হৃদয়কে কত তৃপ্ত করিতেছে, সে সকলি তাঁহারা এক দুঃখের তাড়নাতে ভুলিয়া যান। ঈশ্বর কেন সুখের ভরা পূর্ণ করিয়া রাখিলেন না, এই অভিযোগ। ঈশ্বর কৃপা করিয়া যাহা দিয়াছেন, তাহার উপরে যেন দাওয়া আছে। তোমার এত দাওয়া কিসের? কত শিশু ত জন্মান্ধ হইয়া পৃথিবীতে আসে, তুমি যদি সেইরূপ আসিতে, তাহা হইলে কাঁদিয়া কি করিতে পারিতে? এটা কি বিশেষ

অনুগ্রহ নহে যে, দুইটি চক্ষু লইয়া আসিয়াছ, যাহার গুণে জগতের কত শোভা দর্শন করিলে ? এই দুইটা চক্ষুর জন্য কতবার কৃতজ্ঞতা দিয়াছ ? চক্ষু দুইটি নিত্য আছে, সুতরাং সে কৃপাটা মনে থাকে না।

অতএব অবিশ্বাসী হইয়া বলিও না যে, মানবকুল পাপেই ডুবিবে, তাহার আশা-ভরসা নাই। মানব-হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। এই মহৎ লক্ষ্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যদি তাঁহার কৃপাকে ভরসা করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়া থাকেন, কাহার সাধ্য ইহার কার্যে বাধা দেয়। আজ এই মহোৎসবের দিনে সকলে একবার বিশ্বাস-চক্ষে দেখুন, ব্রাহ্মসমাজ পবিত্র বসন পরিধানপূর্বক ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন এবং ঈশ্বর তাহাকে বলিতেছেন, "নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না ; এবং আমার পুণ্য ভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমি তোমাকে তুলিয়া ধরিব।" কি আশার কথা !

ঈশ্বর যে এক সময়ে মানবের সহিত কথা কহিয়াছিলেন আর এখন পৃথিবীর পাপতাপ দেখিয়া মৌনী হইয়া যে মুখ ফিরাইয়াছেন, তাহা নহে। এই উৎসবক্ষেত্রে কি তিনি আমাদিগকে কিছু বলিতেছেন না ? বলিতেছেন বই কি। প্রত্যেকে আপন আপন হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ঈশ্বরের কোনও বাণী শুনিতেছেন কি না ? কেহ হয়ত বহুদিন হইল দৈনিক উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। ঈশ্বর আজ তাঁহাকে লজ্জা দিয়া বলিতেছেন, "তুমি করিয়াছ কি ? আমার সঙ্গে সম্বন্ধটা কি একেবারে ঘুচাইলে ?" তিনি অমনি লজ্জিত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, এবার ফিরিয়া গিয়া দৈনিক উপাসনার নিয়ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিব। কেহ হয়ত কোনও ব্রাহ্ম ভাই বা ভগিনীর সহিত অনেক দিন হইতে বিবাদ করিয়া রাখিয়াছেন। সে বিবাদটা

আজিও মিটান হয় নাই। সেই বিষাক্ত মন লইয়া উৎসবে উপস্থিত হইয়াছেন। হয়ত এখানে ঈশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছেন, "ছি! ছি! তুমি হৃদয়ে গরল লইয়া আমার প্রেমের যজ্ঞে আসিয়াছ? বেদীর নিকট তোমার নৈবেদ্য রাখিয়া যাও, আগে তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া এস।" কেহ হয়ত কোনও গূঢ় পাপের কথা লোকের নিকট লুকাইয়া বেড়াইতেছে। আজ উৎসবক্ষেত্রে ঈশ্বর তাঁহাকে লজ্জা দিয়া বলিতেছেন, "তুমি হৃদয়ে পাপ লুকাইয়া রাখিবে, মুখে আমার নামও করিবে, এরূপ আর কতদিন চলিবে? এরূপে আমাকে বিদ্রূপ কর কেন?" এইরূপ এক উৎসব-রূপ বাণীর দ্বারা তিনি নানা জনের নানা রোগের ঔষধ বিধান করিতেছেন। কিন্তু আমাদের সকলকে তিনি গম্ভীর স্বরে একটি কথা বলিতেছেন, "ত্রাসযুক্ত হইও না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি সত্যসত্যই বলিতেছি, আমার পুণ্য ভাবের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে তুলিয়া ধরিব। নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।" কি আশাপ্রদ বাণী!

আজ আর কেহ নিরাশ থাকিও না। আজ অবিশ্বাসকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া অপরাধী হইও না। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই চরণাশ্রিত, সুতরাং তিনি ব্রাহ্মসমাজে আছেন ও ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাতে আছে। ইহাকে তিনি তুলিয়া ধরিবেন, নিশ্চয় তুলিয়া ধরিবেন। এই আশাতে সকলে আনন্দিত হই ও প্রসন্ন অন্তরে তাঁহার গুণকীর্তন করি।

১২৯৫

ধর্ম্মসমাজের জীবনী-শক্তি

যেখানে জীবন সেইখানেই যোগ। যতক্ষণ প্রাণী জীবিত আছে ততক্ষণ তাহার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কি সুন্দর আত্মীয়তা। পা-খানি হাতখানি হইতে কত দূরে আছে, সে তাহার কিছু কাজ করে না, কিন্তু হাতখানিকে কাটিয়া দেখ, পা-খানিরও মহা অসুখ উৎপন্ন হইবে। সে আর ভাল করিয়া চলিতে চাহিবে না, চলিয়া আরাম পাইবে না। পা বলিবে, আমার ভাই হাত কাটা গিয়াছে, আমার আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এইরূপ কর্ণের পীড়া হইলে চক্ষু সুন্দর বস্তু দেখিতে চায় না, দেখিয়া সুখী হয় না। দন্তের যাতনা হইলে তাহার প্রতিবেশী রসনা আর মধুর দ্রব্য আস্বাদন করিয়া সুখী হয় না। কি আশ্চর্য আত্মীয়তা! কি আশ্চর্য সমদুঃখসুখতা! কিন্তু জীবনটি একবার যাউক, সেই সুস্থ দেহ পূতিগন্ধময় হইবে, তখন পদ দেহ হইতে খসিয়া পড়িবে, আর হস্তের সহিত এক দেহে থাকিতে চাহিবে না, কর্ণ গলিত হইয়া পতিত হইবে, চক্ষু তাহা গ্রাহ্যও করিবে না। যেখানেই মৃত্যু সেখানেই যোগের বিচ্ছেদ। কেবল জীবদেহে নহে, উদ্ভিদ্‌রাজ্যেও যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ যোগ। পেঁয়াজটি যতদিন জীবিত, তাহার দল-গুলিকে একটি হইতে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া কিরূপ দুষ্কর; কিন্তু তাহা শুষ্ক হউক, দলগুলি আপনিই খসিয়া যাইবে, ধরিবামাত্র একটি অপরটি হইতে স্বতন্ত্র হইবে। অতএব যেখানেই জীবন সেখানেই যোগ।

জীবনের দ্বিতীয় লক্ষণ, যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ সৌন্দর্য। জীবিত মনুষ্য যতই কদাকার হউক না কেন, তাহার একপ্রকার সৌন্দর্য আছে, মৃতের সঙ্গে তুলনা করিলে এ কথা বুঝিতে পারা যায়। জীবিত মানবের

চক্ষের যে জ্যোতি তাহা এক অপূর্ব বস্তু। চক্ষে চক্ষে প্রেমের জন্ম হয়, এক চক্ষু হইতে প্রেমের বিজলী অপর চক্ষুতে ছুটিয়া যায়। ইহার অনেক বর্ণনা কবিগণ করিয়াছেন। চক্ষু নীরব ভাষায় কথা কয়, চক্ষু সংবাদ দেয় ও সংবাদ আনয়ন করে। সে চক্ষুর সৌন্দর্য কতক্ষণ? যতক্ষণ জীবন আছে। জীবন বিলুপ্ত হউক, পরম সুন্দর যে তাহার আর সে শ্রী থাকিবে না, মানব-আননের যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্ধ কবি মিল্‌টন 'মানবের স্বর্গীয় বদন' বলিয়াছিলেন, তাহা আর লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে না।

জীবনের তৃতীয় লক্ষণ, যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ কার্য। হস্ত হস্তের কার্য করে, চরণ স্বীয় কার্য করে, হৃৎপিণ্ড নিরন্তর ব্যস্ত থাকে, শোণিত অনবরত ছুটিতে থাকে, অন্তর-বাহিরের সকল ইন্দ্রিয়ই স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত থাকে। আবার বিধির এমনি ব্যবস্থা, কাজ লইয়া কখনও তাহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় না। যেখানে জীবনী-শক্তি সেখানে আলস্য নাই। আলস্য মৃত্যুর সহোদর, মৃত্যু যখন আসে তখনই ইন্দ্রিয়-গণ চির-আলস্যে নিমগ্ন হয়।

এই সকল সত্য ধর্মসমাজের প্রতি প্রয়োগ করিলে কি দেখা যায়? দেহের পক্ষে যাহা জীবন, ধর্মসমাজের পক্ষে তাহা ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মশক্তি যতক্ষণ জীবন রূপে বাস করে, ততক্ষণ ধর্মসমাজের মধ্যেও এই ত্রিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

প্রথম, সেখানে সকলের মধ্যে এক অপূর্ব যোগ ও আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের প্রাণে প্রাণে এতদূর মিলন থাকে যে, একের ক্লেশে অপরের ক্লেশ হয়। এই যোগের এরূপ অর্থ নয় যে, তাঁহাদের মধ্যে মত ও রুচি -গত পার্থক্য আর থাকে না, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতিগত ও কার্যগত সকল প্রকার পার্থক্যের মধ্যেও উদ্দেশ্যগত

একতা দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় একবার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঐক্যতান বাদ্যে যখন নানা বাদ্যযন্ত্র একত্র হইয়া বাজে, তখন যেমন প্রত্যেক যন্ত্র স্বতন্ত্র সুরে বাজে অথচ শুনিতে বোধ হয় যেন একখানি যন্ত্রই বাজিতেছে, তেমনি আমাদের দশজনের হৃদয়ের সুর ঈশ্বর-প্রেমে মিলিত হইয়া এক সুরের ন্যায় তাঁহারই চরণপ্রান্তে পৌছিবে। ইহা অপেক্ষা যোগের সুন্দর দৃষ্টান্ত আর শুনি নাই। ব্যক্তিগত পার্থক্য ঘুচাইয়া যে যোগ তাহা সম্ভবপর নহে এবং তাহা প্রার্থনীয় নহে; প্রেম ও লক্ষ্য-গত যে যোগ, তাহাই প্রার্থনীয় ও তাহাই কল্যাণজনক।

ব্রহ্মশক্তির অধিষ্ঠানে যেমন লক্ষ্য ও প্রেম-গত যোগ, সেইরূপ কার্য-ক্ষেত্রেও অবিবাদ। জীবিত জীবদেহে যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক অপরকে তাহার কাজ করিতে বলে না, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি দ্বারা পরিচালিত সমাজেও জ্ঞানী, ভাবুক ও কর্মীদিগের মধ্যে বিবাদ থাকে না।

জীবনের তৃতীয় লক্ষণ সৌন্দর্য, কিন্তু ধর্মসমাজের সৌন্দর্য কি? ধর্মসমাজের কোন্ ভাব দেখিয়া জগৎ-বাসীর মন আকৃষ্ট হয়? বিশ্বাস, বৈরাগ্য, আত্মসংযম প্রভৃতিই ধর্মসমাজের মুখশ্রীর শোভা। যে পরিমাণে বৈরাগ্য, আত্মসংযম ও পবিত্রতার লক্ষণসকল ধর্মসমাজের মধ্যে দৃষ্ট হয়, ততই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মশক্তি তথায় কার্য করিতেছে।

সর্বশেষে প্রশ্ন এই, কি উপায় অবলম্বন করিলে ধর্মসমাজ-মধ্যে ব্রহ্ম-শক্তি অবতীর্ণ হয়? তাঁহার আবাহনের মন্ত্র কি? ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করিলে কি ইহার কোনও উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়? খ্রীষ্টধর্ম যে আপনার জীবনী-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ ধর্ম যখন প্রথমে প্রচারিত হইল, তখন দরিদ্র সহায়সম্বলহীন ব্যক্তিদের

দ্বারাই প্রচারিত হইল, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহাকে দুইটি প্রবল শক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। প্রথম, তদানীন্তন রোমীয় সভ্যতা; দ্বিতীয়, গ্রীকদেশের পাণ্ডিত্য। এই দুইটি দুই প্রাচীরের ন্যায় সেই নবোদিত ধর্মের পথে দণ্ডায়মান হইল। রোমকগণ ইহাকে যে কেবল ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহা নহে, পদ দ্বারা দলন করিবারও চেষ্টা করিতেন। গ্রীক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ ইহাকে অজ্ঞের জল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু চরমে তাঁহাদিগকে ইহারই নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইল।

এত বড় শক্তি কোথা হইতে আসিল? কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে দেখা যায়, যীশুর প্রথম শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পর আপনাদের বুদ্ধি বা বলের উপর নির্ভর না করিয়া দিবারাত্রি ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং আপনাদের মধ্যে এই নিয়ম স্থাপন করিলেন যে, যে কেহ তাঁহাদের মণ্ডলীতে প্রবেশেচ্ছু হইবে, তাহাকে সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ধন তাঁহাদের সাধারণ ধনাগারে দিতে হইবে। এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায়, যীশুর আদিম শিষ্যগণ কিরূপ নিঃস্বার্থতার অগ্নিতে উদ্দীপ্ত ছিলেন।

তাঁহাদের মণ্ডলী-সংক্রান্ত আর-একটি ঘটনা আছে, তাহা হইতেও অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের মণ্ডলী যখন বাড়িতে লাগিল, তখন প্রথমে যীশুর দ্বাদশজন প্রেরিত শিষ্যই তাঁহাদের সর্বপ্রকার পরিচর্যা করিতেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অভিযোগ ও অসন্তোষের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। গ্রীকদেশবাসী য়িহুদী শিষ্যগণ বলিতে লাগিল যে, তাঁহাদের বিধবাদিগের প্রতি প্রেরিতদিগের যথেষ্ট মনোযোগ নাই। ইহা শুনিয়া প্রেরিতগণ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইলেন না, তৎক্ষণাৎ মণ্ডলীর সকল লোককে সমবেত করিয়া কহিলেন,

"ধর্মসাধন ও ধর্মপ্রচারে আমাদের অনেক সময় যায়, এজন্য আমরা মণ্ডলীর সাংসারিক পরিচর্যার সময় পাইতেছি না, অতএব তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে সাতজনকে প্রতিনিধি রূপে মনোনীত কর, তাঁহারাই আমাদের সহকারী হইয়া সাংসারিক সকল বিষয় দেখিবেন।" তদনুসারে সাত ব্যক্তি মণ্ডলী কর্তৃক মনোনীত হইলেন। ইহাই নিয়মতন্ত্র-প্রণালী। যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ যদি আপনাদের মস্তক অবনত না করিতেন, যদি আপনাদিগকে হীন করিয়া তাঁহাদের সমাজের কার্যকে উচ্চ স্থান না দিতেন, তাহা হইলে সেখানে শান্তি-স্থাপন হইত না।

অতএব ব্রাহ্মসমাজ-মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মশক্তির লীলা দেখিতে চান, তাঁহাদিগকে দুইটি কার্য করিতে হইবে। কায়-মন-প্রাণে বিশ্বাসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, প্রার্থনাকে একমাত্র সম্বল রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের নিকটে আপনার মস্তককে সর্বদা অবনত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মশক্তি আমাদের অন্তরে বাস করিবেন, আমাদের মধ্যে যোগ, পবিত্রতা ও সদনুষ্ঠান সমুদয় প্রস্ফুটিত হইবে।

১২৯৬

তুমি আমার ঢাল

শিখগুরু বাবা নানকের অনেক সংগীত অতি উচ্চভাবে পূর্ণ, তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রব হয়। অমৃতসরের গুরুদরবারে গম্ভীরাকৃতি প্রশস্তললাট বিশালবপু বর্ষীয়ান্ শিখগণ বীণারবাব-সহকারে বাবা নানকের এই সকল সংগীত যখন গান করেন, তাহা শ্রবণ করিলে অন্তরাত্মা আর্দ্র হয়। একটি সংগীতে নানক কহিতেছেন, "তু মেরে ওঠ্ বল, বুদ্ধি ধন তুম্হি, তু মেরে পরিবার।" বাবা নানকের মুখ দিয়া যখন এই কথা উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই দিনের কথা চিত্রিত করা যাউক।

একজন সামান্য বণিক্-সন্তান ধন উপার্জন করিতেছিল, সংসারের অপর লক্ষ লক্ষ লোকের ন্যায় দিন কাটাইতেছিল, কি শুভদিনে কেমন করিয়া পরমেশ্বর তাহার প্রাণে উদিত হইলেন, আর তাহার পূর্বের জীবনে স্বাদ রহিল না। বিষয় ভাল লাগিল না, স্ত্রীপুত্র ও গৃহসুখের কোনও বন্ধন রহিল না, ঈশ্বর তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন, নানক ফকির হইয়া গৃহের বাহির হইলেন। পথের লোক হয়ত তাঁহাকে প্রশ্ন করিত, "তুমি ত ধন উপার্জন করিয়া ধনী হইতে পারিতে, তাহা না হইয়া বীণারবাব লইয়া পথে পথে কেন বেড়াও? পথে দস্যুতস্কর আছে, তাহারা তোমাকে মারিয়া তোমার সর্বস্ব হরণ করিবে।"

এই সকল কথা শুনিয়া তিনি নিশ্চয়ই এই সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাই বলিলেন, "প্রভু, লোকে বলে আমি অসহায়, কিন্তু তুমি আমার বল। লোকে বলে আমি নির্বোধ, কিন্তু তুমি আমার বুদ্ধি। লোকে বলে আমার আত্মরক্ষার উপায় নাই, কিন্তু তুমিই আমার ঢাল।"

কি গভীর প্রেমের অবস্থায় নানকের মুখ দিয়া এই কথা বাহির

হইয়াছিল। ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, বুদ্ধি, সহায়, সম্বল প্রভৃতি বলা যাইতে পারে, কিন্তু "তুমি আমার ঢাল" ইহা নূতন কথা।

যুদ্ধে যাইতে হইলে দুইটি অস্ত্র আবশ্যক, ঢাল ও তরবারি। পৃথিবীর সাধুরা কিসের দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন? যাঁহারা জগতের ভার লঘু করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোটি লোকের ক্রন্দন শুনিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, স্ত্রীপুত্র রাখিয়া মানব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন্ অস্ত্র লইয়া সংসার-যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন? আমরা জানি, তাঁহাদের সকলকেই অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইয়াছিল—জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইতে হইয়াছিল। যত অপমান নির্যাতন ও কলঙ্কের ডালি মাথায় দিয়া যেন বিধাতা তাঁহাদিগকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহাকে ডাকিল না তাহারা সুখে রহিল, আর যাহারা তাঁহার নামে জীবন উৎসর্গ করিল তাহারা দুঃখে কষ্টে চিরদিন ছিন্নভিন্ন হইল, বিধাতার কি ইহাতে অবিচার হইয়াছে? না, সংসারে দেখা যায়, যেখানে ভালবাসা, সেখানেই বোঝা, চাপ। যেখানে প্রেম, ভালবাসা ও বিশ্বাস আছে, সেখানেই বোঝা চাপাইতে সাহস হয়। পরমেশ্বরকে যাহারা প্রাণমন দিয়াছে, তিনি তাহাদের উপরই কাজের ভার দেন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রেম ফুটিয়া বাহির হইবে। চারিদিকে অনুকূল অবস্থা থাকিলে প্রেম ফুটিবে কেন? এইজন্য সাধুদিগকে ভয়ানক ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু যখন তাঁহারা সংসার-সংগ্রামে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা কোন্ অস্ত্র লইয়া সংসার-যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন? তাঁহারা ব্রহ্মনামের ঢাল পৃষ্ঠে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

এই সময়ে সকলকে এই ঢাল পৃষ্ঠে বাঁধিতে হইবে। শুনিয়াছি,

তুমি আমার ঢাল

স্পার্টাদেশে বীরজননীগণ বীর পুত্রগণের পৃষ্ঠে ঢাল বাঁধিয়া দিয়া বলিতেন, "হয় জয়ী হইও, নতুবা মরিও।" স্পার্টান জননী যেরূপ বলিতেন, "হয় জয়ী হইও, নতুবা মরিও", জগৎ-জননী সেরূপ বলিবেন না, তিনি বলিবেন, "জয়"। আমরা তাঁহার আহ্বান শুনিয়া অগ্রসর হইব। কে আছ, অস্ত্র নিক্ষেপ কর, ব্রহ্মনামের ঢাল আমাদের পৃষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে, সুতরাং আমাদের মৃত্যু নাই।

১২৯৭

ঈশ্বরের মনোনীত কে ?

একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধক বলিয়াছেন, প্রভু পরমেশ্বর বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনকে আপনার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে কি গভীর অর্থ! সকলেই তাঁহার সন্তান, সকলের উপরেই তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আছে, সকলকেই তিনি ভয়-বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেছেন, সকলকেই মাতৃগর্ভে জরায়ু-শয্যায় রাখিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন এবং জগতে আনিয়া রক্ষা করিতেছেন। কাহারও উপরে তাঁহার করুণা-দৃষ্টির অভাব নাই। যাঁহারা তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত লোক, যাঁহারা তাঁহাকে হৃদয়মন অর্পণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকেই দয়া করেন, তাঁহাদেরই দুঃখে সাহায্য করেন ; আর যাহারা তাঁহাকে স্মরণ করে না, তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, যাহাদের পাপ মিষ্ট লাগে, যাহারা তাঁহার গুণানুবাদ করে না, তাহাদের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি নাই, তাহাদের বিপদে তিনি আসেন না— এরূপ নয়। আমরা তাঁহার গুণানু-বাদ করিলে যে তাঁহার বেশি প্রিয় হইব তাহা নয়, তিনি স্তুতিবাদের বশীভূত নহেন। তাঁহার মহিমা কীর্তন করিলে তাঁহার কোনও উপকার করা হয় এরূপ বুদ্ধি কাহারও থাকিলে তিনি ত্বরায় তাহা দূর করুন। তিনি করুণাদানে কখনই কাহারও প্রতি বিমুখ নহেন।

মানুষের সময়ে সময়ে এরূপ দুরবস্থা হয় বটে যে, পাপই তাহার মিষ্ট লাগে ; ইচ্ছা করিয়া প্রাণের প্রদীপ নিবাইয়া অন্ধকারে বসিয়া পাপের বিষ পান করিতে ভালবাসে। এরূপ দুরবস্থা ঘটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব নহে। মানুষের এতদূর দুর্গতিও ঘটে যে, পাপপঙ্ক নিজহস্তে দেহে মাখিয়া বলে, "আমি ঈশ্বরের গৃহে থাকিতে চাই না, অধর্মের শিবিরে বাস করিব। যেখানে দুষ্কর্মান্বিত নরনারী বাস করিতেছে সেখানেই বাস করিব। ঈশ্বরের নামে আমার প্রয়োজন নাই।"

কিন্তু এরূপ অবস্থা ঘটিলেও কি ঈশ্বরের করুণা ঘৃণা করিয়া পাপীকে ত্যাগ করে ? কখনই না। আমাদের ক্ষুদ্র মানবীয় প্রেমেই ইহা সম্ভব হয়। পরের প্রতি নিতান্ত দয়াবান্, উদার ও মহৎ-হৃদয় সাধুগণের প্রেমও কখন-কখনও ক্লান্ত হইয়া পড়ে ; পাপীর পাপ-প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদেরও প্রেম নিরাশ হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের প্রেমও যদি এইপ্রকার হইত, তবে আর আশা-ভরসা ছিল না। পাপী আপনার চারিদিকে পাপের প্রাচীর তুলিয়া দিয়া মনে করে, সে দুর্গ হইতে ঈশ্বর ধরিয়া লইতে পারিবেন না, কিন্তু বাঘ যেমন লম্ফ দিয়া বেড়া ডিঙাইয়া মেষশিশুকে লইয়া যায়, সেইরূপ পরিত্রাতা ঈশ্বরের প্রেম পাপীর পাপের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া তাহাকে ধরে। তাঁহার এই করুণার পরিচয় কি আমাদের অনেকে স্বীয় স্বীয় জীবনে পাই নাই ?

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই, তিনি ত সকলকেই কৃপা করেন, কিন্তু কাহাকে তিনি আপনার জন্য রাখিয়াছেন ? যে ব্যক্তি সংসারের ধন-মান-যশের নিকটে বিক্রীত, সে ত আর ঈশ্বরের জন্য নহে ; যে ইন্দ্রিয়-সুখের পশ্চাতে ধাবিত ও তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, সে ব্যক্তি ত আর আপনাকে ঈশ্বরের জন্য রাখে নাই। এইরূপে এই সংসারের লক্ষ লক্ষ লোকের বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখ, মহানগরের রাজপথের বিপুল জন-কল্লোলের বিষয় ভাবিয়া দেখ, সংসারের নানাপথে যে-সকল লোক ভ্রমণ করিতেছে তাহাদের বিষয়ে ভাবিয়া দেখ, কয়জন এরূপ লোক দেখিতে পাও যাহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরের জন্য রাখিয়াছে ? যে আপনাকে তাঁহার জন্য রাখে না তাহার সেবা ত তিনি বলপূর্বক লইতে চাহেন না, সুতরাং যে আপনাকে তাঁহার জন্য না রাখিল তাহাকেও তিনি নিজের জন্য রাখিতে পারিলেন না।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম শ্রবণ করুন, ঈশ্বর আজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

"সকলেই যদি বিষয়-সুখের পশ্চাতে, ধনমানের পশ্চাতে ধাবিত হইল, তবে আমার জন্য রহিল কে?" তাঁহারা কি তাহার উত্তরে বলিবেন না, "এই যে আমরা তোমার জন্য আছি।" বাইবেল পড়িলেই দেখা যায়, যেদিন যীশুর শত্রুগণ তাঁহাকে হত করিবার জন্য ধৃত করেন, সেদিন তাঁহার শিষ্যদলের সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, কেবল কয়েকজন প্রেরিত শিষ্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল। যখন সকলেই চলিয়া গেল, তখন যীশু ফিরিয়া ঐ কতিপয় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরাও যাবে নাকি?" সেই প্রশ্নের মধ্যে কি গভীর তিরস্কার লুক্কায়িত ছিল! আজি সেইরূপ মুক্তিদাতা ঈশ্বর ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমরাও যাবে নাকি?"

হায়! আজ স্বর্গের প্রভু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আপনার অনেক সন্তান খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তিনি বলিতেছেন, "আমি যাহাদিগকে কিনিয়া আনিয়াছিলাম, পাপের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া স্বর্গরাজ্য সাজাইব বলিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহারাও গেল?" কে আমাদের ভাই-ভগিনীকে চুরি করিয়া লইয়া গেল? তাহারা যে ঈশ্বরের জন্যই ছিল। কে তাহাদিগকে অন্য প্রভুর দাসত্বে নিযুক্ত করিতে লইয়া গেল? তাহাদের প্রাণে যে তাঁহার নামের চিহ্ন ছিল, কি করিয়া কোন্ জল দিয়া কে সে চিহ্ন ধৌত করিয়া ফেলিল? তবে কি ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্য দিতে কেহই থাকিবে না? সংসারাসক্তি, পদগৌরব, তোমাদের চরণে ধরি, ঈশ্বরের সাথিকে বাঁধিয়া রাখিও না, ছাড়িয়া দাও, দাসত্বপাশ মোচন করিয়া দাও। ইহারা যে তাঁহারই জন্য রহিয়াছে।

ঈশ্বর বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনকেই নিজের জন্য রাখিয়াছেন, তদ্‌ভিন্ন আর কাহাকে রাখিবেন? যে প্রাণ দেয় না তাহাকে কিরূপে

ধরিবেন ? অন্যে তাঁহার বোঝা বহিবে কেন ? অন্যে তাঁহার জন্য ক্লেশ করিবে কেন ? অতএব বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনকেই তিনি নিজের জন্য রাখিয়াছেন। কেন রাখিয়াছেন ? নতুবা তাঁহার করুণার লীলা জগতে প্রকাশ হইবে কিরূপে ? তাঁহার শক্তি মানব-হৃদয়ে ক্রীড়া করিলে কি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে তাহা জগৎ দেখিবে কিরূপে ? বিশ্বাসী ও প্রেমিক জনেরই হৃদয়ে তাঁহার শক্তি অবতীর্ণ হইয়া জগতের উদ্ধার সাধন করিয়াছে, লীলাময়ের বিচিত্রলীলা প্রকাশ করিয়াছে। ঈশ্বরের বিশেষ কাজ পাপীর উদ্ধার, মানবের পরিত্রাণ, পাপের সহিত সংগ্রাম। তিনি তাঁহার বিশ্বাসী ও প্রেমিক সন্তানদিগকে তাঁহার এই কাজ করিবার জন্যই জগতে আনয়ন করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম, ভাবিয়া দেখ, তিনি তোমাকে কিসের জন্য রাখিয়াছেন ? তোমরা সংসারে সুখের রাজ্য পাতিয়া বসিবে, ইহারই জন্য ? ধন-ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়া ধনী-মানীদের মধ্যে একজন হইবে, ইহারই জন্য ? তোমরা বেশ অবাধে ইন্দ্রিয়-সেবায় মগ্ন হইবে, এই জন্য ? না, ঐ পাপের দুর্গ আক্রমণের জন্য, ঐ দুর্গে ব্রহ্মের বিজয়-নিশান উড়াইবার জন্য ? ঈশ্বর তোমাদিগকে নিজের জন্য রাখিয়াছেন, তাঁহার নামে তোমাদিগকে চিহ্নিত করিয়াছেন। বিশ্বাস-বলে আজ বদ্ধপরিকর হও। পাপ ও ইন্দ্রিয়াসক্তির মস্তক চূর্ণ করিয়া তাঁহার সেবা করিবে বলিয়া দণ্ডায়মান হও। ব্রহ্মকৃপার জয় হউক।

১২৯৮। পূর্বাহ্ন

ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়

ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা অলস, তাহাদিগকে অল্প আয়াসে বিদ্যাশিক্ষা দিবার নানারূপ সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়। সেই সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া অল্প পরিশ্রমে কিরূপে বিদ্যা আয়ত্ত করা যাইতে পারে তাহার কৌশল বাহির করিবার জন্য অলস ছাত্রেরা সর্বদাই ব্যস্ত।

ধর্মজগতের অলস ছাত্রেরাও এই কাজে সর্বদাই ব্যস্ত। ঋষিগণ বলিয়াছেন, "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" পণ্ডিতেরা ধর্ম-পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই দুর্গম পথ কিরূপে সহজ হইয়া যায়, বেশি পরিশ্রম না করিয়া কিরূপে ধর্ম উপার্জন করা যায়, তাহার জন্য ধর্মরাজ্যের অলস ছাত্রেরা সর্বদাই ব্যস্ত। সাধুগণ বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইবে, নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, প্রাণমন ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু ধর্মপথের অলস ছাত্রেরা ধর্মের সহজ সংস্করণ বাহির করিবার জন্য সর্বদাই তাহার নানা উপায় উদ্‌ভাবন করিতে ব্যস্ত।

তাঁহারা সারা রাত্রি জাগিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতে, ধর্মের কথা শুনিতে, ঈশ্বরের নামকীর্তন করিতে, অশ্রু বিসর্জন করিতে, ধর্মরাজ্যের সপ্তম স্বর্গের কথা বলিতে, সমস্ত রাত্রি উপাসনায় বসিয়া থাকিতে— এ সকলই করিতে প্রস্তুত, কিন্তু দুটি টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। কাহারও কাহারও জন্য যদি ধর্মকে এমন সহজ করা যায় যে, উপাসনার রস আস্বাদন করা যাইবে, কিন্তু স্বার্থ ছাড়িতে হইবে না, তবে তাঁহারা প্রস্তুত। কাহারও কাহারও মন লোকের অনুরাগ-বিরাগের বড় অপেক্ষা করে, তাঁহাদের জন্য যদি ধর্মকে এমন করা যায় যে, ঈশ্বরের মন-রক্ষা হইবে লোকেরও মন-রক্ষা হইবে,

তবে তাঁহাদের পক্ষে বড় সুবিধা হয়, সে প্রকার ধর্ম তাঁহারা সেবা করিতে পারেন।

ইহা কল্পনা নয়, মানুষ উঠিতে পারে না বলিয়া, আপনার নিগূঢ় দুর্বলতা ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া, আপনাকে সংশোধন করিতে পারে না বলিয়া ধর্মকে আপনার নিম্নস্থানে নামাইয়া আনিয়া তাহা সাধনের চেষ্টা করে। সার কথা এই— তাহারা ধর্মের মত হইতে চায় না, ধর্মকে আপনার ন্যায় করিয়া লয়; ধর্মের অধীন হইতে ইচ্ছা করে না, ধর্মকে আপনার অধীন করে। যে ধর্ম করিলে প্রবঞ্চনা জাল ও মিথ্যা কথা বলিয়া টাকা উপার্জন করা যায়, তাহা লইতে তাহারা অসম্মত নয়, কিন্তু যেখানে ধর্ম ও স্বার্থের সংঘর্ষণ তথায় স্বার্থ লইতে প্রস্তুত।

ইহার নাম ধর্ম নহে, সহজে ধর্ম করিবার প্রবৃত্তি যতদিন আছে, ততদিন কিছুই হয় না। পাপের প্রতি ঘৃণা হইয়াছে কি না, পাপ প্রিয় আছে কি না, তাহা মিষ্ট লাগে কি না, হৃদয় পরিবর্তিত হইয়াছে কি না, তাহা ঈশ্বরকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে। সমগ্র হৃদয়মন পরিবর্তিত করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে হইবে। সংসারাসক্তির দিকে পশ্চাৎ করিয়া মুখ ঈশ্বরের দিকে ফিরাইতে হইবে, নতুবা কিছুই হইবে না।

তবে স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়াসক্তি, আলস্য বিদায় লউক, কঠোর সাধনা আসিয়া অবতীর্ণ হউক। আমরা কায়-মন-প্রাণে ব্রাহ্মধর্ম সাধন করি, সত্যস্বরূপের দিকে চক্ষু রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করি যে, ধর্মকে আপনার মত করিব না, কিন্তু দেহ-মন-প্রাণ ইচ্ছাময়ের সম্পূর্ণ অধীন করিব। ব্রহ্মের বিজয়কেতন আমাদের পরিবার, জীবন, হৃদয় সকলের উপর উড্ডীয়মান হউক।

১২৯৮। সায়াহ্ন

জ্ঞান ও কর্ম

যোগবাশিষ্ঠে একটি বচন আছে—

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা মে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্মভ্যাং জায়তে পরমাং পদং ॥

এই জ্ঞান ও কর্মের অর্থ এ দেশে অন্যপ্রকার। এখানে জ্ঞানের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান, যে জ্ঞান সন্ন্যাসকে আনয়ন করে; কর্মের অর্থ ক্রিয়াকাণ্ড। উক্ত উপদেশের মর্ম এই—ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্রিয়াকাণ্ড অবহেলা করিলে চলিবে না। আমরা উহার আর-এক অর্থ করিতে পারি—প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত কর্ম যাহা, তাহা মানুষকে পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত করে।

জ্ঞানের অর্থ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞান। জ্ঞানের প্রেরক অনেক ভাব হইতে পারে। কোনও জ্ঞানের মূল স্বার্থ। একজন সমাজতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে, অথচ তাহার মূলে স্বার্থ থাকিতে পারে। ঐহিক মানসম্ভ্রম লাভের বাসনা হয়ত সেই জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে। এই জ্ঞান মানুষকে ব্রহ্মসদনে উপস্থিত করে না। আর-এক প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা অহংকার-প্রসূত। "আমি পণ্ডিত, আমি বুদ্ধিমান্, চতুর, সূক্ষ্মদর্শনে সমর্থ, আমি জগতের প্রতিষ্ঠাভাজনের উপযুক্ত" এইরূপ রাজসিক ভাব যে জ্ঞানের মূলে, তাহা মানবকে ব্রহ্মসদনে উপস্থিত করে না। আর-এক প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা রাজসিক বা তামসিক নয়, অথচ সাত্ত্বিকও নয়। তাহার মূলে স্বাভাবিক কৌতূহল। এই ঘটনাটি কেন এইরূপ হইল, উহার ধর্ম কি, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য এই জ্ঞান ব্যস্ত। এই কৌতূহলের নিন্দা করা উচিত নয়। এই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার ভাব

হইতে কখন-কখনও সাত্ত্বিক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। তথাপি ইহা সাত্ত্বিক জ্ঞান নয়।

ইহার উপরে আর-এক উৎকৃষ্ট জ্ঞান আছে। তাহা কি? যে জ্ঞান জগৎ, সমাজ, মানবাত্মার মধ্যে অনন্তের আভাস পাইয়া অনন্তে ডুবিয়াছে, চঞ্চল ঘটনাবলীর মধ্যে সারবস্তুর আভাস পাইয়া তাহাকে ধরিয়াছে, সত্যের প্রেমে আপনাকে ভুলিয়াছে, এ জ্ঞান তাহাই। পৃথিবীর জ্ঞানীদের মধ্যে এরূপ স্বার্থনাশ দেখা গিয়াছে। সাধু জ্ঞানীরা ও জ্ঞানী সাধুরা স্বাভাবিক রূপে যে বৈরাগ্য পাইয়াছেন তাহা কোনও সন্ন্যাসী পাইয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়। তাঁহারা আহার-নিদ্রা ভুলিয়াছেন, সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপেক্ষা করিয়াছেন। জ্ঞানান্বেষণে নিমগ্ন হইয়া তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে পাগল বলিয়া মনে হইত, যেন ত্রিসংসারে ইঁহাদের কেহ নাই। ইঁহারা জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়া পাগল হইয়াছিলেন। এই যে প্রেমসম্ভূত সাত্ত্বিক জ্ঞান, তাহা দীনতা আনিয়া দেয়। যাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিনয় বাড়িয়াছে। সত্যের রাজ্যে তাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা দেশকালের অতীত। স্বার্থের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে যাহারা বাস করে, তাহারা দেশ-কাল-মৃত্যুর মধ্যে বাস করে। ক্রিয়াসক্তি, স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়-পরতার কূলে যাহারা বাস করে, অনন্ত আকাশে কি আছে তাহা তাহারা জানে না। কিন্তু সত্যের অনন্তভূমি যে পাইয়াছে, সে দেশ ও কাল ছাড়াইয়াছে। এই জ্ঞান স্বভাবতই পবিত্রতা আনিয়া দেয়। স্বার্থ, সুখাসক্তি যদি চলিয়া গেল তবে আর পবিত্রতা আসিবে না কেন? মন সে জ্ঞানে পবিত্র হয়। যখন জ্ঞান দ্বারা মন পবিত্র হয়, তখন ব্রহ্মদর্শন হয়। উপনিষৎ বলিয়াছে, জ্ঞানপ্রসাদে চিত্তবৃত্তি পবিত্র হইলে ভগবানকে দেখা যায়। মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন, Blessed are the

pure in heart for they shall see God, নির্মলাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন।

ব্রহ্মদর্শন হইলে ত প্রেম। প্রেম কি ছেলেখেলা, মুখের কথা? কথার জালে আমরা ব্রহ্ম-পাখি ধরিব? মন যখন স্বার্থ-সুখাসক্তির উপরে উঠিতে পারে, তখনই ব্রহ্মভূমিতে উঠে। পৃথিবীর মেঘের উপরে যাও, সাত্ত্বিক জ্ঞান ধরিয়া স্বার্থ ও সুখাসক্তির উপরে যাও, দেখিবে সেখানে সত্যের বিমল বায়ু, সত্যসূর্যের পবিত্র জ্যোতি। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলে, "জগতের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।" মুক্তি হইলে তবে ভক্তি হয়। স্বার্থের উপরে গেলে তবে ভক্তি।

জ্ঞানের দিকে যেমন কর্মের দিকেও সেইরূপ। কর্মও তিন প্রকার। এক প্রকার কর্ম স্বার্থ-প্রসূত। তাহা ব্রহ্মসদনে লইয়া যায় না। আর-এক প্রকার কর্ম আছে, তাহা অহংকার-প্রসূত। "আমি একজন, আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে ভালবাসি, আমি সব করিতে পারি, নিজের উপর খুব বিশ্বাস আছে।" জিগীষা-বৃত্তি প্রবল। তাহাতে মানুষকে বন্ধন করে। আর-এক প্রকার কর্ম রাজসিকও নয়, তামসিকও নয়। তাহা অভ্যাস-প্রসূত। অনেক লোকের এরূপ স্নায়ু যে কিছু না করিয়া থাকিতে পারে না। একটা কিছু করাই চাই, নতুবা অসুখ বোধ হয়। কাজ করিয়া সুখ পায় বলিয়া করে। এইরূপ কর্ম ব্রহ্ম-সদনে মানবকে লইয়া যায় না।

আর-এক প্রকার কর্ম আছে, তাহা প্রেম-প্রসূত ও ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা প্রসূত। ও লোকটি দুঃখীর দুঃখ হরণের জন্য এত ব্যস্ত কেন? দরিদ্রের বাড়িতে বসন্ত, বন্ধুগণ সাবধান করিতেছেন, অথচ উহাকে সামলাইতে পারা গেল না, সে বাড়িতে গেল, এমন দেখিয়াছি। ইহা প্রেম-প্রসূত, আবার ঈশ্বরের আদেশ-প্রসূত। তিনিই বলিয়াছেন, প্রভুর

হুকুম-বলে কাজ, অহংকার আসিবার পথ থাকিতে পারে না। যাহা বাধ্য হইয়া করা হয়, তাহার জন্য আবার অহংকার কি? যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহা করিলে আবার বাহাদুরি কি? প্রভু বলেন, তাই ধর্মের প্রচার করি। এ কাজে হাত দিই, প্রশংসা-নিন্দার অপেক্ষা রাখি না। প্রভুর হুকুম— এই মাথা দিলাম, ক্লেশ দাও, দুঃখ দাও, হুকুম তামিল করিতেছি, না করিলে নরকে যাইতাম।

তাঁহার ইচ্ছায় ইচ্ছা রাখিয়া যে কাজ করা যায় তার নাম সাত্ত্বিক কর্ম। গীতা বলেন— সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃসমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। এই সাত্ত্বিক জ্ঞান ও কর্ম যখন মিলিত হয়, তখন মানুষ ব্রহ্মসদনে যাইতে পারে। যে জ্ঞানে পবিত্রতা আসে, যে কর্মে দীনতা আসে, যেখানে অহংকার নাই, সেইখানে বৈরাগ্য আসে, সেইখানে ঈশ্বর-প্রেমে মানব-হৃদয় অনলে পতঙ্গের মত প্রবিষ্ট হয়, ব্রহ্মসেবায় ডুবিয়া আত্মহারা হয়। এইরূপ সাত্ত্বিক কর্ম দেশকালের উপরে লইয়া যায়।

যখন জ্ঞান, কর্ম ও তার সঙ্গে প্রেম আসিয়া মিলিত হয়, তখন সত্য-স্বরূপের প্রকাশ হয়। নিঃস্বার্থতার বিমল বাতাসে ভগবান্ বিহার করিতে ভালবাসেন। যে সমাজে এইরূপ লোকের সংখ্যা বেশি, সেখানে ব্রহ্মশক্তির ক্রীড়া হয়, তাঁর প্রকাশ হইয়া থাকে। এই হৃদয়ের পবিত্রতা পাইলে প্রভু যে দয়ালু তাহা আস্বাদন করিতে পারি। কত দয়ার কথা হইতেছে, কোথায় তাঁর দয়া? তাহার কি ভার আছে, তাহা কি বুঝা যায়? কেবল পবিত্র চিত্তেই তাহা বুঝা যায়। মানুষের সুখদুঃখেরও ভার আছে, প্রেম থাকিলেই তাহা বুঝা যায়।

আমরা ত লক্ষ লক্ষ লোক ভারতের দুর্গতির কথা বলিতেছি, সে দুঃখের বোঝা অনুভব করিতেছি না কেন? আর চৈতন্যই বা জগতের দুঃখ দেখিয়া ঘরের বাহির হইলেন কেন? এই এক আশ্চর্য

কাণ্ড। যাহারা পাপে ডুবিয়া রহিয়াছে তাহারা তাহার বোঝা অনুভব করিতে পারে না, আর-একজনের উপর তাহা পড়িতেছে। প্রেমে এইরূপ হয়। দুর্বৃত্ত সন্তান কোন্ পাপের কুণ্ডে পড়িয়াছে, জননী রাত্রিতে ছটফট করিতেছেন। পাপ যে করিতেছে তাহাকে যাতনায় ধরিল না, ধরিল আর-একজনকে। হাজার হাজার পাপী ঘুমাইয়া রহিল, আর ঈশার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার নাম হইল the Man of Sorrows— এ এক আশ্চর্য লীলা।

তাই বলিতেছি, প্রেম না থাকিলে প্রেমের খেলা কেহ বুঝিতে পারে না। এই সকল ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা এখানে আসিয়াছেন, একবার প্রেম-বিহীন চক্ষে দেখ, কে কোথাকার লোক, ইহাদের ক্লেশ দেখিলে মনে লাগিবে না। একবার প্রেমচক্ষে দেখ দেখি, দেখিবে উহাদের প্রেমের আঘাত হৃদয়ে লাগিবে, এক হৃদয়তন্ত্রীতে ব্রহ্মনাম বাজিবামাত্র অপর সকল হৃদয়তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইবে। এই জন্যই সাধুরা বলিয়াছেন, প্রেম হৃদয়ে থাকিলে প্রেম বুঝা যায়। এই জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম মিলিলে তাঁহার দয়া আসে। পুরাতন বাইবেলে আছে, "আবেদন কর, আমার প্রভু দয়ালু।" দয়া কেবল অন্যের মুখে শুনিতে হয় না, আত্মার রসনায় আস্বাদন করিতে হয়। ইহাই ধর্মের প্রকৃত ভূমি। সত্যময় রাজ্যে বিশ্বাসিগণ বাস করেন। সেখানে সংশয়ের অন্ধকার নাই, পাপের অন্ধকার নাই, সেখানে ব্রহ্মশক্তির নৃত্য ও ক্রীড়া, সেখানে পাপীর নবজীবন লাভ, পুণ্য জীবনের জয়। এ মুক্তি-রাজ্যে প্রবেশের বাসনা আছে? না ক্ষণিক উৎসাহ লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে চাও? নবজীবন চাই। ক্ষণিক ভাবে তৃপ্ত হইলে চলিবে না। ঐ রাজ্যে যাইতে হইবে। তবে সেইভাবে আমাদের প্রার্থনা উত্থিত হউক।

১২৯৯

ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ

"ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" পূর্বকালে মহাত্মারা ত্যাগ দ্বারাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপনিষদেরও পূর্বে যে-সকল ধার্মিক লোক ছিলেন, তাঁহারা একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্বকে পাইয়াছিলেন। তাই উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিতেছেন, আমাদের পূর্বের মহাত্মারা ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মানবাত্মা ত চিরদিনই অমর, ত্যাগের দ্বারা আবার অমর হওয়ার অর্থ কি? উপনিষদে এ বিষয়ে উক্ত আছে—

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥

"যে সময়ে এখানে সমুদয় হৃদয়গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন, এই মাত্র উপদেশ জানিবে।" ইহার অর্থ এই— আমরা যখনই 'অমর' 'অমৃতত্ব' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিব, তখনই বুঝিব হৃদয়-গ্রন্থি হইতে মুক্তি, সমুদয় কামনা হইতে নিষ্কৃতি। কিসের দ্বারা সেই সকল মহাত্মারা অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ত্যাগের দ্বারা, কেবল ত্যাগের দ্বারা— ত্যাগেনৈকেন। ত্যাগ কাহাকে বলে? অর্থাৎ ছাড়া। কাহাকে ছাড়া? আপনাকে ছাড়া, স্বার্থনাশ করা। কেবল এই পথ ধরিয়া তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুভব করিতে পারা যায় যে, আমরা যে-সকল মহাত্মার ও মহাজনের কীর্তি আলোচনা করিয়া থাকি, যাঁহাদের অনুসরণ করি, তাঁহারা সকলেই এই ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব পাইয়া-ছিলেন। মহাত্মাদের জীবনে কয়েকটি আশ্চর্য লক্ষণ আছে, যাহা চিন্তা করিলে তাঁহাদিগকে আর সাধারণ মনুষ্য মনে করা যায় না। তাহার কতিপয় লক্ষণ নির্দেশ করিতেছি।

প্রথম, জীবের প্রতি অপূর্ব প্রেম। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বলেন, শাক্য-সিংহ মুক্তাত্মা, তথাপি তিনি যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে কেবল জীবের প্রতি অনুরাগের জন্য। জরামরণের হাতে মানবের নিগ্রহ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এত ব্যথিত হইয়াছিল যে, তাহার জন্য এই ক্লেশ বহন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টিয়ানগণ বলেন, যীশু স্বয়ং পরমেশ্বর, তিনি যে এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবন দিলেন সে কেবল জীবানুগ্রহের জন্য। এই জীবানুগ্রহ সকল মহাত্মার লক্ষণ। এই জীবানুগ্রহের গভীরতার বিষয় চিন্তা করিলে উঁহাদিগকে আর সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না। আমাদের প্রেমের প্রকৃতি এই, যে ব্যক্তি প্রেমাস্পদ, সুন্দর, কোমল এবং অনুরাগশীল, তাহার উপরই প্রেম যায়। কিন্তু যেখানে কদর্যতা, দুর্গন্ধ, অসাধুতা, সেখানে আমাদের প্রেম গিয়া আলিঙ্গন করে না। বরং যে পাপী তাহাকেও প্রেম করা যায়, কিন্তু যে প্রেমের পরিবর্তে অপ্রেম দেয়, কৃতঘ্ন হইয়া অপকার করে, তাহাকে প্রীতি করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। সাধুদের মহত্ত্ব দেখ, যে হস্ত আঘাত করিতেছে, তাহাকে প্রেম দিয়াছেন। ঈশা, বুদ্ধ প্রভৃতি বড় বড় নাম অন্বেষণ করিতেছি কেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় লিখিয়াছেন যে, পৌত্তলিকতা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ এতই ব্যথিত হইয়াছিল যে, ইহার উচ্ছেদের জন্য অর্থ, সামর্থ্য, শরীর, ধন সমুদায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। যে জাতি তাঁহাকে উৎপীড়ন করিয়াছে, নগণ্য লোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, পাষণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে, অপমান করিয়াছে, তাহারই উদ্ধারের জন্য অর্থ, সামর্থ্য, শরীর, বল সমুদায় নিয়োগ করিলেন। ইংলণ্ডে ভজনালয়ে গেলে উপাসনাকালে রাজার চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িত। সেখানকার উপাসকগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "উপাসনায় যোগ দিতে গেলে দেশের লোকের জন্য প্রাণ ব্যাকুল

হয়।” কি প্রেম! “যার খরতর শরে জরজর, তাহারই কল্যাণ অন্তরে ধ্যান”— এ যদি মহত্ত্ব না হয় তবে আর মহত্ত্ব কোথায়? মহাত্মাদিগের প্রেম ও জীবানুগ্রহ অসাধারণ।

মহাত্মাদিগের আর-একটি লক্ষণ আশা। ঈশ্বরের উপর ও মানুষের উপর তাঁহাদের আশা অসাধারণ। ঈশ্বরের উপর আশা করা বড় কঠিন নয়। কিন্তু মানুষের উপর আশা করা বড় কঠিন। পৃথিবীর পাপ তাপ দুর্গতি ইঁহারা যেমন দেখেন, অন্য লোক এমন দেখে না; ইঁহারা লোকের নিকৃষ্টতা যেমন অনুভব করেন, অন্য লোক তেমন করে না। অথচ ইঁহারা মানুষের উপর আশাহীন হইতেন না। যদি মানুষের উপর বিশেষ আশা না থাকিত, তবে আর ধর্মপ্রচার করিতেন না। বিশ্বাস না থাকিলে কি আর তাহাদের কাছে গিয়া ধর্মকথা বলিতে পারিতেন?

আমরা দেখিতে পাই, অনেক নর-হিতৈষী লোক মানুষের পাপ ও দুর্নীতি দেখিয়া তাহাদের উপর আশা ও বিশ্বাস একেবারে হারাইয়া ফেলিয়া শেষে নরবিদ্বেষী হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের কার্য দেখ! এত দুর্গতি, এত পাপ দেখিয়াও তাঁহারা মানুষের উপর কত আশা রাখিতেন। আবার দেখ, আশা রাখিতেন কোথায়? বড় ক্ষমতাশালী, সম্ভ্রমশালী যে-সকল লোক, তাহাদের উপর কি আশা রাখিতেন? তাহা নয়, পৃথিবী যাহাদের অগ্রাহ্য করিয়াছে, সেই দুর্বল, অশিক্ষিত জেলে-মালার মুখের দিকে তাকাইয়া ইঁহারা কি এক আশা পাইতেন। একটি বড় বাড়ি তৈয়ার করিবার জন্য অনেক ইট কাঠ সংগ্রহ করা হইয়াছে। মিস্ত্রীরা ভাঙা ইটগুলিকে দূরে ফেলিয়া দিতেছে, তখন একজন নূতন কারিকর আসিয়া বলিলেন, “ও কি করিতেছ, সকল জিনিস যে ফেলিয়া দিতেছ? ঐ ভাঙা ইটগুলিই যে মজবুত ইট।” মহাজনেরা ঠিক

এই প্রকারে আমরা যে-সকল ইটকাঠ অকর্মণ্য বলিয়া ফেলিয়া দি, তাহাই লইয়া অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। ইহাদের চক্ষু আছে, ইহারা আমাদের চক্ষু দিয়া দর্শন করেন না। ইহারা সেই ভাঙা ইটের মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পান, যাহা আমরা দেখিতে পাই না। ঈশ্বরের উপর ইহাদের কেমন আশা! যখন চারিদিক প্রতিকূল তখনও আশা ছাড়েন নাই। যীশুর শত্রুগণ যখন চারিদিকে বাড়িতে লাগিল, যখন তাঁহার শিষ্যদিগের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে লাগিল, তখন তিনি কয়েকজন শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Will ye also go away?" তিনি তখন তাহাদিগকেও ছাড়িতে প্রস্তুত। তাহার পর ঐ বারজনও ছাড়িয়া গেল। একাকী যখন তাঁহাকে হত্যা করিতে লইয়া যায় তখনও তিনি স্বর্গরাজ্যের প্রসঙ্গই করিতেছেন।

তৃতীয়, অপূর্ব সাহস। এই অপূর্ব সাহস অনেক মহাত্মার জীবনেই দেখা গিয়াছে। সমুদয় দেশ ও জাতি যখন প্রতিকূল, তখনও তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতেন। মহম্মদ যখন ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেশের সমুদয় লোক বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। মহম্মদের খুড়া মহম্মদকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তাঁহার বিরোধীরা তাঁহার খুড়ার কাছে গিয়া বলিল, "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এ দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছে, সে দেবতাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছে, সমস্ত দেশের লোক উহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে। কেবল আপনাকে শ্রদ্ধা করে বলিয়া এখনও কিছু করে নাই। সুতরাং আপনাকে বলিতেছি, আপনি শীঘ্র উহাকে নিবৃত্ত করুন, নতুবা জানিবেন, উহার জীবন রক্ষা করা ভার হইবে।" মহম্মদের খুড়া মহম্মদকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহম্মদ, আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছি। এতদিন তোমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন

আর তোমাকে আমার পক্ষপুটে রাখা অসম্ভব হইয়াছে, আমি স্নেহের অনুরোধে বলিতেছি, নিবৃত্ত হও।" মহম্মদ খুড়ার নিকট অতি বিনীত-ভাবে কথা বলিতেন, সর্বদা অবনতমস্তকে চলিতেন, তাঁহার এই অনুরোধ শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার এক হস্তে সূর্য আর-এক হস্তে চন্দ্র আনিয়া দিলেও নিবৃত্ত হইব না।"

এই আশা ও সাহসের মধ্যে কি দেখা যায়? "ত্যাগেনৈকেনামৃত-ত্বমানশুঃ।" এমন একটি গুণ ইঁহাদের ছিল যাহার জন্য যে সত্য জানিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কে পক্ষ, কে বিপক্ষ, তাহা গণনা করিবার অবসর হয় নাই। তাঁহাদের মানবের প্রতি যে বিশ্বাস, তাহার মূলে এই। ঈশ্বরের হাতে সমস্ত সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই মানবে এমন বিশ্বাস ও এমন সাহস। যদি মনে করিতেন, সত্যের জয়-পরাজয় আমার উপর নির্ভর করে, তবে নিজের দুর্বলতা দেখিয়া নিরাশ হইতেন। ত্যাগের দ্বারা, আত্মসমর্পণের দ্বারা সত্যের হাতে আপনাকে অর্পণ করিয়া সেই বল পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, যেমন পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ সমুদয় পদার্থকে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, তেমনি পরমেশ্বরের শক্তি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। সেজন্য ঈশ্বরের হাতে তাঁহারা আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এজন্যই তাঁহাদের বাসনার বিলয় হইয়াছিল। সত্যের চিন্তনে লোকভয় ও ক্ষুদ্রাশয়তার বন্ধন সমুদয় ছিন্ন হইয়াছিল। Know the truth and the truth shall make you free। সত্যের প্রেমে মানুষ আপনাদিগকে অর্পণ করিলে তবে স্বাধীন হয়; তাঁহারা সত্যে আপনাকে দিলেন বলিয়া বল, আশা, সাহস পাইলেন, নবজীবন পাইয়া সত্যের বলে বলী হইলেন।

মানবের অমরত্ব ত্যাগ ভিন্ন হয় না। যদি কোনও মন্ত্র জপ করিতে হয়,

তবে এই জপ কর, "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" ঈশ্বরের নাম যতই করি-না কেন, বার বার উপাসনাই করি-না কেন, ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ ভিন্ন অমৃতত্ব পাওয়া যাইবে না। যিনি যে পরিমাণে স্বার্থনাশে প্রস্তুত, তিনি সেই পরিমাণে ধর্মলাভে ইচ্ছুক, তিনি সেই পরিমাণে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী; নতুবা অমৃতত্ব পাওয়া যাইবে না। স্বার্থনাশের ভয়ে ভীত হইয়া বড বড় কথা ও বাহিরের সাধন মাতালের নৌকা চালাইবার মত, নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া সারা রাত্রি দাঁড় টানার মত বোধ হয়। ধর্মপ্রচার সম্বন্ধেও সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রচাবের অর্থ কি? "একমাত্র ঈশ্বরই উপাস্য, তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা করা উচিত, জাতিভেদ রাখিতে নাই।" ইত্যাদি কয়টা শুনানই কি প্রচার? যদি এই প্রচার হয়, তবে তাহা কঠিন নয়, কিন্তু প্রচারের অর্থ যদি মানুষের মন পরিবর্তন করা হয়, ব্রাহ্ম হইয়া যাওয়া যদি স্বার্থপরের নিঃস্বার্থ হওয়া ও বিষয়াসক্তের বিষয়াসক্তিশূন্য হওয়া হয়, তবে আপনারা বলুন দেখি, কাজে তাহা হইতেছে কিনা।

শিখধর্মের এত প্রতাপ হইল কেন? শিখদিগেব দশম গুরু গোবিন্দ-সিংহ একবার শিখধর্মের উন্নতিচিন্তায় নির্জন পর্বতে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। কিছুদিন পরে আসিয়া সকল শিখকে সমবেত করিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া বলিলেন, "দেবীর এই আদেশ হইয়াছে—শিখধর্মের রক্ষার জন্য একশত মানুষের মাথা চাই। কে শির দিবে এস, আমি এই তরবারিতে তাহার মাথা কাটিয়া দেবীর কাছে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কেহই অগ্রসর হইল না। তখন গোবিন্দসিংহ বলিলেন, "আচ্ছা, একশত জন না হউক, পঞ্চাশ জনও এস।" তখনও কেহ অগ্রসর হইল না। তখন নিরাশ হইয়া গুরু গোবিন্দসিংহ

বলিলেন, "দশজন, দশজন।" তখনও কেহ আসিল না। তখন গুরু গোবিন্দসিংহ বলিলেন, "দশজন না হয়, পাঁচজন এস।" যখন পাঁচজনও আসিল না, তখন গুরু গোবিন্দ অস্থির হইয়া উঠিলেন। নিরাশায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "শিখধর্মের জন্য মাথা দিতে পারে এমন একজন লোকও কি নাই? শিখধর্ম গেল যে! শিখধর্মের রক্ষার জন্য কেহ কি প্রাণ দিতে পার না?" তখন একজন সরলমতি জাঠ দণ্ডায়মান হইল। গুরু গোবিন্দ সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। নিকটে এক তাঁবু ছিল, তাহার মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে সজ্জিত পালঙ্কে বসাইলেন, বসাইয়া তাহার পদধূলি লইলেন, তাঁবুর ভিতরে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া একটা ছাগ কাটিলেন, তাহার রক্ত গড়াইয়া তাঁবুর বাহিরে চলিল। তখন সেই রক্তাক্ত তরবারি হস্তে লইয়া বাহিরে গিয়া বলিলেন, "আর চারিজন চাই, আর চারিজন হইলেই হইবে।" সমবেত লোকেরা সেই রক্তাক্ত তরবারি ও রক্তের ধারা দেখিয়া অনুমান করিল সেই ব্যক্তিকে কাটা হইয়াছে। এইবার গুরু গোবিন্দসিংহের আহ্বান শুনিয়া আর-একজন অগ্রসর হইল, তাহাকেও ঐরূপ চুলে ধরিয়া তাঁবুর ভিতর লইয়া পালঙ্কে বসাইলেন, তাহারও পদধূলি লইলেন, এবং পূর্বের ন্যায় আর-একটি ছাগ কাটিলেন। এইরূপে পাঁচবারে পাঁচজন লোক তাঁহার আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া জীবন দিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাঁবুর ভিতরে সেই পাঁচজনকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, "আজ হইতে তোমরা প্রত্যেকে গুরু গোবিন্দসিংহ, আজ হইতে আমরা ছয়জন গুরু গোবিন্দসিংহ হইলাম।" এই ছয়জন গুরু গোবিন্দসিংহের দ্বারাই শিখধর্ম জীবন পাইল। এই ছয়জনের জীবনই সমগ্র শিখমণ্ডলীর মধ্যে জীবন উৎপন্ন করিল।

তাই বলি, স্বার্থনাশ না হইলে শক্তি জন্মে না। আমি অনেকদিন বসিয়া চিন্তা করিয়াছি, খ্রীষ্টধর্মের জয় কিরূপে হইল ? এ প্রশ্নের আজও আমার ভাল মীমাংসা হয় নাই। খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়কালে দেখিতে পাই, দুইটি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি ইহার প্রতিকূলে ছিল। এক গ্রীসের সভ্যতা, আর-এক রোমের রাজশক্তি। এত বড় দুইটি শক্তিকে কিসে পরাস্ত করিল ? শক্তি ভিন্ন শক্তিকে অন্য কিছু বাধা দিতে পারে না। কোথায় সে শক্তির জন্ম, যাহা এই দুইটি পরাক্রান্ত শক্তিকে বাধা দিতে ও জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে ? বাইবেলে এই প্রশ্নের উত্তর কি নাই ? এই দেখিতে পাইবে, খ্রীষ্টের শিষ্যগণ নিঃস্বার্থতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তখন যে খ্রীষ্টান হইত, তাহাকেই যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া সাধারণ ধনভাণ্ডারে দিতে হইত। তাহার পর তাঁহারা এই নিঃস্বার্থতা পদে পদে দেখাইয়াছিলেন। প্রেরিতদিগের বিরুদ্ধে একবার অভিযোগ হয় যে, বিধবাদের সমুচিত পরিচর্যা হইতেছে না। তাঁহারা কি সে অভিযোগ শুনিয়া অভিমান করিলেন ? তাঁহারা কি বলিলেন, "কি, এত বড় আস্পর্ধা, যাহারা ঈশ্বরের প্রেরিত তাহাদের নামে আবার অভিযোগ ?" তাহা করিলেন না, সমুদয় মণ্ডলীকে ডাকিয়া সমবেত করিলেন; বলিলেন, "আমরা বাস্তবিকই এই কাজ করিতে পারিতেছি না। তোমরা লোক মনোনীত করিয়া দেও।" এই কথা শুনিয়া সমুদায় অপ্রেম ও অভিযোগ নির্বাণ হইল। ইহাদিগের স্বার্থবিনাশ পদে পদে। ইহাতেই ত শক্তি জাগিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মসমাজ যে এতদিন জীবিত আছে তাহার কারণ কি ? তাহার কারণ কি এই যে, তুমি আমি ও আর দশজন বক্তৃতা ও উপদেশের দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিতেছি ? তাহা নয়। যে দুই একজন লোক ইহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই ত্যাগের ফলেই ইহা এতদিন

বাঁচিয়া আছে। রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন সহরের অনেক ধনী লোক তাঁহার সঙ্গে জুটিয়াছিলেন। কিন্তু ধনী লোক মিলিয়া কি হইল? তাঁহারা কি ব্রাহ্মসমাজ রাখিয়াছেন? রাজা যখন ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন, তখন আর তাঁহাদের উদ্দেশ পাওয়া গেল না। কিন্তু একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, যিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, তিনি শ্মশানে প্রদীপ জ্বালিয়া বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার জীবনের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ জীবিত রহিল। তাঁহার জীবন স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত। তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যিনি ইচ্ছা করিলে বড়লোকের মধ্যে নিশ্চয় স্থান পাইতে পারিতেন, যিনি ইচ্ছা করিলে আজও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি থাকিতে পারিতেন, এখন রাজা-মহারাজা হইতে পারিতেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখ। প্রাণ দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ধরিলেন, অর্থ-সামর্থ্য সমুদায় ইহার জন্য নিয়োগ করিলেন। তারপর কেশবচন্দ্র, ইনি ইচ্ছা করিলে টাঁকশালের দেওয়ান হইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণ দিয়া ধরিলেন। তাঁহার সঙ্গের প্রচারকগণ প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থ ও সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে রাখিয়াছেন।

এইজন্যই বলি, "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" এই স্বার্থনাশ ব্যতীত শক্তি হইবে না, বাসনা বিলয় হইবে না। যাহার যত স্বার্থনাশ, তাঁহার ততটা শক্তি বিকশিত হইবে। ভাল কথা শাস্ত্রে অনেক আছে, তুমি বিশ-পঁচিশ বৎসর বক্তৃতা করিয়া তাহার বেশি কিছু বলিতে পারিবে না, কিন্তু সত্যকে জীবন দিয়া আলিঙ্গন করা চাই। প্রাণ দিয়া না ধরিলে সত্যের শক্তি হয় না।

বিধাতা ব্রাহ্মসমাজের উপর এই ভার দিয়াছেন, সত্য মুখে বলা

নয়, সত্যকে জীবন দিয়া ধরা। "অমূল্য রতন, অমূল্য রতন" ত কত বলিয়াছি। রত্ন কি বুঝিতেছি? ব্রাহ্মধর্মকে রত্ন বলিয়া কি বুঝিতেছি? ইহা কি এমন জিনিস হইয়াছে, যেজন্য আপনাকে দিতে পারি? ব্রাহ্মসমাজে ত অনেক যুবক-যুবতী আছেন, সকলেই কি সংসারের পথে চলিবেন? তোমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াও কি সকলেই সংসারের পথে চলিবে? ব্রাহ্মসমাজকে কি প্রাণ দিয়া এখনও ধরিবে না? কেবল দৃষ্টান্ত শুনাই সার হইল? আমরা অহংকার করিয়া যাহাদের সম্বন্ধে বলি যে, তাহারা উপধর্মের সেবা করে, তাহারা ত তাহাদের ধর্মের জন্য জীবন দিতে পারে, আর আমরা পারি না? সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারে, এমন কি কেহ নাই? একটু স্বার্থ ছাড়িলে কি জীবন ধন্য হয় না? শরীরের শক্তি কত বৃথা কাজে যাইতেছে, ঈশ্বরের সেবায় গেলে কি তাহা সার্থক হয় না? তিনি কি এতটুকুও প্রিয় নন? তবে কি প্রচার করি? কি উৎসব করি? প্রভু পরমেশ্বর আজ লজ্জা দিন, লজ্জা দিন। আজ উৎসবের দিনে আমরা প্রত্যেকে হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখি, কতটুকু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। নতুবা ধর্মের শক্তি জাগিবে না।

১৩০০

প্রেমের সংস্পর্শ

আজ প্রেমের মহিমা বিবৃত করিব। শরীরে শরীরে যেরূপ সংস্পর্শ হয়, আত্মাতে আত্মাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। শরীরের সংস্পর্শ কিরূপ তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়াছি। পথে চলিতে চলিতে কত লোকের সঙ্গে সংস্পর্শ হয়। তাহার কিছুই শক্তি নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, যাঁহাকে ভালবাসি, যাঁহার সহিত প্রীতির যোগ রহিয়াছে, তিনি যখন আমাদিগকে স্পর্শ করেন, স্কন্ধে হস্তার্পণ করেন, বাহু দ্বারা আবেষ্টন করেন, তখন তাহার যে আশ্চর্য শক্তি আমাদের উপর কার্য করে, তাহা আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকি। যেখানে প্রীতির যোগ আছে, সেখানেই আত্মার সংস্পর্শ হইয়া থাকে। যখন শিশু শয্যায় শয়ন করিয়া খেলা করিতে থাকে, প্রস্ফুটিত নয়ন দ্বারা জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, জননী তাহাকে চুম্বন না করা পর্যন্ত তাহার প্রাণ যেন তৃপ্ত হয় না। জননী শিশুকে বুকে ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কি স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা অপরে কি বুঝিবে? একমাত্র পিতামাতাই তাহা অনুভব করিয়া থাকেন।

গতকল্য যখন কীর্তনে বাহির হইয়াছিলাম, কীর্তন করিতে করিতে প্রাণে অপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু গায়কগণ যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরকে বাহু দ্বারা বদ্ধ না করিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত যেন প্রাণ তৃপ্তিলাভ করিল না। শরীরে শরীরে এইরূপ সংস্পর্শ আমরা অনেক দেখিয়াছি। ইহার মধ্যে বাস্তবিকই মধুরতা আছে। এইরূপ আত্মাতে আত্মাতেও সংস্পর্শ হইয়া থাকে এবং তাহাতেও অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। উৎসবের প্রারম্ভে চারিদিক হইতে ব্যাকুল অবসন্ন আত্মা সম্মিলিত হইয়াছেন, সকলে আনন্দ উপলব্ধি করিতেছেন কি? কতজনে

প্রাণে কত নিস্তেজ ভাব লইয়া আসিয়াছিলাম। উৎসবের সময় উপাসনা-মন্দিরে কত সাধু ভক্তের সমাগম হইয়াছে, উৎসবে প্রবেশমাত্র যেন প্রাণের মলিনতা দূর হইয়া গেল, প্রাণে কি এক অপূর্ব ভাব আসিল, প্রাণ জাগিয়া উঠিল, হৃদয় কাঁদিল। কি আশ্চর্য সংস্পর্শ!

আমরা কি অনুভব করি নাই যে, ঈশ্বরের মন্দিরে আমরা অপ্রেমিক হইয়া আসিয়াছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়া হৃদয় ডুবিয়া গেল? এই সংস্পর্শ যখন প্রেমিক জনের প্রেমের সহিত সম্মিলিত হয়, তখনই অমৃতফল প্রসূত হইয়া থাকে।

মানুষে মানুষে সংস্পর্শ হওয়ার ন্যায় ঈশ্বরের সহিতও প্রেমের সংস্পর্শ হইয়া থাকে। তাঁহার সংস্পর্শে আমাদের চৈতন্য হয়, আধ্যাত্মিক চক্ষু খুলিয়া যায়। সেই সংস্পর্শ কি কেহ প্রাণে অনুভব করেন নাই? আজ এই ব্রহ্মমন্দিরে কি এমন কেহ আছেন যিনি বলিতে পারেন যে, এই বিশেষ দিনে ঈশ্বরের সংস্পর্শ প্রাণে অনুভব করেন নাই?

বড় বাড়ি প্রস্তুত করিলে বৈদ্যুতিক অগ্নি সঞ্চালিত করিয়া আনিবার জন্য বাড়ির গায়ে লোহার শিক দেওয়া হয়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন রেশমের সূতায় ঘুড়ি উড়াইয়া বিদ্যুৎ আনিয়াছিলেন। এই যে প্রেমের সংস্পর্শ, যাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকি, ইহা হৃদয়ের গুণ ভাব ও চিন্তা-শক্তিকে সঞ্চালিত করে। এই সঞ্চালনে এক হৃদয়ের ভাব অদ্ভুত উপায়ে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। যেখানে এই প্রেমের সংস্পর্শ নাই, সেখানে ভাব ও শক্তি বিনিময়ের উপায় নাই। আমি যদি তোমাকে প্রীতি না করি, কি করিয়া তোমার প্রেমের শক্তি আমাতে আসিবে? যেখানে প্রেম, সেখানেই তাহার শক্তি কাজ করিয়া থাকে। আমার প্রতি যদি তোমার প্রেম থাকে, তবে আমার কথার শক্তি তোমার উপরে নিশ্চয় কাজ করিবে।

মহম্মদের জীবনচরিত পাঠ করিলে জানা যায় যে, মিশরের রাজা মহম্মদকে উপঢৌকন দিবার জন্য তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। মহম্মদ মক্কা জয় করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য দেশের সমস্ত রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অপর সকল রাজাই মহম্মদের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন, একমাত্র মিশরের রাজাই উপঢৌকন দিয়া মহম্মদের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া উপঢৌকন প্রদান করিল এবং মহম্মদের প্রজাবর্গ দেখিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাজার নিকট এই বলিল যে, "মহারাজ, দশ হাজার মাথা না কাটিলে মহম্মদের বিনাশ-সম্ভাবনা নাই, তিনি এমনই প্রেমের দ্বারা সুরক্ষিত।" রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। মহম্মদের এই প্রেমাকর্ষণ-শক্তি তাঁহার ধর্ম জয়ী হইবার কারণ। প্রেমের ভিত্তি ছিল বলিয়াই তাঁহার ধর্ম জগতে জয়লাভ করিয়াছিল।

মহম্মদ যখন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন, তখনও তিনি প্রত্যহ উপাসনার জন্য মসজিদে যাইতেন। ক্রমে যখন তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল, তখন দুইজন লোকের স্কন্ধে ভর করিয়া উপাসনা করিতে যাইতেন। যখন লোকে দেখিতে পাইল যে, মহম্মদ দাঁড়াইতে পারেন না, দুইজন লোক তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং তিনি সেই অবস্থায় উপাসনা করিতেছেন, তখন চারিদিকের লোক উন্মত্তপ্রায় হইয়া 'আল্লা-হো-আকবর' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। মহম্মদের সেই বিশ্বাসের আগুন সকলের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। প্রেমের যোগেই এই বৈদ্যুতিক শক্তি সকলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

নেলসন যখন যুদ্ধকালে জাহাজের উপরে গিয়া সকলের নিকট দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সমস্ত সৈন্য উন্মত্ত হইয়া যাইত, কেননা তাহারা

জানিত যে তাঁহার ন্যায় দেশহিতৈষী আর কেহ নাই। নেলসন তাঁহার পতাকায় লিখিয়াছিলেন, "ইংলণ্ড আশা করেন যে, প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসী স্বীয় কর্তব্য সাধন করিবে।" জেনারেল গর্ডন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতেন, তাঁহাকে দেখিয়া সেনাগণ উদ্দীপ্ত হইয়া যাইত। ইহাতেই প্রেমের যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্পর্শেই ভাব এবং চিন্তার সঞ্চার হয়, ইহাই অগ্নিসঞ্চালক দণ্ড।

দ্বিতীয়ত, প্রেম গঠন করে, অপ্রেম ভঙ্গ করে। মিছরির যেরূপ দানা বাঁধে, সেইরূপ প্রেমেতে মানব-সমাজ বদ্ধ হয়। প্রেমেতে পুরুষ-নারীর হৃদয় এক হয়, ক্রমে শিশুসন্তানাদি সকলে প্রেমে বদ্ধ হইয়া এক পরিবার হয়। এই প্রেমেতেই প্রতিবাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া পল্লী হইল। চারিদিকেই প্রেম গঠন করিতেছে। মাধ্যাকর্ষণী শক্তি দ্বারা সৃষ্টি রক্ষিত; ইহাকে রহিত কর, সূর্য রেণু রেণু হইয়া, মেদিনী রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া যাইবে। সেইরূপ প্রেমের বন্ধন খুলিয়া দাও, সমগ্র মানব-সমাজ সেই মুহূর্তেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয়ত, প্রেমের আর-একটি গুণ এই যে, ইহা সংরক্ষণ করে। প্রেম বিনাশ হইতে রক্ষা করে। জগতের সাধুদিগের জীবন আলোচনা করিলে আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই। মহম্মদ অজ্ঞ ছিলেন; মহাত্মা যীশু কিছুই লিখিয়া যান নাই; চৈতন্য যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা ভক্তিলাভের পূর্বেই গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তবে কোথা হইতে এই ভক্তির কথা জগতে প্রচার হইল? কে এ-সকল তত্ত্ব রক্ষা করে? সকলের মূল এবং ভিত্তি প্রেম। শিষ্যদিগের প্রেমের দ্বারাই মহাত্মাদিগের উক্তিসকল রক্ষিত ও প্রচারিত হইতেছে।

প্রেমের আর-একটি গুণ এই যে, প্রেম চক্ষে জ্যোতি আনয়ন করে। প্রেমহীন চক্ষে জগৎ দেখ, সকলই পুরাতন, নূতন কিছুই নাই। কিন্তু

ঈশ্বর-প্রেম হৃদয়ে অবতীর্ণ হউক, চক্ষু খুলিয়া যাইবে, সকলই নূতন হইবে, জগতের সৌন্দর্য দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যাইবে। বিশ্বাসীরা যেন আর-এক চক্ষে জগৎ দেখিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে তাঁহারা অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। পাখি ডাকে, ফুল ফুটে, ইহা চিরকালই হইতেছে কিন্তু ইহা দেখিয়াই যীশু বলিয়াছিলেন, "পাখিরা বীজ বপন করে না, তবুও ঈশ্বর তাহাদিগকে খাইতে দেন।" ফুলকে কেমন সুন্দর করিয়া ঈশ্বর সাজাইয়াছেন। প্রেমের চক্ষে গাছের দিকে চাও, অনেক উপদেশ লাভ করিবে। বসন্ত-সমাগমে বৃক্ষ নূতন পত্রে শোভিত হয়, আর ইহা কি সম্ভব যে, ঈশ্বর আমাকে সাজাইবেন না? প্রেমের চক্ষে চারিদিকে দেখ, উপদেশ পাইবে। জগৎপিতা প্রেমের দ্বারা জগৎকে চিত্রিত না করিলে জগৎ এত সুন্দর হইত না। শীত-নিবারণের জন্য পাখিকে পালক দ্বারা তিনি আবৃত করিয়াছেন, আমার আত্মাকে কি তিনি রক্ষা করিবেন না?

বিশ্বাসীরা কেন জগৎ হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন? তাঁহারা জগৎকে প্রেমের চক্ষে দেখেন বলিয়া। প্রেমের চক্ষে প্রাচীন সাধুদিগের দিকে দৃষ্টিপাত কর, প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ দর্শন কর, অনেক উপদেশ লাভ করিবে। প্রেমবিহীন চক্ষে দেখিয়াছিলে বলিয়াই কোনও তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পার নাই। অপ্রেমের চক্ষে পুস্তক পড়িয়া দেখিয়াছি, পাতার পর পাতা উল্টাইয়া গিয়াছি, কিছুই পাই নাই। কিন্তু যখন ঈশ্বর-কৃপায় প্রেমের চক্ষু খুলিয়াছে, দেখিয়াছি, প্রতি পংক্তি আমার নিকট আশার কথা বলিতেছে। প্রেমই চক্ষের আলোক। প্রেম-বিহীন চক্ষে মানুষকে প্রকৃতভাবে চেনা যায় না, প্রেমহীন হইলে অপরের দোষ সহজেই চক্ষে পতিত হয়। "অমুক বড় অহংকারী, অমুকের অমুক দোষ" ইত্যাদি ভাব মনে উদয় হয়। প্রেমহীন হইলে

"ঈশ্বরের ঘরের একমাত্র আমিই অধিকারী, অন্য কেহ আসিতে পারিবে না" ইত্যাদি ভাব মনে উদয় হয়। ঈশ্বর-কৃপায় হৃদয়ে প্রেম আসিলে আর কাহাকেও পর ভাবিতে পারি না, সকলই যেন আপন, কাহাকেও দূরে রাখিতে ইচ্ছা হয় না। যাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি, প্রেমের চক্ষে সে ভাল লোক হইয়া গেল!

প্রেমবিহীন হইয়া কখনও উপাসনা করিবে না। কেবল ঈশ্বরের নাম করিলে উপাসনা হয় না, প্রেম দিয়া পূজা না করিলে তাঁহার পূজাই হয় না। হৃদয়ে প্রেম না পাইয়া থাকিলে কিছুই জানিতে পারিবে না। "ঈশ্বরই প্রেম, প্রেমই ঈশ্বর।"

ব্রাহ্মসমাজ কিরূপে সংগঠিত হইবে? যতপ্রকার বন্ধনের রজ্জু আছে, সকলই বাহিরের বন্ধন, তাহা খুলিয়া যাইবে যদি তাহা প্রেমহীন হস্তে বাঁধা হয়। বিবাহ-বন্ধন, পরিবার-গঠন প্রভৃতি কিসের দ্বারা হয়? প্রেমের বন্ধনে। যদি আমরা অপ্রেমের অস্ত্র দিয়া প্রেমের রজ্জু কাটিয়া দিই, তবে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত হইবে? প্রেমাপরাধ অতি গুরুতর অপরাধ।

যেখানে অধীনতা, সেখানে প্রেম হয় না। অধীনের সঙ্গে স্বাধীনের প্রেম হয় না। প্রেমের প্রাণ স্বাধীনতা। জগদীশ্বর কি আমাদিগকে জগতের অপর নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ন্যায় করিয়া সৃষ্টি করিতে পারিতেন না? কেন তবে আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? যেখানে ভয় আছে, যেখানে প্রেম নাই। যেখানে পতি পত্নীকে ভয় দেখাইয়া বাধ্য করিতে চান, সেখানে প্রেম নাই। তবে কিরূপে স্বাধীন থাকিবে অথচ অধীন হইবে? প্রেম পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে, পূর্ণ অধীনতাও আনয়ন করে। ঐক্যতান বাদ্য কেমন সুন্দর। যন্ত্রগুলি এক সঙ্গে বাজিতেছে, প্রত্যেকের নিজ নিজ সুর বাজিতেছে,

সকলের সংমিশ্রণে কেমন সুন্দর শব্দ হইয়া থাকে! যখন আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসা হইবে, পরস্পরের প্রতি প্রেম হইবে, তখন সকল স্বর মিলিয়া এক তানে ঈশ্বরের নাম গান করিবে। রৌপ্য এবং স্বর্ণ মিশে না; কিন্তু আগুন দাও, উভয়ে গলিয়া মিশিয়া যাইবে। এইরূপ প্রেমহীন দুইটি কঠিন হৃদয় গলিবে না, প্রেমের উত্তাপ দাও, তখনই গলিয়া যাইবে।

"প্রেমের অপূর্ব রীতি বলা নাহি যায়"— ইহা অতি সত্য কথা। ব্রাহ্মসমাজে যদি এই প্রেম অবতীর্ণ না হয়, তাহা হইলে সকলই বিফল। এই পথে কিসে বাধা জন্মায়? আমাদিগের মিলনের পথে কিসে বিঘ্ন উৎপাদন করে? আমরা কেবল প্রেমের এবং ঈশ্বরের শক্তির অধীন ত নই। যদি তাহাই হইতাম, তবে অবশ্যই মিশিয়া যাইতাম। ইহা নিশ্চয় কথা যে, আমরা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার কৃপার অধীন নহি। আমাদের যে নিজ ইচ্ছা, প্রবৃত্তি এবং পার্থিব ভাব আছে তাহাই এই মিলনের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। অহংকার, অভিমান ও বিদ্বেষ ভাবই বাধা প্রদান করিতেছে। "কি! আমার কথা রাখিল না, এত বড় যোগ্যতা!" এই ভাব কি মনে উদয় হয় না? এই সকল কারণেই প্রেম কার্য করে না।

আজ যিনি আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর-করুণা সম্ভোগ করিবেন। কোনও দেবালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। আমাদের ঈশ্বর আজ বলিতেছেন, "আপনাকে ত্যাগ কর, তৎপর উৎসবের দ্বারে প্রবেশ কর।" আপনার ইচ্ছা ডুবিয়া যাউক, কেবল তাঁহারই ইচ্ছার জয় হউক, এই ভাব লইয়া যিনি আজ আসিয়াছেন, তিনিই প্রবেশের অধিকার পাইবেন। আজ এই উৎসবের দিন সকলে এক হইয়া প্রার্থনা

করিব, আর যেন প্রেমাপরাধ না করি। নূতন বৎসরের জন্য প্রতিজ্ঞা করি যে, "প্রেমাপরাধ আর করিব না।" প্রেম, এস। ঈশ্বরই প্রেম, আজ এস সকলে মিলিয়া প্রেমের গুণগান করি। তাঁহার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করি। প্রেমের হস্ত প্রাণে অনুভব করি। ঈশ্বরের করুণা আমাদিগের সহায় হউক।

১৩০১

ধর্ম সমাজের লবণ

মহাত্মা যীশু একদিন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিলেন, "তোমরা পৃথিবীর লবণ-স্বরূপ ; যদি লবণের লবণত্ব যায়, তবে আর কিসের দ্বারা জগৎ লবণাক্ত হইবে ? তখন ত তাহা দ্বারা আর কিছু কাজ হয় না, তখন তাহা পরিত্যক্ত ও সকলের পদতলে দলিত হয়।"

যে সত্যটি হৃদয়ে অনুভব করিয়া মহাত্মা যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে পৃথিবীর লবণের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, সেই সত্যটি আমরাও সময়ে সময়ে হৃদয়ে প্রতীতি করিয়া থাকি। সকল সমাজেই পাপ পুণ্য উভয়ই রহিয়াছে। এমন সমাজ নাই যেখানে পাপাচারী সুরাপায়ী ও অসাধু লোক নাই। কিন্তু আবার এমন সমাজও নাই যাহাতে অন্তত কয়েকজন পুণ্যাত্মা সাধু সদাশয় ব্যক্তি না পাওয়া যায়। এমন সমাজ নাই যেখানে উদার দয়ালু মহাজন একজনও পাওয়া যায় না।

এ কথা সত্য যে, সকল সমাজেই অধিকাংশ লোক ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ও এই জন্য সকল ধর্মই পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে ; সকল ধর্মাবলম্বীরাই আশা করেন যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন পৃথিবীর সকলই সুন্দর হইবে, পুণ্য ও ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। সে দিন সত্যসত্যই আসিবে কি না, ও আসিতে হইলে সে দিন কতদূর, তাহা আজ বিচার করিব না। কিন্তু এ কথা স্বীকার্য যে, সকল সমাজেই অধিকসংখ্যক ধর্মভ্রষ্ট ও অসদাচারী লোকের সঙ্গে অল্পসংখ্যক পুণ্যবান্ ও সাধু লোক আছেন। এমন দেশ নাই, এমন সমাজ নাই, যেখানে সকলেই দুষ্ক্রিয়ান্বিত। কিন্তু সে-ই সমাজের প্রকৃত অবস্থা, যেখানে পাপাচারী পুণ্যভয়ে ভীত,

যেখানে পাপাচারীরা সদম্ভে বেড়ায় না, যেখানে সাধুদিগেরই প্রভাব ব্যাপ্ত, যেখানে ধর্মাত্মাদিগের ধর্মভাবের দ্বারা সমগ্র সমাজ অনুপ্রাণিত। বিধাতার প্রতিষ্ঠিত নিয়মই এই, মানব-সমাজ এ প্রকারে গঠিত যে, কোনও সমাজে ধর্মাত্মাদিগের সংখ্যা অল্প হইলেও তাঁহাদেরই ধর্মপ্রভাবের দ্বারা সমগ্র সমাজ অনুপ্রাণিত হয়। আমাদিগের ও জগতের অন্যান্য সভ্য দেশের সমাজ-সকলের কার্যকলাপ, আন্দোলন ও পরিবর্তন সকল নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, অল্পসংখ্যক সাধুসাধ্বী নরনারী আপনাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত ও পরিশ্রমের দ্বারা সমগ্র জাতির অসাধুতা নিবারণ করিতেছেন, এবং এই প্রকারে সর্বদা সাধুতারই জয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

আজ সকলে হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখি, ধর্মলাভের জন্য স্বার্থনাশ করিবার শক্তি আছে কি না। ঈশ্বরের মহৎ কার্যের সহায়তার জন্য স্বার্থনাশ করিবার শক্তি কি হ্রাস হইতেছে? যদি দেখ কমিতেছে, তবে জানিয়া রাখ, লবণত্ব গেল। যদি উচ্চ আদর্শ, মহৎ আশা, স্বার্থনাশের শক্তি, এইগুলি হৃদয়ে থাকে, যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর থাকে, তবেই জানিব, লবণত্ব আছে। নতুবা আমরা নিতান্ত অসার ও অপদার্থ, আমাদিগের কোনও প্রয়োজন নাই, আমরা লোকের পদে দলিত হইবারই উপযুক্ত।

আমরা লবণত্ব মানুষকে দিব এ অহংকার করিতেছি না। আমার এই কথাগুলি শুনিয়া যদি কাহারও মনে আসে যে, আমরা খুব বড়, আমরা খুব মহৎ লোক, আমরা দেশকে লবণত্ব দিতেছি, তবে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। এই লবণত্ব যদি আমাদিগের মধ্যে আসে, তবে আপনি তাহা এ দেশের নরনারীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে। আমরা সপ্তম স্বর্গের দেবতা, আমরা সুধা পান করিব, আর ঐ পাপীদের

তাহা বিবরণ করিব, এ অহংকার যেন না করি। এ বিনয়ের রাজ্য, এখানে অহংকার লইয়া প্রবেশ করিতে নাই। আমাদিগকে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ আশা ও স্বার্থনাশের শক্তি লাভ করিতে হইবে, লাভ করিবার জন্য সাধন করিতে হইবে। বিশ্বের প্রভু তাঁহার ধর্ম-বিধানে এ-সকল পরিবেশন করিতেছেন। তিনি সকলকে দিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। আমাদিগকে তাঁহার নিকট হইতে লইতে হইবে। উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। কিরূপ আদর্শের দিকে যাইতে হইবে তাহা আজ তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

কিসের পশ্চাতে যাইব ? ধনের পশ্চাতে, ক্ষুদ্র সুখের পশ্চাতে, না ঈশ্বর যে আদর্শ দেখাইতেছেন তাহার পশ্চাতে যাইব ? সংবৎসর কাল কি সাধন করিয়াছি ? এই মহৎ উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছি কি না, তাহা ঈশ্বর আজ প্রকাশ করিয়া দিন। আশাতে হৃদয় পূর্ণ রাখিয়াছি কি না, ধর্মভাবে প্রাণ পূর্ণ রাখিয়াছি কি না ? যে আদর্শ দেখিয়াছি তাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি কি না ? যদি আমরা স্বার্থ ভিন্ন আর কিছু না চিনিয়া থাকি, যদি জ্ঞানের প্রতি আমাদের অনুরাগ না থাকে, যদি মহৎ চিন্তায় আমরা উদ্দীপ্ত না হই, যদি স্বার্থনাশের শক্তি আমাদের মধ্যে না জন্মিয়া থাকে, তবে আর কি হইল ? ধর্মের জন্য যদি উন্মত্ত হইতে না পারিলাম, তবে কি হইল ? প্রত্যেক ধর্মের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি লোক সেই সেই ধর্ম লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্মের ইতিহাসে জানা যায় যে, আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবার পক্ষে এই নিয়ম করা হইয়াছিল যে, যাহার যাহা বিষয়সম্পত্তি আছে সমুদয় বিক্রয় করিযা ধর্মমণ্ডলীর নিকট সমর্পণ করিতে হইবে। সকলে তাহাই করিয়াছিলেন, তাহাতেই শক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। আমরা যদি তাহাই হইতে পারি, তবে

বুঝিব, লবণত্ব পাইয়াছি, তবেই লবণের শক্তি এ দেশে কার্য করিবে। কিন্তু হে লবণ, যদি তুমি লবণত্ব হারাও, তবে মানুষের চরণে দলিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাক। যদি লবণত্ব আমাদের মধ্যে থাকে তবে ভারতবর্ষ ডুবিবে না।

আজ তবে লবণত্ব লাভ করিতে বিশেষ ব্যস্ত হই। অত্যন্ত মহৎ ও গুরুতর কার্যের ভার ব্রাহ্মসমাজের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডে থাকিতে একজন বিখ্যাত লোকের সহিত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের আকাঙ্ক্ষা কি, ব্রাহ্মসমাজ কি কি কার্য করিয়াছেন, এই সকল কথা তিনি একাগ্রমনে আমার মুখে শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখ গভীর আনন্দ ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "আপনি শ্রবণ করুন, ভারতের ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মসমাজের হস্তেই রহিয়াছে।" আমরা সকলে এই আশায় উদ্দীপ্ত হই। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং। ভারতের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা বিধাতা ব্রাহ্মসমাজে রাখিয়াছেন, আমাদের জাতীয় ব্যাধির ঔষধ বিধাতা ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চিত করিতেছেন। আমাদের উচ্চ আদর্শ, মহৎ আশা ও স্বার্থত্যাগের শক্তির অভাব হইয়াছে, ঈশ্বর তাহার ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। আমরা কি এই মহা লক্ষ্য ভুলিয়া যাইব? ভারতকে লবণত্ব দিতে হইবে। ঈশ্বর করুন, তাঁহার মহৎ নাম বিস্তার হউক, ব্রাহ্মধর্ম গৌরবান্বিত হউক। আমরা লবণত্ব যেন না হারাই। হৃদয়ের সমগ্র প্রেমের সহিত জীবনের মহৎ আদর্শকে ধরিতে সক্ষম হই।

হে প্রভু, মঙ্গলময় দেবতা, তোমার দ্বারে আমরা কত আর ডাকিব। ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙিয়া গেল, কত আর ডাকিব! লবণত্ব যদি যায়, তবে ত তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। তুমি যে ব্রাহ্মদিগকে মহৎ কার্যে

দীক্ষিত করিয়াছ; মহৎ ভার এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর উপর অর্পণ করিয়াছ। প্রভু, আমরা পড়িয়া গিয়াছি। দেশবাসী সকলে পড়িয়া গিয়াছে। জাতীয় জীবন উচ্চভূমি হইতে পড়িয়া গিয়াছে, মহৎ আদর্শ, আশা ও স্বার্থত্যাগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র সুখ ও স্বার্থে ডুবিয়াছে। দেখ, দীনবন্ধু, আমরা উঠিতে পারি না। দেখ, দয়াময়, তুমি যে মহৎ ব্রত দিয়াছ, তাহাও ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। মার্জনা কর, তুলে ধর। ব্রাহ্মসমাজে তোমার বিধান, তোমার লীলা, তোমার করুণার ব্যাপার, তোমার শক্তির ক্রিয়া দেখি। তোমারই এ ব্রাহ্মসমাজ। আমাদের হইলে নিশ্চয় হইত না। আমরা ভাঙিতে জানি, গড়িতে জানি না। তোমারই উপরে আশা করিতেছি। এ ব্রাহ্মসমাজে তুমি প্রাণ হইয়া থাক; তুমি শক্তি হইয়া চিরদিন থাক। আমাদিগকে লজ্জা দিয়া আমাদের ক্ষুদ্রতাকে তুলিয়া ধর। মহৎ আদর্শ আমাদের চক্ষের নিকট ধর। আমরা তোমাকে ধরি, তোমাকে আশ্রয় করি, আমরা মহৎ ধর্ম সাধনে নিযুক্ত হই। আমরা লবণত্ব যেন না হারাই, এই প্রার্থনা।

১৩০২

ধর্মলাভের অধিকারী কে ?

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

অর্থ— এই আত্মাকে অনেক উত্তম বচন (বেদাধ্যাপন) বা মেধা বা বহুশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। যিনি তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকটেই তিনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন। আর-এক অর্থ এই যে, তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, সেই তাঁহাকে পায়। এই বচনের প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, শুধু বেদশ্রবণের দ্বারা বা মেধার দ্বারা কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সেই পরমাত্মাকে কেহ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সচরাচর মানব এই তিনটি জিনিসের কোনও একটি লইয়াই প্রসন্ন থাকে এবং প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ না করিয়াও সন্তুষ্ট থাকে। এই জন্য ঋষিরা সেই তিনটি বিষয়কে ধর্মজীবন-লাভের অন্তরায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথমত এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা সাধু মহাত্মাদিগের মুখনিঃসৃত উত্তম উত্তম কথা সংগ্রহ করিয়া, লোকের নিকট সুললিত ভাষায় গদ্‌গদ ভাবে তাহা বলেন, এবং তাহাতেই তাঁহারা প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন। যীশু, কনফিউস্, সিসিরো, সেনেকা, যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনেক বচন সংগ্রহ করিয়া, নিজ জীবনে তাহা স্বীয় সম্পত্তি রূপে পরিণত না করিয়াই লোকের নিকট বলিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, সাধু-উক্তিসকল যে পড়িতে হইবে না, তাহা নয়; ধর্ম-সাধনার্থীদিগের পক্ষে ইহা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। কিন্তু ধর্মসাধনের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় হইলেও ইহাতে আমাদিগের মরণের আশঙ্কাও

রহিয়াছে। মানব অনেক সময় এই সমুদায় সাধু-উক্তি পড়িয়া জীবন ফিরিল কি না, হৃদয়ে প্রেম জন্মিল কি না, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে না; নিজ জীবনের প্রতি অন্ধ হইয়া এই সকল বচন সংগ্রহ করে, তাহা পাঠ করে, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে।

এক প্রকার লোক আছে, কিসে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা হয়, কি করিলে উত্তম সাবান, উত্তম কালি প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহা তাহারা বলিয়া দিবে, দশ-বিশ রকমের টাকা উপার্জনের পথ হয়ত বলিয়া দিবে, কিন্তু নিজে কিছুই করে না বা করিতে পারে না। উপার্জনের পথ শুধু বলিয়া দিলে কি হইবে? নিজে কি করিয়া দশ টাকা উপার্জন করিতে পারিবে, তাহাই কর। সেইরূপ তুমি যে শুধু উত্তম গ্রন্থ-সকল পাঠ করিয়া বেড়াও, সাধু-উক্তি সংগ্রহ করিয়া বেড়াও, একবার নিজের জীবনের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি, জীবন ফিরিল কি না? হৃদয়ের ভগবদ্‌ভক্তি জাগিল কি না, প্রেম জাগিল কি না? কি চাও? ভগবান্‌কে চাও, না শুধু লোকের প্রশংসা পাইয়াই সন্তুষ্ট? এইরূপ বচন সংগ্রহ করিয়া করিয়া বেড়াইয়া এবং নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া মানুষ নিজে প্রতারিত হয় এবং জগৎকেও ভুলাইয়া থাকে!

পৃথিবীর লোক নকল লইয়াই অনেক সময় সন্তুষ্ট থাকে। আসলের দিকে চাহিয়াও দেখে না। অসার বাহ্য চাকচিক্যের প্রতিই সর্বদা দৃষ্টি পড়ে। প্রকৃত সারপদার্থের প্রতি তাহারা সর্বদাই অন্ধ। এই শ্রেণীর লোকেরাই পৃথিবীর লোককে ভুলাইয়া থাকে, ইহারা শুধু লোকের প্রশংসা পাইয়াই সন্তুষ্ট। নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি কিংবা ঈশ্বর-চরণে নির্ভর একেবারে নাই।

প্রবচনের দ্বারা লোকে যেরূপ আত্মপ্রতারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ

মেধা দ্বারা প্রখরা বুদ্ধি দ্বারাও লোকে প্রতারিত হইয়া থাকে। যাহাদের নিজের বেশি শক্তি নাই, বাগ্মিতা নাই, তাহাদের এইরূপ বিপদেরও আশঙ্কা নাই, তাহারা নির্জনে বসিয়া ঈশ্বর-সঙ্গ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ঈশ্বরের দাস হইতে হইলে এবং মানবের সেবা করিতে হইলে এক দিকে এই মেধাশক্তির যেরূপ বিশেষ প্রয়োজন, আবার অন্য দিকে এই মেধাশক্তি মানবকে বিপদেও ফেলিয়া থাকে। "এই লোকটার কি আশ্চর্য বলিবার শক্তি, বেশ কৃতী লোক"— এইরূপ ভাবে লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিয়া নিজেও প্রতারিত হয় এবং জগতের লোকদিগকেও প্রতারণা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত নির্ভর, বিনয়, প্রেম ও বৈরাগ্য জীবনে আসে কি না তাহা একবার চাহিয়াও দেখে না। তোমার মুখ লোকের প্রশংসার দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে, না ঈশ্বরের চরণের দিকে, তাঁহার কৃপার দিকে আছে? যাঁহারা কৃতী, তেজস্বী, বক্তৃতাকারী এবং কর্মশীল, তাঁহাদের এই প্রকার বুদ্ধি তাঁহা-দিগের ধর্মজীবনের পথে বাধাস্বরূপ হইয়া, তাঁহাদিগকে ঈশ্বর-চরণের দিক হইতে ফিরাইয়া রাখে, এবং ঈশ্বরের কৃপা হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়।

তৃতীয়ত, বহুনা শ্রুতেন। বিজ্ঞানবিদ্ এবং দর্শনকারের যুক্তি আলো-চনা করিয়া এবং সমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যাহারা জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদেরও এই বিপদ। অবশ্য এই সমুদয়ও ধর্মসাধনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই শাস্ত্রপাঠও ধর্মার্থীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। আচার্যের নিকট বিনয়াবনত হইয়া উপদেশ গ্রহণ করাও নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইহাতেও আবার মানবের মনে আত্মপ্রতারণা ও জ্ঞানাভিমান আনয়ন করিয়া থাকে। "আমি বড়ই জ্ঞানী, আমি সবই বুঝি, অপর কেহ কিছু বুঝে না"— এইরূপ অভিমানে তাহারা ডুবিয়া থাকে, ঈশ্বরকে চায় না, শুধু নিজের প্রশংসাই চায়। এই জন্য ঋষিরা

বলিয়াছেন যে, শ্রবণের দ্বারা, মেধার দ্বারা কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা যে ঈশ্বরকে পাইবেই পাইবে তাহা নয়, বরং না পাওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। উপরোক্ত গুণ এবং শক্তি-সম্পন্ন লোকদেরই বেশি ভয়।

অনেক বার এইরূপ দেখিয়াছি যে, কোনও স্থানে হয়ত প্রচার-কার্যে গিয়াছি। সেখানে সাধারণ লোক, বেনে, দোকানদার প্রভৃতিই অধিক। নিজকে অজ্ঞ বলিয়া যাহারা জানে, এইরূপ লোকই বেশি। শাস্ত্রাভিমানী ধর্মের পাণ্ডাও যে না আছে এমন নয়। যেমন ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া ভগবদ্‌ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমের কথা বলিলাম, তখন দেখিলাম, সর্বসাধারণের মন একেবারে গলিয়া গিয়াছে ; তাহারা বলিল, "বাঃ, বাঃ, মহাশয়, কি চমৎকার কথাই বলিলেন।" অপর দিকে সেই জ্ঞানাভিমানী ধর্মের পাণ্ডারা শুনিয়া হাসিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "তোমরা যা বলিলে, তা ঠিক নয়, ভুল। ও কথার এরূপ ব্যাখ্যা নয়, ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা আছে" ইত্যাদি। সেণ্ট পল যখন করিন্থ-বাসীদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন করিন্থবাসী জ্ঞানাভিমানীরা তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানাভিমানীরাই বেশি শত্রুতা করিয়া থাকে এবং তাহারাই ধর্মের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন যে, এই তিনটিই ধর্মপথের অন্তরায়।

যে চায়, সেই তাঁহাকে পায়। ঈশ্বরকে চাওয়া কি প্রকার? মানুষ যে ধন, মান, সুখ, প্রতিপত্তি চায়, তার অর্থ কি ? যতদিন ধন তোমার আমার ইচ্ছাধীন নয়, তুমি আমি ইচ্ছা করিলে তাহা সম্ভোগ করিতে পারি না, ততদিন ধন তোমার আমার নয়। যখন সেই ধন আমার ইচ্ছাধীন হইল, ইচ্ছা করিলেই আমি তাহার ব্যবহার করিতে পারি এবং তাহা আমার অভাব পূরণ করিতে পারে, তখনই ধন আমি

পাইলাম। ঈশ্বর-লাভের অর্থও সেইরূপ। যখন ঈশ্বরকে আমি আমার আধ্যাত্মিক জীবনে সম্ভোগ করিতে পারি, তখনই তাঁহাকে আমার লাভ করা হইল।

অনেক সময় পতি পত্নীকে বলেন, "আমি অনেক সৌভাগ্যে তোমাকে পাইয়াছি।" এখানেও ধনোপার্জনের ন্যায় 'পাইয়াছি' কথার অর্থ, একে অন্যের হইয়াছে এবং উভয়ের প্রেম ও ইচ্ছার যোগ হইয়াছে। ঈশ্বরকে পাওয়াও সেইরূপ। তাঁহার সহিত প্রেম ও ইচ্ছার যোগ হওয়াই তাঁহাকে পাওয়া। অতএব দেখিতেছি যে, যে চায় সেই পায়। এখন এই 'চাওয়া' এবং 'পাওয়া'-র অর্থ কি? কিরূপ অবস্থাতে বলিতে পারি যে, আমার হৃদয় ঈশ্বরকে চায়? যাহারা বিষয়বাণিজ্য করে, এই যে স্বার্থপর বণিক নানা উপায়ে ধন সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে, "হাঁ, আমি ধন চাই", কিন্তু সে যে চায়, তার চাওয়া, আর তুমি যে ব্রহ্মকে চাও, এই দুই চাওয়ার ভিতরে অনেক প্রভেদ আছে। প্রকৃত চাওয়ার অর্থ, আমি ধর্মই চাই, সংসারে সুখ চাই না, লোকের প্রশংসার আশা রাখি না, দূর হউক সংসারের সুখ— আগে ধর্ম চাই, তার পর অপর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। বিষয়ী বলিবে, "আমি ধন চাইই চাই, ধন ছাড়িয়া যত ধর্ম হইতে পারে হউক।" একজন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ অন্য সব বস্তুকে অতিরিক্তের মধ্যে ধরেন, অপর ধনকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাখিয়া অন্য সকলকে তাহার নিম্নে স্থান দেন।

যিনি প্রকৃত ধার্মিক এবং ধর্ম লাভ করাই যাঁহার প্রাণের প্রধানতম আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার প্রাণে সর্বদা এই ভাব জাগরূক যে, "হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার দ্বারা।" বিষয়ী ব্যক্তি সর্বদা বলেন যে, "আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক ঈশ্বরের দ্বারা"। এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রার্থনা মানুষ

সর্বদাই করিয়া থাকে। কোনও গুরুতর মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে লোকে কালীঘাটের কালীর নিকট মানত করিয়া থাকে, "হে মা কালী, যদি এই মোকদ্দমায় জিত হয়, তাহা হইলে তোমাকে পাঁঠা দিব।" এ স্থলে মানুষের ইচ্ছা দেবতার দ্বারা পূর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে।

এই দুই প্রকারের ইচ্ছাতে পার্থক্য আমরা সহজেই দেখিতে পাই। মানব ঈশ্বরকে অকপট ভাবে চায় কি না, তাহা আমরা কি করিয়া পরীক্ষা করিব ? এমন কোনও সংকেত আছে কি ?

প্রথমত, হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, তুমি প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক উদ্যমে নিজ ইচ্ছার চরিতার্থতা চাও, না ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক ইহা চাও ? আপনাকে বড করিতে চাও, না সত্যকে জয়যুক্ত করিতে চাও ? নিজের যশ, মান, শক্তির ক্ষেত্র উন্নত করিতে চাও, না সত্যের জয় হউক তাহাই চাও ? তুমি ধর্মসাধন কর, পরোপকার কর, নরসেবা-ব্রতে জীবন দাও, তাহাতে তোমার উৎসাহ উদ্যম থাকিতে পারে, স্বীকার করি; কিন্তু বলি, ইহার মধ্যে তোমার নিজের ইচ্ছাও রাখিয়াছ কি ? ব্রহ্মকৃপা এবং মানবের আত্মগরিমা এই দুইটি একত্রে থাকিতে পারে না। যেমন পিচকারিতে যখন বায়ু থাকে তখন তাহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু বায়ু টানিয়া লইলে তবে তাহাতে জল প্রবেশ করে, সেইরূপ আত্মবিলোপ না করিলে ব্রহ্মকৃপারও আবির্ভাব হয় না। মানবের অন্তরে আত্মপ্রভাব এবং ঈশ্বরের করুণা এই দুই পদার্থই রহিয়াছে। যে পরিমাণে আত্মগরিমা হৃদয় হইতে সরাইয়া লইবে, সেই পরিমাণে তোমার হৃদয়ে ব্রহ্মকৃপার আবির্ভাব হইবে।

গান গাহিবার সময় দুর্বল গায়কের মনে যেরূপ ইচ্ছা থাকে যে,

কিরূপে অপর গলার উপরে নিজের গলাও লোককে শুনাইবে, সেইরূপ হে ব্রাহ্ম! তোমারও কি ইচ্ছা যে, ব্রহ্মনামের ধ্বনি উঠুক এবং সেই ধ্বনির ভিতরে লোকে তোমার কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাউক? দুর্বল ব্রাহ্মসমাজের জয় হোক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমারও নামের জয়ধ্বনি উঠুক?

দ্বিতীয়ত, আমাদের মনে এইরূপ ভাব হওয়া চাই যে, ঈশ্বরের জন্য, ধর্মের জন্য, আত্মার জন্য ছাড়িতে পারি না এমন কোনও আসক্তি নাই। আমরা ভগবান্‌কে চাই কি? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ধর্মের জন্য সকলই পরিত্যাগ করিতে পারিতাম, তাঁহার কার্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতাম; তাহা হইলে কি করিয়া বিষয়াসক্তির হস্ত হইতে মুক্তি পাইব এবং যথার্থ ত্যাগ করিতে পারিব, এই ভাব মনে আসিত। এক সময় এক স্থানে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, একজন ব্রাহ্ম বন্ধু বড়ই দয়ালু এবং পরসেবাপরায়ণ। সেই সহরে তখন বসন্তের বড়ই প্রাদুর্ভাব। একজন লোকের বসন্ত হইল। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক; কিন্তু তিনি একটু ভীত না হইয়া তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কি করিয়া তাহাকে বাঁচাইবেন, শুধু ইহাই বলাবলি করিতে লাগিলেন। এইরূপ আমরা পরস্পরকে কিসে বাঁচাইব, এইরূপ ভাবনা ভাবিয়া থাকি কি? ভগবান্‌কে আমরা চাই কি? যদি তাহাই হয়, যদি আমরা ঈশ্বরকেই চাই, তাহা হইলে তাঁহার করুণার উপর একেবারে আপনাকে সঁপিয়া দিতে হইবে।

তৃতীয়ত, তোমরা প্রতিদিন জীবনে যে কাজ কর, তাহাতে ঈশ্বরের প্রসন্নতা চাও, না মানবের প্রশংসা চাও? লোকে নিন্দা করে করুক, অসন্তুষ্ট হয় হউক, বিরোধী হয় হউক, তাহাতে কোনওই দুঃখের কারণ নাই। তুমি সৃষ্টিকর্তা অন্তর্যামী ভগবান্, তুমি যদি

প্রসন্ন হও, তবেই সন্তুষ্ট থাকিব। আমার ধর্ম, বুদ্ধি ও বিবেক যদি সন্তুষ্ট থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট। তুমি নির্জনে নিঃশব্দে ভাল হইতে চেষ্টা কর? না আড়ম্বর করিয়া লোকের প্রশংসা লইতে চেষ্টা কর? এই উৎসবে অনেক বিশ্বাসী লোকের সমাগম হইয়াছে। সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিশ্বাসী লোকের মুখে বেশি কথা নাই, মৌনী হইয়া নিজের দায়িত্ব জীবনে উপলব্ধি করিয়া কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন, "বিনীত ভাবে নিজের কাজ করিয়া যাই। কে কি বলে, কেহ প্রশংসা বা নিন্দা করিল কি না তাহা শুনিব না। নির্জনে, নিঃশব্দে ঈশ্বরের এই উৎসবে যে যা পারি তাহাই করিব।"

প্রকৃত ধার্মিক এবং বিশ্বাসী লোক কেবল ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভেরই প্রয়াস পান। অন্য কোনও জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। এই জগতে সাধুভক্তের ভাগ্যেই এইরূপ ঘটে যে, লোকে তাঁহাদেরই বিরোধী হয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে অনেকেই দেখিতে পারিত না, চারিদিকেই তাঁহার শত্রু ছিল। এইরূপ অবস্থায় কি করিয়া সাধু মহাত্মারা প্রসন্ন থাকেন? ঈশ্বরের চরণের দিকে চাহিয়া। তাঁহারা বলেন, "হে আমার প্রভু, পরমেশ্বর! লোকে নাই বা বুঝুক তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই, আমি কেবল তোমারই প্রসন্নতা চাই, তোমারই প্রসন্নতা লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজ জীবনের কর্তব্য পালন করিয়া যাইব।" যখন চারিদিকের লোকে রাজা রামমোহন রায়ের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি "লোকে যাই বলুক না কেন, ঈশ্বর-চরণে আমার মাথা রহিয়াছে, তাহাই অনেক, তাহাই আমার জীবনে যথেষ্ট সান্ত্বনা" এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন।

চতুর্থত, আমাদিগের নির্ভর কোথায়? ভগবানের উপরে, না

নিজ নিজ শক্তির উপরে, ধনের উপরে কিংবা জ্ঞানের উপরে? আমরা যে ধর্মসমাজের ও মানব-সমাজের সেবা করিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি, আমাদিগের নির্ভর কোথায়? নিজ বুদ্ধি, প্রখর মেধা, পার্থিব সহায়-সম্বলের উপরে? যদি তাহাই হয় তবে ভগবানের উপর নির্ভর কোথায়? নিজের উপরে নির্ভর থাকিলেই দেখিতে পাইব যে, সহজেই দুর্বলতা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। কোন্ শক্তির বলে এই ভাব দূর হইবে? এ কি মানুষের উপর নির্ভর করিলে হইবে? না—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

আমরা ভগবানের দাস। আমরা তাঁহারই সৈনিক। যুদ্ধক্ষেত্রে, সম্পদে, বিপদে সেই ব্রহ্মশক্তির নিশান হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিব, সংগ্রাম-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইব না।

কোন কোনও ঋতুতে আমরা দেখিতে পাই যে, রাস্তার ধারে গ্যাস-পোস্টের চারিদিকে অগণ্য কীট মরিয়া পড়িয়া থাকে। হে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা! লোকে যদি দেখে যে তোমরাও সেইরূপ মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছ, তাহা হইলেই হইল। কিসে কি হইবে জানি না। ঈশ্বর-চরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিব। এই যে আজ এতগুলি ব্রাহ্ম একত্র হইয়াছি, কে জানিত যে এরূপ হইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে ব্রাহ্ম কোথাও আছে কি না খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এই ব্রহ্মোপাসনার জন্য বাড়িতে কত নির্যাতন সহ্য করিয়াছি। তখন কি জানিতাম এতগুলি ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার একত্র সম্মিলন হইবে? কে ধর্মের বিজয়নিশান হস্তে লইয়া ভগবানের চরণে পড়িয়া থাকিবে এবং কে চলিয়া যাইবে, তাহার কিছুই জানি না। কেবল এইমাত্র জানি যে, ভগবানের কৃপাই একমাত্র ভরসা। তিনিই সব জানেন। তাঁহার সত্যধর্মেরই জয় হইবে। "আমি তোমার

চরণে পড়িয়া থাকিব, তোমার করুণায় আত্মসমর্পণ করিব, এবং তোমার আদেশমত কার্য করিব, তুমিই সব জান, আমি তোমার কৃপা ছাড়া আর কিছুই জানি না"—এইরূপ ভাবে যখন ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিতে পারিব, তখন বুঝিতে পারিব যে, প্রকৃতভাবে আমরা ঈশ্বরকে চাই।

যদি প্রকৃত ধর্মজীবনই লাভ না হইল, তবে হইল কি? বিজ্ঞ হইয়াছি, বরং আর একটু কম হইলেই ভাল ছিল। বক্তৃতা ঢেরই করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে জীবন ফিরিল কই? জীবন চাই, ধর্ম চাই, সত্য চাই, সত্যের নিশান হস্তে ধারণ করিব। এইরূপ ভাব প্রাণে আসিলে মানুষের সঙ্গে শত্রুতা থাকে না, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইয়া যায়। আকাশে ঢিল মারিয়া যদি কেহ বলে, ইহা আর ফিরিয়া আসিবে না, এ যেরূপ শুনিলেও গ্রাহ্য করি না, সেইরূপ সত্যের জয় হইবে ইহার বিপরীত কথাকেও গ্রাহ্য করি না; লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকে যদি তাহার বিপরীত কথা বলে তথাপি বলিব, সত্যেরই জয় হইবে। সত্যের সুমধুর হিল্লোলের এবং তাহার পবিত্র সংস্পর্শের স্বাধীন রাজ্যের প্রজা হইব। রাজাধিরাজ বিশ্বপতি পরমেশ্বরের চরণাশ্রয়ে বাস করিব। সম্পূর্ণ অন্তরের সহিত একমাত্র তাঁহাকেই আমরা চাহিব, তাঁহার করুণার জয় আমাদের জীবনে হউক। যদি এখনও হৃদয়ে ব্যাকুলতা না আসিয়া থাকে, তবে এস সকলে মিলিয়া শপথ করি, তাঁহার চরণে ধন্না দিয়া পড়ি, "জীবনে পাইবই পাইব।" হে প্রভু! তোমাতে দৃঢ় বিশ্বাস হউক, তাহা না হইলে এই যে আমরা পড়িলাম তোমার চরণে, আর উঠিব না। দেখ, আজ একবার প্রেম-চক্ষে, দিব্য-চক্ষে দেখ, করুণাময়ের করুণা, দয়ালের দয়া দেখ। আজ দয়ার অঞ্জনে চক্ষু অনুরঞ্জিত কর, এস আমরা সকলে সত্যস্বরূপের সত্যধর্মের কজ্জল

চক্ষে দিয়া বাহির হই। লোকে দেখুক, দেখিয়া বলুক যে, জগৎ-জননী প্রেমময়ী ইহাদের চক্ষে কজ্জল পরাইয়া দিয়াছেন। মাঘোৎসব এই নব নব জীবনের মন্ত্র কানে বলুক, আমরা ধন্য হইয়া যাই। পাপীর উদ্ধার-কর্তা, দীন-দয়াল, করুণাময় পরব্রহ্মের জয়।

১৩০৩

নব ভক্তি ও তাহার প্রতিবন্ধক

গত পরশ্ব দিবস ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে কয়েক পংক্তি সাধুজনের উক্তি উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ কয়েক পংক্তির মর্ম এই— যিনি মানবাত্মাতে তিনিই মানব-সমাজে ও তিনিই জড়রাজ্যে।

মানবের ঈশ্বর-অন্বেষণ-রূপ ব্যাপার নির্জনে গভীরভাবে চিন্তা করিলে চক্ষে জল রাখা যায় না। মানবের কিরূপ আশ্চর্য প্রকৃতি যে, দেখিবার শুনিবার জিনিস কত রহিয়াছে, ভোগলালসা, বিষয়াসক্তি, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি চারিদিকে প্রচুর রহিয়াছে, যাহাতে সহজেই মানবের চিত্তকে নিযুক্ত রাখিতে পারে। কিন্তু তবুও ইতিহাস পাঠ করিলে কি দেখিতে পাই? মানব চিরকালই কোন্ বস্তুর অন্বেষণ করিয়া আসিয়াছে? ঐ যে তন্ন তন্ন করিয়া ভিতরে বাহিরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, যেন কিছুতেই আশ মিটিতেছে না, যেন কোনও একটা বিশেষ জিনিস চাই, তাহা না পাইলে প্রাণে শান্তি হয় না, উহা কি? উহা কোন্ জিনিস? কিছু প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, কি যে চায় কিছুই বলিতে পারে না, তবু খুঁজিতেছে, তবু অন্বেষণে চলিয়াছে। প্রাণের ভিতরে কোনও আদর্শ না থাকিলে বাহিরে কখনই অন্বেষণ করিত না। আত্মাতে ঈশ্বর রহিয়াছেন বলিয়াই জড়জগতে এবং মানব-সমাজে মানব তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াছে। যেমন অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে, লোকে বাজারে মুক্তা কিনিতে গিয়া কিরূপ মুক্তার দরকার, কিরূপ মুক্তা চায়, তাহা যে কিনিবে সে-ই জানে, তার ভাবটা মনে আছে এবং সেইরূপই সে চায়। কত রকম দেখিল, এটা নয়, ওটা নয়, কিন্তু ঠিক যে-রকমটি চায়, তাহা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। যাহা চায়

ঠিক তাহার আদর্শটির সঙ্গে না মিলিলে সে ফিরিবে না। এইরূপ ঈশ্বর হৃদয়ে না থাকিলে বাহিরেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না, অনুসন্ধানও সম্ভবপর হয় না।

হৃদয়ের ঈশ্বরের বাহিরে অন্বেষণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ভূতোপাসনা, ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোম প্রভৃতির উপাসনা; তৎপরে দেবোপাসনা; তার পর ব্রহ্মোপাসনা। এই ভূতো-পাসনা এবং দেবোপাসনার মূলেও হৃদয়ের ঈশ্বরকে বাহিরে অন্বেষণ করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। দেখিতে পাই, প্রাণে যে ছবিটি, আদর্শটি, রহিয়াছে, সেইটি অগ্নিতে অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছে, "এই সেই, এই আমার ঈশ্বর।" আবার যখন অগ্নিকে পরিত্যাগ করিল, তখন বায়ু জল প্রভৃতি অন্য কোনও বস্তুকে ধরিল। কিন্তু শেষে দেখিল তাহাও ঈশ্বর নয়। এইরূপে ক্রমে সকলটাই দেখিয়া যখন বুঝিল যে সকলই ক্ষুদ্র, তখন মানব জানিতে পারিল যে, না, ইহাতে তাহার ঠিক আদর্শটি নাই।

ভিতরে নিবিষ্টচিত্তে নিমগ্ন হইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলই অনিত্য এবং এক আত্মাই তার ভিতরে নিত্যপদার্থ। হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি মানবীয় ভাবমাত্রই পরিবর্তনশীল। এই হর্ষের উদয় হইল, আবার ক্রোধ আসিল, আবার একটু পরে তাহাও চলিয়া গেল, হিংসা আসিল। কিন্তু এই অসার অনিত্যের ভিতরে একটি সার নিত্যপদার্থ আছে, যাহা "সূত্রে মণিগণাইব" আমার অভ্যন্তরে থাকিয়া, আমার অস্থায়ী ভাব ও চিন্তাতে প্রবেশ করিয়া, আমার সমুদয় ভাব ও চিন্তাকে একত্র গাঁথিয়া মালা করিয়াছে। তাহাই আমার 'অহং'-শব্দবাচ্য, তাহাই আমার ভিতরে অনিত্যের মধ্যে নিত্য। আমার ভিতরে যেরূপ চিন্তাসকল একত্র এক সূত্রে বাঁধা রহিয়াছে, সেইরূপ সেই

পরমাত্মা-রূপ সূত্রে সমস্তই গাঁথা রহিয়াছে। জড়, চেতন, মানব-সমাজ প্রভৃতি সকলই একত্র গ্রথিত রহিয়াছে। তিনিই অনিত্যে নিত্য, বিকারীতে অবিকারী, পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, ছায়াতে সত্য এবং সমুদায় অবস্তুর মধ্যে একমাত্র সার বস্তু। আত্মাতে তিনি 'সত্যং' রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

এইরূপে মানব তাঁহাকে আত্মায় দেখিতে পাইয়া, সেই আদর্শ লইয়া বাহিরে তাঁহার অন্বেষণ করিতে গেল। কোথায় গেল? মানব-সমাজে যখন খুঁজিতে গেল তখন সেখানে কি দেখিল? দেখিল, যিনি আত্মায় 'সত্যং' রূপে, তিনিই করুণাময় বিধাতা রূপে মানব-সমাজেও বিদ্যমান রহিয়াছেন।

কিন্তু যখন আমরা মানব-সমাজ দেখি, তখন দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর পূর্ণ মঙ্গলময়। মানব-সমাজে আমাদিগের মধ্যে সাধু অসাধু দুইটি ভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলই একটি আশ্চর্য নিয়মে আবদ্ধ। সংশয়-বাদীদের কথাই যদি সত্য হয়, যদি পুণ্য অপেক্ষা পাপই বেশি হয়, তবে একটি প্রশ্ন এই আসে যে, অসৎ সৎ-এর শাসনাধীন আছে কেন? শাসনের অনুগত থাকা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। এই কারণে অসৎ সৎকে কিছু করিতে পারে না। যেরূপ লোকে ক্ষেত্রের জল যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে, সেজন্য ক্ষেত্রের চারিদিকে আলি দেয়, সেইরূপ ভগবান্ সেতুস্বরূপ হইয়া মানব-সমাজ-রূপ ক্ষেত্রকে সর্বদা রক্ষা করেন।

তোমার আমার সকলের মধ্যে দ্বেষ প্রতিহিংসা প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তবু কেন মানব-সমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় না? দেখ, অন্যায়ের উপর ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চিরকালই সংগ্রাম চলিতেছে। সর্বদেশের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে,

অন্যায়ের উপর ন্যায়কে, অসাধুতার উপর সাধুতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং নানাবিধ অত্যাচার দমনের জন্য চিরকালই সংগ্রাম চলিয়াছে। ধিক্ সেই চক্ষুকে, যে চক্ষু ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে পায় না। তিনি অন্তরে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া আমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাই না, তিনি আছেন তাই অন্যায় অত্যাচার নিবারিত হয় এবং অসাধুতার উপরে সাধুতা স্থাপিত হয়। তিনিই মঙ্গলময় প্রভু হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। তিনিই প্রভু রূপে আমাদিগের বিবেক-বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, আমাদিগের ধর্মাধর্মবুদ্ধি তাঁহারই নিশ্বাস। ইহা দেখিয়াই প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন, "তিনি শিবম্।" আত্মাতে যিনি 'সত্যম্', জনসমাজে তিনি 'শিবম্'। বিবেক-বুদ্ধিতে ধর্মকে তিনি প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

তৎপরে জড়জগতে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়া দেখ। এই যে যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতেছে, মহা বিবর্তন-প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশৃঙ্খলার ভিতরে শৃঙ্খলা, অনিয়মের মধ্যে নিয়ম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্বত্র। এইরূপ জড়জগতেও তিনিই 'সুন্দরম্'। আজ এই মহামন্ত্র আমরা গ্রহণ করিব—"তিনি সত্যং শিবং সুন্দরং"। তিনি 'সুন্দরম্'। এই সৌন্দর্যের বিষয় যখন চিন্তা করি, মন তখন কি বিস্ময়ে ডুবিয়া যায় না? ব্রাহ্ম কবি বলিয়াছেন, "মহা কবি আদি কবি ছন্দে উঠে শশী রবি"। কি সুন্দর rhythm, চারিদিকে সংগীত, চারিদিকে কাব্য। ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে চাও কেবলই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের পর সৌন্দর্য। এক-একবার মনে করি, এত সৌন্দর্য ভগবান্ কেন সৃষ্টি করিলেন? অনুবীক্ষণ দ্বারা হাজার হাজার প্রাণীর সৌন্দর্য দর্শন করিয়া একেবারে মন মোহিত হইয়া যায়, এত বর্ণ, এত চিত্র, কেমন সুন্দর! কখনও মনে হয় যে, বাহিরে সৌন্দর্যের প্রয়োজন রহিয়াছে;

কাজও আছে। ফুল যদি সুন্দর না হইত, মৌমাছি জানিত কি প্রকারে? আচ্ছা, মনে করিলাম যে, এই বাহিরের জগতে সৌন্দর্যের প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু অনুবীক্ষণের দ্বারা যে হাজার হাজার প্রাণীর সৌন্দর্য দেখিতে পাই, সেই সৌন্দর্য ঐ-সকল ক্ষুদ্র কীটাণুকে ভগবান্ কিসের জন্য দিলেন? সৌন্দর্য দ্বারা তিনি জগৎ মাতাইয়াছেন, পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহাকে ভিন্ন দেখিলে চলিবে না। এক সময় ছিল যখন মানব ভগবান্‌কে স্বতন্ত্র ভাবে দেখিয়াছিল। এমন জাতি জগতে অনেক ছিল যাহারা ভগবান্‌কে স্বতন্ত্র ভাবে দেখিত।

ভারতের প্রাচীন আর্য ঋষিগণ ভগবান্‌কে আত্মায় পরমাত্মা রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। অনিত্যে নিত্য, আত্মায় পরমাত্মা, ছায়াতে সত্য, এইরূপ ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া নিত্যানিত্য-বিচার ফুটিয়া উঠিল। মোহ তাঁহাদের নিকট পাপ। যাহাতে অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করায় তাহাই মোহ।

প্রাচীন য়িহুদীদের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানব-সমাজের ইতিবৃত্তে ঈশ্বরকে দর্শন করাই তাঁহাদের ধর্ম। অতএব তাঁহারা ঈশ্বরকে বিধাতা বলিয়া জানেন, ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়াই তাঁহাদের নিকট পাপ।

প্রাচীন গ্রীক জাতিরা জড়জগতে ঈশ্বর-দর্শন করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদের অন্তরে সৌন্দর্যের ভাব ফুটিয়াছিল। গ্রীক সাহিত্যে সমুদয়ই সৌন্দর্যের ভাবে পূর্ণ। তাঁহাদের মতে অসুন্দর কাজ পাপ ও সুন্দর কাজই পুণ্য।

আমরা বড়ই সৌভাগ্যবান্। এই যে নূতন ভক্তিধারা ঈশ্বর-কৃপাতে প্রবাহিত হইয়াছে, ইহাতে সকল ধারাই একত্র মিলিয়াছে। যিনি আত্মায় তিনিই জড়ে এবং তিনিই মানব-সমাজে বিদ্যমান

রহিয়াছেন। এই তিনটি একত্র মিলিয়াছে, এক সূত্রে সকল গ্রথিত হইয়াছে। এই উদার এবং মহৎ ভাব আমরা পাইয়াছি।

পূর্বে আত্মা ও দেহে, আত্মা ও জড়ে এবং জনসমাজের মধ্যে বিবাদ ছিল। খ্রীষ্টান ও য়িহুদীদের মতে শরীর আত্মার প্রধান শত্রু, ঈশ্বর-বিরোধী শরীরই আত্মার উন্নতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। যেন এই ধর্মবিরোধী শরীরকে নিগ্রহ করা এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়াই তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম। আমাদের দেশে এইরূপ আত্মা ও মানব-সমাজ-মধ্যে বিবাদ ছিল। এই জনসমাজ এবং ইহার সহিত যে সম্বন্ধ, ইহাই অনিষ্টের মূল। এই জনসমাজে বাস করি বলিয়াই সকল অনিষ্ট হয়। এইরূপ আত্মায় এবং জড়জগতে বিরোধ। জড়জগৎকে ভাল-বাসিবে না। ইহা ধর্মের কার্য নয়। ধার্মিক পুষ্পকে দেখিয়া আনন্দ করিবেন না। ধার্মিক লোক জড়জগৎকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন।

কিন্তু এই নব ভক্তির ধর্মেতে যেমন এক দিকে দেখিতে পাই যে, হিন্দু, গ্রীক, য়িহুদী সকলের একত্র মিলন হইয়াছে, অপর দিকে আত্মার এবং দেহের বিবাদও ঘুচিয়া গিয়াছে। আবার আত্মা, জড়জগৎ এবং জনসমাজ সকলই এক। এই ভক্তির আবিষ্কার এক মহা সম্পত্তির আবিষ্কার। ইহাকে প্রাণে পাওয়া যায়; ইহাতে প্রাণ সমর্পণ করা এবং ইহাকে চক্ষের নিকটে রাখা আবশ্যক। বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মেরা যদি এই গম্ভীর এবং মহাভক্তির ধর্মকে রাখিতে পারেন, তাহা হইলেই সকল হইবে। যেমন যুদ্ধের নিশান। সৈন্যগণ যতই কেন ছত্রভঙ্গ হইয়া যাউক না, এই নিশান একবার দেখিলেই পুনরায় একত্র হইতে পারে। এই যে উদার, মহৎ এবং আধ্যাত্মিক ধর্মের আদর্শ, ইহাই আমাদের নিশান। যতই কেন ছত্রভঙ্গ হইয়া যাও না, এই নিশানের দিকে আসিতে চেষ্টা কর। এই ত সকলই করিতেছি, তবুও কেন সেই

পবিত্র সাত্ত্বিকা ভক্তিকে পাই না? যখনই চিন্তা করি, প্রাণে বড়ই ক্লেশ হয়। ছেলেরা যেরূপ আঙ্গুল-ধরা খেলা করে, ধরিতে আসিলেই আসল আঙ্গুলটি লুকাইয়া অপর একটি ধরিতে দেয়, সেইরূপ কে আমাদিগকে আসল কাড়িয়া লইয়া নকল ধরিতে দেয়! ভগবানের কৃপা ধরিতে গিয়া দেখি, কতকগুলি কথা, উপদেশ ও শব্দ ধরিয়াছি। কেন আমাদিগের মধ্যে প্রেম সঞ্চার হয় না? ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া যে জন্মটা গেল, তবু কেন হৃদয়ে প্রেম জাগিল না? ও সকলই শূন্য, আমাদিগের কিছুই নাই, আমরা নাস্তিক। জীবনে যদি ভগবান্‌কে ধন্যবাদ করিতে না পারিলাম, তবেই ত আমরা নাস্তিক। শুধু সপ্তাহান্তে একবার একবার করিয়া আস্তিক হই।

আজ আত্মার পরীক্ষার দিন, আজ ঈশ্বর-চরণে পড়িবার দিন। গান অনেক করা হইয়াছে, কীর্তন ও অনেক করিয়াছি, ধর্মের কথা কত বলিয়াছি, কিন্তু তবুও কেন প্রেম আসিল না? নিশ্চয়ই কোনও বিঘ্ন আছে। রন্ধন করিবার সময় যেমন তৈল দিয়াই মসলাটা ফেলিয়া দেয় না, ফেনাটা না মরিলে মসলা দেয় না, স্ত্রীলোকেরা বলেন, "দেরি কর, গাঁজাটা মরুক", তেমনি ভক্তি জন্মিবার পূর্বে গাঁজা মরা চাই। যাহার প্রকৃতির গাঁজা মরে নাই, সে এখনও ভক্তি হইতে দূরে আছে। এই আধ্যাত্মিক গাঁজা কি?

প্রথম, অহং-ভাব, 'আমি করিব' এই ভাব, সর্বদাই নিজের শক্তি এবং ক্ষমতার উপর দৃষ্টি। হৃদয়ে এই অহং-ভাবের প্রবলতা থাকিলে যখনই কেহ কোনও বিঘ্ন উপস্থিত করে, কিংবা কোনও বিষয়ের প্রতিবাদ করে, তখনি তাহার উপর ক্রোধ হয়। এই অহংকার মন্দ ভাবেও প্রকাশ পায়, আবার ইহা ধর্মের আকারেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাহিরে সংকার্য করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছাই প্রবল। ধ্রুবের তপস্যার

ভিতরে প্রবেশ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই ? তিনি যে শুধু ভক্তির জন্যই তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা নয়। বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার অহমিকা আঘাতপ্রাপ্ত হইল, তখন তিনি বলিলেন, "অপেক্ষা কর, তপস্যা করিয়া সেই স্থান লাভ করিব, যাহা তাঁহারাও লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।" নিজের কঠিন প্রতিজ্ঞা রাখিবার জন্যই ধ্রুবের এই সাধন। এই আত্মগরিমা ভক্তিকে জন্মিতে দেয় না।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানাভিমান, আপনাকে বড়ই জ্ঞানী মনে করা। "আমার চরিত্রের অনেক গুণ আছে", এবং সেই জ্ঞানেই সর্বদা স্ফীত। এইরূপ ভাব যখন ফুটিয়া উঠে, তখন ধার্মিক বলেন, "ভক্তি বহু দূর।"

তৃতীয়ত, কাহারও ভিতরে আবার ঈর্ষা গাঁজা মরিতে দেয় না। "সমাজে অমুক বড় পদ পাইল, আমি কেন পাইলাম না ; অমুক বেদীতে বসিতে পাইল, আমি পাইলাম না কেন ?" এইরূপ ঈর্ষাপূর্ণ ভাব হইতে ভক্তি বহু দূরে থাকেন।

চতুর্থত. বিদ্বেষ। তুমি যখন দেখিতেছ তোমার একটু সামান্য অনিষ্ট করিলে বিদ্বেষে স্থির থাকিতে পার না, তখন জানিও, ভক্তি বহু দূরে।

পঞ্চমত, বাসনা, অর্থাৎ অপবিত্র ভাবে পরস্পরের সহিত মিলিবার প্রবৃত্তি। যখন প্রকৃতিতে এ ভাব বিদ্যমান, ততদিন জানিবে, ভক্তি হইতে বহু দূরে রহিয়াছ।

ষষ্ঠত, বিষয়াসক্তি। দশজনের ভিতর একজন হইব, ধনীদের সঙ্গে বন্ধুতায় বাস করিব। বিষয়ের দিকে মুখ এবং ঈশ্বরের দিকে পশ্চাৎ করা, তাহাকেই বলে বিষয়াসক্তি। এই বিষয়াসক্তি না দূর হইলে ভক্তির অধিকার জন্মে না।

এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া ভক্তিধামে উপনীত হইতে হয়।

১৩০৪

অপব্যয়ী সন্তান

বাইবেল গ্রন্থে 'Prodigal Son' নামক একটি আখ্যায়িকা আছে।

এক গৃহস্থের দুইটি পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র একদিন আপন পিতাকে বলিল, "বাবা! আমাকে যাহা দিবে তাহা এখনই ভাগ করিয়া দাও।" পুত্রের কথা শুনিয়া তিনি বিষয় ভাগ করিয়া কনিষ্ঠের প্রাপ্য তাহাকে দিলেন।

কনিষ্ঠ পুত্র তাহার সমস্ত ধন লইয়া বিদেশ যাত্রা করিল। বিদেশ গিয়া অল্পকাল-মধ্যেই সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিল। সেই সময়ে আবার সে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। দুর্ভিক্ষের সময় সে অনাহারে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। কেহই তাহাকে সাহায্য করে না, এক মুষ্টি ভিক্ষাও সে কোথাও পায় না। এইরূপে কিছুদিন অসহ্য দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে সে একটি চাকরি গ্রহণ করিল। এখন তাহাকে মাঠে প্রত্যহ শূকর চরাইতে হয়। শূকর চরায় আর বসিয়া ভাবে, "হায়, আমার কি দশা হইল! আমার পিতার কত চাকর রহিয়াছে, কত চাকর প্রতিদিন খাটিতেছে, আর আমার এই দশা! যাই, পিতার নিকটে যাই।" এইরূপ ভাবে, আবার মনে সংকোচ আসিয়া পড়ে, "যে পিতাকে ছাড়িয়া নিজ সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া চলিয়া আসিয়াছি, কোন্ মুখে আবার সেই পিতার নিকট যাই। লোকেই বা কি বলিবে, 'বড় যে চলিয়া গিয়াছিলে, আবার যে ফিরে এলে?' " এইরূপ চিন্তা ক্রমাগতই মনে আসে। আবার ভাবে, "না, পিতার নিকট আর যাইব না, অন্য কোনও দিকে চলিয়া যাইব।" আবার মনে হয়, "হায়, কেন আসিলাম, এমন পিতাকে ছাড়িয়া কেন আসিলাম, আবার পিতার নিকট যাই, ক্ষমাভিক্ষা করি।"

এইরূপ কত ভাবে, কিছুই ঠিক করিতে পারে না। একদিন তার ঠিক হইয়া গেল, "I will arise and go to my father." এই "will" কথাটিতে কিছু বিশেষত্ব আছে। এই কথায় প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়তা এবং মনের অধ্যবসায় প্রকাশ করে। এই "will" পর্যন্ত পৌছিবার পূর্বে তাহাকে অনেক পথ আসিতে হইয়াছিল। "arise and go to my father"— এই কথাটি হঠাৎ মনে আসে না। এই পর্যন্ত আসিতে তাহাকে অনেক ইতস্তত করিতে হইয়াছে।

আপনারা সকলে একবার চিন্তা করিয়া দেখুন. মাঠে একটি গাছের তলায় একজন পুরুষ মলিন বস্ত্র পরিধানে, পায়ে জুতা নাই, হস্তে যষ্টি লইয়া শূকর চরাইতেছে। হস্তে মুখ রাখিয়া ভাবিতেছে আর চক্ষে জল পড়িতেছে। ভাবিতেছে, "আমি এইরূপ ক্লেশে আর কতদিন থাকিব, পিতার নিকট যাই।" আবার ভাবে, "কোন্ সাহসে যাই? যাঁহার মনে ক্লেশ দিয়াছি, যাঁহার উপদেশ শুনি নাই, তাঁহার নিকট পুনরায় কিরূপে যাইব? না, তাহা কখনই হইবে না, জলে ডুবি কি আগুনে পুড়িয়া মরি তাহাও ভাল, তবু পিতার নিকট পুনরায় যাইব না।" আবার ভাবিতে লাগিল, "যদি না যাই, চিরকাল এই ভাবেই কষ্ট পাইতে হইবে। তাঁহার এত চাকর খাইতে পায়, যাই, গিয়া বলি যে, 'পিতা, তোমার গরুর রাখালি দিয়া আমাকে রাখ।'" আবার ভাবিল, "কেন বাহির হইয়া আসিলাম, হায় রে, রাজার ছেলে হইয়া ভিখারী সে অন্ন পায় না। যে কত দুঃখীকে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিয়াছে, তাহার এই অবস্থা।" তাহার পর আর পারিল না। "I will arise and go to my father— আর নয়, আমি চলিলাম, পিতার নিকটে চলিলাম।" এই "will" পর্যন্ত আসিতে তাহাকে অনেক চিন্তা, অনেক ইতস্তত করিতে হইয়াছে।

প্রত্যেকের ধর্মজীবনেই এইরূপ দেখিতে পাই। মানুষ যখন এইরূপ অবস্থাতে উপনীত হয়, তখনই জীবন ফিরিয়া যায়। পাপ পরিত্যাগ করিয়া এইরূপে কত ব্যক্তি ঈশ্বরের চরণে গেল। এইরূপে কত লোক নিরাশ হইয়া, পাপে পড়িয়া, সংসারে ডুবিয়া ভাবে, "আমার আর কিছুই হইল না, পিতাকে ভুলিয়া যখন পাপে ডুবিয়াছি, তখন কি আর ঈশ্বরের চরণে মন ফিরিবে? দূর হউক! আমার আর কিছুই হইবে না।" এখানে এরূপ কেহ উপস্থিত আছ কি, যে বলিতে পার যে, "আমার জন্য শুধু পাপই রহিয়াছে?" যদি কেহ থাক, এখনই বল, "I will arise and go to my father" বল, "এই উঠিলাম, চলিলাম আমার পিতার নিকটে।" তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া আর অগ্রসর হইব না। যদি একেবারে নিরাশ হইয়া থাক, প্রাণ যদি ঈশ্বরের দিকে আর যাইতে না চায়, যদি মনে ভাবিয়া থাক, "ডুবেছি, একেবারে পাপে ডুবেছি, আর উঠিতে পারিব না", আমি বলি, সে ভাল পরামর্শ নয়, চল, "I will arise and go to my father"—এই প্রতিজ্ঞা কর। গাছের তলায় পাথরের উপর বসিয়া সেই যুবকের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর দিন কাটাইও না। "হায় হায়, কেন পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম।"

এরূপ অনেক পাপী আছে, যাহারা এরূপ অনুতাপ করিয়া অলস ভাবে দিন কাটায়। তাহারা এইরূপে তাহাদের ধর্মজীবনকে সমাহিত করিয়া তাহার উপর বসিয়া অনুতাপে দিন কাটায়। এইরূপ অবস্থা অনুতাপের বিকারের অবস্থা। ইহাতে সে ঈশ্বরের দিকে না চাহিয়া বরং নিজের দিকেই চায়, ইহাই বিকার। কেবলমাত্র দুঃখে, ক্ষোভে এবং অনুতাপে শক্তির ক্ষয় হয়। ইহা বিকৃত অনুতাপ। যে অনুতাপ

করিয়া মানুষ বলে, "I will arise and go to my father", এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে, তাহাই প্রকৃত অনুতাপ।

তোমরা এরূপ অমূল্য জীবন পাইয়া বৃথা কাটাইও না। অনুতাপের বিকৃত ভাব লইয়াই অনেকে থাকে এবং অনেকে উহার অনুসরণ করে। ইহা মানব-জীবনের শেষ বিকারের অবস্থার ন্যায়। একজনের স্ত্রী-বিয়োগ হইল, সে ব্যক্তি স্ত্রীর শ্মশানে প্রতিদিন চার-পাঁচ ঘণ্টা করিয়া বসিয়া কাঁদে এবং বৃথা শক্তি নষ্ট করে। ইহাতে কি হয়? কিছুই লাভ হয় না। উহা অপেক্ষা বরং তাহার সন্তানদের দেখা প্রভৃতি অনেক কর্তব্য রহিয়াছে। এইরূপে শোকে যদি কেহ বৃথা দিন কাটায়, তাঁহাকে আমরা ভালবাসি না। ছেলেদের খাওয়া হইল কি না তাহা দেখে না, একজনের শোকে যে অপরে মরিবে তাহা একবার বিবেচনা করে না। যে চলিয়া গেল, কাঁদিয়া কাটিয়া আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না, তার অপেক্ষা যাহারা জীবিত আছে তাহাদিগকে যত্নপূর্বক পালন কর।

যদি কোনও পাপী পূর্বপাপ স্মরণ করিয়া নিরাশায় ডুবিয়া থাক, তাহাকে আজ বলি, "ওগো, কর কি, কাঁদিয়া আর কি হইবে? উঠ, পূর্ব দিকে চাও এবং ঈশ্বরের প্রেমালোক দেখ।" ইহা না করিলে ধর্মজীবন হয় না। এই প্রতিজ্ঞা মনে আসিলে মন স্বভাবতই বলিবে, "বিষয় লইয়া আর থাকিব না, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাতে আর আসক্ত হইব না, এখন প্রভুর নিকটে যাই।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা মনে উদয় হইলেই ধর্মজীবনের আরম্ভ হয়, আর তাহা না হইলে ধর্মজীবনের সফলতাই হয় না। এই প্রতিজ্ঞা মনে জাগিলে ঈশ্বরের করুণা প্রবাহিত হয়, তখনই জানিতে পারা যায় যে, ভগবান্ তাহাকে ধরিয়াছেন।

অন্ধকার রাত্রিতে জোয়ার আসিয়াছে কি না কিরূপে বুঝিতে পার? নৌকার মুখ ফিরিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, জোয়ার আসিয়াছে। মাঝি যখন দেখিল যে, নৌকা যে মুখ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, নৌকার মুখ ফিরিয়াছে, তখনই বুঝিতে পারিল যে, জোয়ার আসিয়াছে। সেইরূপ, হে মানব! যখন তোমার মুখ পাপ হইতে, বিষয়াসক্তির দিক হইতে ফিরিয়া ঈশ্বরের দিকে যায়, সেই দিন স্বর্গে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেন, সাধুরা আনন্দ করেন। ঈশ্বরের করুণা লাগিলেই মুখ ফিরিয়া যায়। কিন্তু প্রতিজ্ঞার উদয় হওয়া চাই, মনে প্রতিজ্ঞার জোর চাই। "নিজ শক্তিতে যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে। এখন পিতার নিকট যাই"— এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অনেক শক্তির প্রয়োজন।

অনেক সময় দেখা যায়, হয়ত কয়েকজন বন্ধুতে তাস খেলিতেছে। খেলাতে কত প্রবঞ্চনা হইতেছে। যদি হঠাৎ কেহ বুঝিতে পারিল যে, এ প্রবঞ্চনা করিয়া খেলিয়াছে, অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল, "এমন ছোট লোকের সঙ্গে আমি আর খেলিব না।" তখন সকলে বলিল, "ওহে বস-না ভাই, অমন করিয়া রাগ করিতে নাই। এরূপ করাটা উহার অন্যায় হইয়াছে, আর কখনই করিবে না।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সে যুবা "না, এমন ছোট লোকের সঙ্গে কখনই খেলিব না" বলিয়া চলিয়া গেল। তখন সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, "তাই ত, এ যে চ'লেই গেল।" সেইরূপ পৃথিবীর পাপীও যখন বলে, "I will arise and go to my father, তোমরা সকলে পাপের সাথি, এখানে আর কখনও থাকিব না, আমি নিশ্চয়ই যাইব", তখন অনেকে হাত ধরিয়া "বস, আরে বস" ইত্যাদি বলিয়া বাধা দেয়। ব্রহ্মধামে যাইতে এইরূপ অনেকেই বাধা দেয়। তখন সেই যুবকের

ন্যায় "I will arise and go to my father" বলিতে পার না কি? তোমার মনে বল নাই কি? "এই চলিলাম ঈশ্বরের দিকে, যা হবার তা হয়েছে, আমি প্রভুর নিকট চলিলাম।"

আজ মাঘোৎসবের দিনে আমরা কি বলিব? কি লইয়া আমরা এখান হইতে যাইব? আমরা আজ বলিব না কি, প্রতিজ্ঞা করিব না কি যে, যাই পিতার নিকটে? যাইবার সময় পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বাহিরের বিঘ্ন ত থাকেই। সর্বপ্রধান বাধা নিজ দুর্বলতা, ত্রুটি, পাপ এবং নিরাশা। ইহারা এই বলিয়া বাধা দেয় যে, "কি প্রতিজ্ঞা কর, ভাবিয়া দেখ, কত মহা-উৎসব তোমাদের উপর দিয়া চলিয়া গেল, ভাল হইবে বলিয়া কত প্রতিজ্ঞা করিলে, কিন্তু পুনরায় সব ভুলিয়া সেই সংসারে প্রবেশ করিলে, জান না কি তুমি কত দুর্বল?" এইরূপ কত বাধা আসিয়া আমাদিগের মনে উপস্থিত হয়। তখন আমরা একেবারে হারিয়া যাই। জগৎ-বাসী সকলে বলে, "ব্রাহ্মধর্ম কিছুই নয়, ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া কিছুই হইবে না।" আমি তাহাদিগকে সামলাইতে পারি, জগতের লোকের বিরুদ্ধ ভাব সামলাইতে পারি। কিন্তু নিজ প্রবৃত্তির বাণী সামলাইতে পারি না। আজ কেহ কি বলে যে, গিয়ে কি হইবে? যদি কেহ এরূপ বলে, তবে তাহাকে বলি যে, ও ভূতের প্রেতের বাণী চাপা দাও। কর্ণ বধির কর। দুঃখের নিরাশার কথা বলিও না। বল, "I will arise and go to my father." সংসারের কাঁথা পাতিয়া বিষয়-বালিশে মাথা দিয়া যে শয়ান, সে আজ একবার উঠ এবং বল ও প্রতিজ্ঞা কর যে, "চলিলাম পিতার নিকটে।" দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যে শয়ান, আজ বল, "I will arise and go to my father." পাপে তাপে অবশ, বল আজ, "I will

arise and go to my father." আমরা সকলেই প্রতিজ্ঞা করি, তাহা হইলে তাহাতে ঈশ্বরের করুণা অবতীর্ণ হইবে।

আমাদের দেশে যাগযজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠান করিতে হইলে সংযম করিবার নিয়ম আছে। উদ্দেশ্য এই যে, সে যজ্ঞে বিধাতার করুণা এবং দেবতার আশীর্বাদ আসিবে। আমরা সকলে মিলিয়া যদি প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা নিশ্চয় উঠিব এবং ভগবানের নিকট যাইব, তাহা হইলে তাঁহার করুণা নিশ্চয় অবতীর্ণ হইবে। পাপ এবং মোহে ডুবিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব না। রাখাল বালকের ন্যায় আমরাও বলিব যে, "I will arise and go to my father." আমরা নিজকে যদিও হীন, মলিন এবং দুঃখী বলিয়া জানি, তথাপি তাঁহার কৃপা ধারণ করিয়া এবং উঁহাকে সহায় করিয়া সকলে প্রতিজ্ঞা করিব, আমরা নিশ্চয়ই উঠিব। যাহার ধর্মজীবন আরম্ভ হয় নাই, ঈশ্বর করুন আজ তাহা হউক। যখন এরূপ ভাবে সকলে পিতার নিকট যাইব, তাহাই ধর্ম-জগৎ এবং ধর্ম-বিধান। ঈশ্বর করুন, আমাদের হাজার হৃদয়ের সংকল্পের উপরে তাঁহার কৃপা অবতীর্ণ হউক এবং ইহ-পরকালে আমরা সৎ-গতি লাভ করিয়া ধন্য হই।

১৩০৫

মহাপুরুষদিগের বিশেষত্ব

এ কথা সকলেই জানেন যে, শিখ-ধর্মগুরু বাবা নানকের প্রাণে যখন নবজীবন সঞ্চার হইয়াছিল, তখন তিনি একজন বেনের দোকানে কাজ করিতেন। দোকানে বসিয়া ক্রয়-বিক্রয় করিতেন। এই দোকানে বাসকালে তাঁহার অন্তঃকরণে নবপ্রেমের সঞ্চার হইল। তিনি আর দোকানে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না, দোকান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সামান্য ফকিরের বেশে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সুকণ্ঠে হরিনাম কীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সকল লোকে বলিতে লাগিল যে, নানক 'বউরা' হইয়া গিয়াছে, নানক পাগল হইয়া গিয়াছে। "নানক ক্ষেপিয়াছে"— এই রব দেশময় রাষ্ট্র হইল। পথে ঘাটে, নগরে বাজারে, গ্রামে সর্বত্র যে তাঁহাকে জানিত সকলেই বলিতে লাগিল, "নানক ক্ষেপিয়াছে, নানক পাগল হইয়াছে।"

কেবল যে নানককেই এইরূপে লোকে পাগল বলিয়াছিল, তাহা নহে। আমরা দেখিতে পাই যে, জগতের সকল মহাজনকেই এক সময়ে লোকে পাগল বলিয়াছে।

বাইবেল গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, যীশুকে যখন ক্রুশে বন্ধন করিয়া বধ্যভূমিতে উপস্থিত করিল, তখন লোকে কাঁটার মুকুট প্রস্তুত করিয়া তাঁহার মাথায় পরাইয়া দিল। তিনি য়িহুদীদের রাজা— এই ভাবে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া "সেলাম, রাজা" এই বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। এই উপহাসের ভিতর প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই যে, প্রাচীন য়িহুদী গ্রন্থে লেখা আছে, য়িহুদীদের রাজা Messiah হইবেন। যীশুকে তাঁহার শিষ্যেরা যখন Messiah বলিল, তখনই যীশু ধৃত হইলেন। কেননা তিনি য়িহুদীদের

রাজা বলিয়া নিজেকে খ্যাত করেন। কাঁটার মুকুট প্রস্তুত করিয়া তাঁহার মাথায় পরাইয়া উপহাস করিবার তাৎপর্য এই যে, "এটা কোথাকার ক্ষেপা, এর না আছে অন্ন, না আছে পরিধেয়, দীন-দুঃখী ভিক্ষুক, এ কিনা বলে যে, সে য়িহুদীদের রাজা— Messiah?" পাগলকে যেরূপ লোকে উপহাস করে, পথের বালকে গায়ে ধুলা দেয়, সেইরূপ এই বিশুদ্ধ-চরিত্র ঈশ্বর-প্রেমিক সাধুপুরুষকে পথের লোকে উপহাস-বিদ্রূপ করিয়াছিল, পাগল বলিয়াছিল।

কেবল যে যীশুকেই এইরূপ বলিয়াছিল, তাহা নহে। মহম্মদ যখন কাবাতে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, সাধারণ লোকে বলিয়াছিল, "মহম্মদ পাগল হইয়াছে, ক্ষেপেছে।" তিনি যখন মূর্ছা প্রাপ্ত হইতেন, ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন লোকে বলিত, "মহম্মদ পাগল হইয়াছে।"

জগতের বিষয়ী লোকেরা চিরকালই সাধুপুরুষদিগকে পাগল বলিয়া থাকে। কেন পাগল বলে? আমরা দশজনে যেরূপে চলিয়া থাকি, যেরূপে কারবার করিয়া থাকি, কেহ যদি তাহা-ছাড়া হয়, তাহা হইলেই তাহাকে পাগল বলে। এই মহাপুরুষদের জীবনে মানুষ এরূপ কিছু দেখিয়াছিল, যাহাতে তাঁহাদিগকে পাগল ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। নিজের সীমার বাহিরে যদি মানুষ কিছু দেখে, না বুঝিয়া তাহাকে উন্মাদ বলে। প্রথমে যখন ব্রাহ্ম হইয়া পাড়াগাঁয়ে গেলাম, গ্রামের চাষা লোকেরা আসিয়া বলিল, "এর বাই হয়েছে, একে ভূতে ধরেছে, একে মিছরির জল খাইতে দাও।" নূতন আলোক যাহা পাইয়াছি, গরিব চাষা তাহার কি বুঝিবে? অতএব আমাদিগকে পাগল ভাবা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, লোকে এইরূপই মনে করে। পৃথিবীর মহাজনদিগকে জগতের লোকে তাই পাগল ভাবিয়াছিল।

ইহাদের জীবনে যাহা দেখিয়াছিল, তাহাকে অলৌকিক বোধ করিয়াছিল।

তাঁহাদের জীবনে কি কি বিশেষত্ব দেখা গিয়াছিল?

প্রথম, অতি দুঃখ। এই লক্ষণ দেখিয়া ইহাদিগকে লোকে দুঃখী বলিয়াছে। যীশুর নাম ছিল "Man of Sorrows"— তাঁহাকে হাসিতে কেহ কখনও দেখে নাই। বরং কাঁদিতে দেখিয়াছে। বাইবেল গ্রন্থে তাঁহার হাসির বর্ণনা নাই, তিনি চিরবিষণ্ণ। মহম্মদ এত বিষণ্ণ ছিলেন যে, আত্মহত্যা করিবার জন্য পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন। বিষয়ী লোকে ভাবে, কেন এত কান্না? কেন এত অতিমাত্রায় দুঃখ? দুঃখের কারণ খুঁজিয়া পায় না। দুঃখ কি? শরীর বেশ সুস্থ সবল, পরিবার পরিজন সকলি বর্তমান, তবু কেন 'হায় হায়' গেল না, কেন ইহারা কাঁদে? এ দুঃখের কারণ বিষয়ী খুঁজিয়া পায় না।

এই দুঃখের ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের দুঃখ নিজের জন্য নয়, পাপীর জন্য, পৃথিবীর পাপের জন্য। কিন্তু আমরা সকলেই ত ইহা দেখিতেছি। ব্যথা কি কেবল তাঁহাদেরই লাগিল? আমাদের ত ক্লেশ হয় না। কার বাণে কাকে বিঁধে? যে ভালবাসে, সেই ব্যথা অনুভব করিতে পারে। এই সংসারে আমরা দেখিতে পাই যে, কত সন্তান পাপে নিমগ্ন হইয়া উল্লাসে দিন কাটাইতেছে, উঠিবার চেষ্টা করে না, একটু ভাবিয়া দেখে না, আপনাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করে না, বিদেশে আনন্দে সর্বদা মত্ত। তাহাদের পাপের বাণ কত স্ত্রীলোককে বিদ্ধ করিতেছে। প্রেমের ধর্মই এই। মা পাষণ্ড সন্তানকে ভালবাসেন, তাহার পাপের জন্য ছটফট করিয়া মরেন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, "হে ভগবান্, এর কি পরিত্রাণ হইবে না?" খ্রীষ্টীয় সাধু অগস্টাইনের জীবনে পড়িয়াছি যে, সাধ্বী

মাতা মণিকা দেবী প্রতি রবিবার উপাসনা হইয়া গেলে আচার্যকে বলিতেন, "আমার পুত্রের জন্য প্রার্থনা করুন।" তখন তাঁহার দু-নয়ন বহিয়া পুত্র অগস্টাইনের জন্য জলধারা পড়িত। এইরূপ প্রতিদিন প্রার্থনা করিয়া বিরক্ত হইয়া একদিন আচার্য বলিলেন, "Go thy way, woman, a child of so many tears cannot perish." এই যে জননীর দুঃখ শোক ক্ষোভ, এই সকলের মূলে মাতৃস্নেহ। বিষয়ী এই দুঃখের কারণ খুঁজিয়া পায় না। রাজসিংহাসন পড়িয়া রহিল, আর শাক্যসিংহ কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাস্তায় বেড়াইলেন— রোগ জরা মৃত্যু হইতে কিরূপে জীবকে উদ্ধার করা যায়। এই অতিমাত্র দুঃখ দেখিয়াই মহাজনদিগকে লোকে পাগল বলিয়াছে।

দ্বিতীয়, অতি আশা। দুঃখটাকে যেরূপ লোকে অকারণ মনে করিয়াছে, এই আশাটাকেও সেইরূপ অকারণ মনে করিয়াছে। মানবে দুষ্কৃতি, সংসারাসক্তি, পাপাসক্তিই প্রবল। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ইহাই মানবমনে প্রবল, আশাজনক কোথাও কিছু নাই। কেমন করিয়া আশা করিবে? বিষয়ী লোক আশা দেখিতে পারে না, মানব-সমাজে বরং নিরাশাই প্রচার করে। মানব কেবল দুর্গতি কি গভীরতর দুর্গতিতে নিমগ্ন হয়। সত্যযুগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কলিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। আশার কিছুই দেখিতে পায় না। বর্তমানে আমাদিগের ভিতর নিরাশার ছায়া। প্রাচীনের ত কথাই নাই। তাঁহারা বলেন, "এরূপ ঢের দেখেছি, আমরাও একবার নেচেছি. কত কি করিব ভেবেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। এই দেশের মাটি চাঁচিয়া ফেলিয়া জল সেচন করিয়া যদি নূতন করিতে পার তাহা হইলে হইবে।" পক্ককেশ বৃদ্ধেরা এইরূপ বলেন। আবার যুবাপুরুষেরাও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, "কিছুতে কিছু হইবে না, বৃথা চেষ্টা-

প্রয়াস, শক্তির অপচয় মাত্র। যে কয়দিন বাঁচ, খাও দাও ঘুমাও, এই ভাবে চলিয়া যাও।"

আমাদের দেশের অবস্থার ন্যায় সর্বত্র এবং সকল জাতিতে নিরাশার অবস্থা, কিন্তু তবুও তাঁহাদের আশা আছে। "অনুতাপ কর, হৃদয় পরিবর্তন কর, স্বর্গরাজ্য আসিবে।" যখন জুডিয়া ঘোর অত্যাচারে নিমগ্ন, দুঃখভারে অবসন্ন, তখন জন উঠিয়া বলিলেন, "অনুতাপ কর, হৃদয় পরিবর্তন কর, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে।" কোথায় স্বর্গরাজ্য আসিতেছে? যখন সমগ্র বঙ্গদেশ কুসংস্কারে নিমগ্ন, নদীর স্রোতের ন্যায় পাপ-স্রোত সতেজে বহিতেছিল, পাপাচারে বঙ্গদেশ নিমগ্ন, ভারত পরাধীন, অবসন্ন, তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বলিলেন, "তোমরা উঠ, প্রস্তুত হও, ঈশ্বরের রাজ্য আসিতেছে।" তবু লোকে বলে, "কই, স্বর্গরাজ্য কই?" লোকে আশার কারণ দেখে না। কিন্তু মহাজনেরা বলেন, "আশা কর।" এই যে স্বর্গরাজ্য, ইহা বিষয়ী লোকে ধরিতে চায়, কিছুই ধরিতে পারে না। জগতের লোক, বিষয়ী লোক স্বর্গরাজ্য দেখিতে পায় না। উজ্জ্বল বিশ্বাসী লোকেরা স্বর্গরাজ্য দেখিতে পান এবং এখানেই তাঁহাদের বিশেষত্ব। লোকে চারিদিকে চাহিয়া বলে, "কোথায় স্বর্গরাজ্য?" যীশু বলিয়াছেন, "স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে খোঁজ।" বিষয়ী বলেন, "কোথায়?" নিরাকার সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় জিনিসকে যিনি এরূপ ভাবে দেখেন যে, তিনি ধ্যানে জ্ঞানে আছেন, তাঁর জন্য মাথা দেওয়াকে তিনি আর স্বার্থত্যাগ ভাবেন না। এইরূপ ভাবে দেখিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। লোক মনে করে যে, চক্ষু মুদ্রিত করিলে ধোঁয়া দেখা যায়, ও ত ধোঁয়া। না, বাস্তবিক ইহা ধোঁয়া নয়, ইহাতে প্রেমের সিংহাসন, ইহাতে ঈশ্বর। বিষয়ী ভাবেন, সমস্তই কল্পনা, কেবলই কল্পনা। কিন্তু মহাজনগণ বলেন যে, যদি

কিছু সত্য থাকে তবে ইহাই সত্য। ইহা নূতন বা অসম্ভব নয়, ইহা বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছে। জোর করিয়া বলিব, "যদি কিছু সত্য থাকে অতীন্দ্রিয় পদার্থই সত্য, অপর সব ছায়া।"

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।" সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় সবই সত্য। যাহা চক্ষুতে দেখা যায় না, হৃদয়ে থাকিয়া শাসন করে, তাহাই ধর্মজগৎকে শাসন করে। ইহাই সত্য। সাধুরা ইহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, উজ্জ্বল দীপালোকে সুস্পষ্ট বস্তুর ন্যায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" বিষ্ণু সর্বব্যাপী, জগতে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করেন। চক্ষু যেমন আকাশের বস্তুকে দেখে, সেইরূপ পণ্ডিতেরা তাঁহার পরম পদ দেখিয়াছেন। জগতের লোকে বলে, "ও-সব কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, পরের কথা শুনিও না।" সাধুগণ বলিয়াছেন, "ইহাই সত্য, ইহাতেই বিশ্বাস কর।" এই জন্য জগতের লোকে তাঁহাদিগকে পাগল বলিয়াছিল।

তৃতীয়, অতি সাহস। তাঁহাদের সাহস অতিশয় ছিল। তাঁহারা এই অব্যক্ত সত্তাকে এবং স্বর্গরাজ্যকে এরূপ সত্য জ্ঞান করিয়াছিলেন যে, ইহার জন্য তাঁহারা দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিতে সাহসী হইয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতে হইবে। জীবন পণ করিয়া শিষ্যদের সহিত এই ভাবে যখন মহাপুরুষেরা অগ্রসর হইয়াছেন, তখন পৃথিবীর লোকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে। তাঁহারা তাহাদিগের দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এই সব কথা যখন মনে করি, তখন বর্তমান যুদ্ধের কথা মনে হয়। গোলাগুলি চার্জ করা সবই যখন বিফল হইল, তখন bayonet সঙ্গীনের দ্বারা চার্জ করিতে হইবে। এইরূপে জগতের মহাজনেরা বেয়নেট চার্জ করিয়াছেন।

কতজনকে মারিয়া ফেলিল, দগ্ধ করিয়া ফেলিল, তথাপি তাঁহাদের কি সাহস! এইজন্যই মহাজনদিগকে লোকে পাগল বলিয়াছে। যেমন আমেরিকার দাসত্ব-প্রথা উন্মোচন করিতে জন ব্রাউন্‌স্‌-এর আর বিলম্ব সহ্য হইল না, তাহার জন্য প্রাণ দিলেন, সেইরূপ সাধুরা ক্ষতিলাভ-গণনা-শূন্য হৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কারণেই লোকে তাঁহাদিগকে পাগল বলিয়াছিল। কিন্তু এই যে আশ্চর্য সাহস, ইহার মূলে কি? ঐ আশা হইতেই সাহস। যেরূপ ঈশ্বরের দয়াতে আশা, সেরূপ মানুষের প্রেমে। কারণ যাঁহারা স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, স্বর্গরাজ্য মানুষের মধ্যে। যাহাকে তুমি ঘৃণা কর, তাহার ভিতরেই স্বর্গরাজ্য।

ঈশ্বরের করুণা জয়ী হইবে, এই কথা যে বলে, তাহার বিশেষ দায়িত্ব আছে। তুমি যে আশা কর জগতের কল্যাণ হইবে, তোমাকে সেই কল্যাণকর কার্যে দিবার জন্য তুমি দায়ী। তুমি যখন বল যে, এই উপায়ে উপকার হইবে, তখনই সেই উপায় অবলম্বন সম্বন্ধে তোমার একটা দায়িত্ব আসে।

তাঁহাদের এই আশার ভিত্তি কোথায়? প্রধান ভিত্তি এই যে, ধর্মশাসন সত্য এবং ঈশ্বর ধর্মের শাসক ও রক্ষক ইহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, যেমন ভৌতিক জগৎ ভৌতিক নিয়মে শাসিত, মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবে যেমন প্রত্যেক বস্তু অনিবার্য নিয়মে আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে পড়ে, সেইরূপ মানবাত্মা ধর্মশাসনে শাসিত, স্বয়ং ঈশ্বর মানবের ধর্মজীবন পোষণ করেন। ঈশ্বর-করুণায় তাঁহাদের আশা। ধর্ম জয়ী হইবে—আমাদের চেষ্টায় নহে, তাঁহার করুণায়। এজন্যই তাঁহাদের এত আশা। তিনি ধর্মের রক্ষক, ধর্মের প্রেরক এবং পোষণকর্তা। সাধুরা

দিব্যচক্ষে ইহা দেখিয়াছিলেন। সেই আশায় জীবন-মন ঢালিয়া আশা পূর্ণ করিবার জন্য জগতের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদিগের কার্য-প্রণালী আলোচনা করিয়া কি দেখিতে পাই না যে, মানবের জন্য তাঁহাদের কিরূপ ক্লেশ, ঈশ্বর-করুণাতে কিরূপ বিশ্বাস, সত্য ও ধর্মরাজ্যে কত বিশ্বাস, তাঁহাদের আশা ও সাহস কত?

আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র। জগতে দুঃখ ও পাপ কিরূপ প্রবল। ইহা হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য, জগদ্বাসীর আশা ও সাহস সঞ্চারের জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদিগের যুদ্ধের প্রয়োজন যথেষ্ট। তাঁহার নিকটে আশা পাব। যদি প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াও, পশ্চাতে আলো থাকিবে। কিন্তু পূর্ব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াও, সম্মুখে আলো পাইবে। সেইরূপ আজ উৎসবের দিনে পশ্চিমে পিঠ রাখিয়া পূর্ব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াও, তোমাদের জীবনের পাপ তাপ মলিনতা যে দিকে সে দিক পশ্চাতে রাখিয়া ব্রহ্মকৃপার দিকে চাও। তিনি ধর্মের প্রবর্তক ও সহায়। যুগে যুগে ধর্মকে তিনি রক্ষা ও বলশালী করিয়াছেন। ভগবদ্গীতায় আছে—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥

"যখন ধর্মের হানি হয়, অধর্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই।" ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই— "আমি আপনাকে পাপীর অন্তরে তাহার পাপনাশের জন্য সৃষ্টি করি।" রবির আলোক যেরূপ উত্তাপ সৃষ্টি করে, সেইরূপ তিনি পাপীর হৃদয়ে পুণ্য রূপে, অবিশ্বাসীর হৃদয়ে বিশ্বাস রূপে জন্মেন। বর্তমান যুগে সেইভাবে ঈশ্বর এ দেশে জন্মিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ রূপে আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

অবিশ্বাসী ইহা শুনিয়া বিদ্রূপ করে, কিন্তু জানিও নিশ্চয়

যে, স্বয়ং বিধাতা জাগেন, তোমরা অবশ্য জাগিবে। কেন এত নরনারী এখানে উপস্থিত? কে ইহাদের প্রাণে বিহার করিতেছেন? কে সকলের প্রাণে উঠিতেছেন? তিনি। অতএব আজ ব্রাহ্ম ভাইবোন, আশান্বিত হও, চক্ষের জল মুছ, সুবিমল ব্রহ্মকৃপা দর্শন কর। প্রেমময়ের প্রেম দর্শন কর, তাঁহার হস্তের স্পর্শ অনুভব কর, তাঁর পবিত্র আবির্ভাবে সমস্ত পূর্ণ দেখ। তাঁহার আহ্বান শ্রবণ কর। তাঁর নাম কীর্তন কর, আগামী-বর্ষের-কার্যে-আশাপূর্ণ হৃদয়ে নাম। তিনিই বল, তাঁর নাম ধন্য হউক, তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁর বিজয়-নিশান হস্তে লইয়া তাঁহার মঙ্গলময় রাজ্যে অবতীর্ণ হও, তাঁহার করুণা ধন্য হউক, তাঁহার করুণা হৃদয়েতে অনুভব কর।

১৩০৬

স্বতৎপরতা ও ব্রহ্মতৎপরতা

প্রাচীন কাল হইতে সাধুগণ ও ভক্তগণ ধর্মজগৎকে ভবনদীর পরপারে এক অত্যাশ্চর্য দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন উহা স্বর্গরাজ্য, কেহ বলিয়াছেন ঈশ্বরের সহর, কেহ বলিয়াছেন উহা ব্রহ্মলোক, কেহ বলিয়াছেন আনন্দধাম। কথাটা একই। সংসারে আমরা সচরাচর যে অবস্থাতে বাস করি তাহা হইতে ধর্মজীবনের অবস্থা এত বিভিন্ন যেন তাহা আর-এক দেশ।

কোন্ কোন্ বিষয়ে ধর্মজীবনের অবস্থা সাংসারিক জীবনের অবস্থা হইতে বিভিন্ন তাহা একবার আলোচনা করা যাউক।

প্রথম প্রভেদ মূলে; সংসার-রাজ্যে স্বতৎপরতা, অধ্যাত্মরাজ্যে ব্রহ্মতৎপরতা। ইহা হইতে আর-এক প্রভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বতৎপরতার অর্থ, আপনাকে সকলের মধ্যে প্রধান রূপে দেখিয়া আপনা হইতে সকল বিচার আরম্ভ করা। ব্রহ্মতৎপরতার অর্থ, ব্রহ্মকে সকলের মধ্যে প্রধান রূপে রাখিয়া তাহা হইতে সকল বিচার আরম্ভ করা।

একে একে কয়েকটি প্রভেদের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

স্বতৎপর বিচারে মানুষ প্রধান রূপে দেখে আপনার প্রাপ্য অধিকার বা Rights। ব্রহ্মতৎপরতার বিচারে দেখে আপনার কর্তব্য কার্য, আপনার Duties। সুতরাং "আমাকে কিছু পাইতে হইবে, আমাকে কিছু লইতে হইবে, আমার প্রাপ্য অধিকারের সীমা কতদূর" এই সকল বুদ্ধি সংসার-রাজ্যে প্রবল। প্রকৃত ধর্মরাজ্যে আর-এক প্রকার বুদ্ধি প্রবল, "আমাকে কিছু দিতে হইবে, আমাকে কিছু করিতে হইবে, আমার করণীয় বিষয়ের সীমা কোথায়" ইত্যাদি। ধর্মরাজ্যে প্রেমই চালক এবং আত্মসমর্পণই প্রধান ভাব, সুতরাং সেখানে পাইবার চিন্তা অপেক্ষা দিবার চিন্তাই অধিক।

দ্বিতীয় প্রভেদ, সংসার-রাজ্যে উৎকট ব্যক্তিত্বজ্ঞান, চতুর্দিকের লোকের সহিত কোন্ বিষয়ে কি প্রভেদ আছে, সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি; "ওরা এটা মানে আমি এটা মানি না, ওরা এটা করে আমি এটা করি না, ওটা ওদের কাজ এটা আমাদের কাজ" এইরূপ অপরের সহিত নিজের স্বাতন্ত্র্যের একটা পরিষ্কার সীমা নির্দেশ করা। প্রকৃত ধর্মজগতে ইহার বিপরীত ভাব; যাহা কিছু প্রকৃত ভাল কাজ তাহা ঈশ্বরের কাজ, সুতরাং আমারও কাজ। ধর্মরাজ্যে প্রেম চালক। প্রেমের স্বভাব আত্ম-সমর্পণ ও আত্মবিলোপ; সুতরাং সে রাজ্যে মানুষ সকল ভাল কাজের সহিত ও অপরের সহিত এরূপ মিশিয়া যায় যে আপনাকে আর স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারে না, অপরের সহিত কোথায় কি প্রভেদ আছে এ বুদ্ধি প্রবল না হইয়া অপরের সহিত কোথায় কি মিলন আছে সেই বুদ্ধিই প্রবল হয়।

তৃতীয়, স্বতৎপর বুদ্ধির আর-এক লক্ষণ যে, তাহা আপনাকে দিয়া অপরকে বিচার করে, সুতরাং অপরের গুণ অপেক্ষা দোষ-ভাগই অধিক দেখিতে পায়। সর্বদা ভাবে, "ওরা যেমন আমি ত তেমন নই, ওরা যেরূপ করে আমি সেরূপ করি না।" ভিতরে এই ভাব থাকে, "ওরা নিকৃষ্ট আমি উৎকৃষ্ট।" আপনাকে উৎকৃষ্ট ভাবিতে পারিলে মানুষের মনে স্বভাবত একপ্রকার সুখ হয়। কিন্তু এ জগতে প্রকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়া সে সুখের অংশী হওয়া বড় কঠিন। তদপেক্ষা একটি সহজসাধ্য পথ এই আছে যে, অপরকে হীন করিয়া আপনাকে বড় দেখা। এই ভাব যখন হৃদয়ে প্রবল হয়, তখন ধর্মকর্ম সেখান হইতে অন্তর্ধান করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব হইয়া যায়, তখন মানুষ অপরকে লোকচক্ষে হীন দেখিয়া সুখী হয়— অপরের সুখ্যাতি অপেক্ষা অখ্যাতি শুনিতে ভালবাসে, অপরের দোষ-কীর্তনে একপ্রকার উৎসাহ অনুভব

করে, অপরের সমালোচনাতে বড়ই সুখ পায়। এরূপ মানুষ নামে ও দেখিতে ধর্মজগতে থাকিলেও ধর্মজগতে নাই, সংসার-রাজ্যেই রহিয়াছে।

চতুর্থ, সংসার-রাজ্যে যে একেবারে ধর্ম নাই তাহা নহে; তাহাতে ধর্ম আছে, উপাসনা আছে, প্রার্থনা আছে, কিন্তু সে প্রার্থনার মূলে এই ভাব থাকে, "হে ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক তোমার দ্বারা।" সেখানে মানুষ আপনার ইচ্ছারই চরিতার্থতা চাহিতেছে, ঈশ্বরকে কেবল তাহার সহায় করিয়া লইতে চাহিতেছে— নিজে ভাল হইতে চায়, লোকের প্রিয় হইতে চায়, লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে চায়— ঈশ্বর ভাল হইবার একটি সহায়, এই জন্যই তাঁহাকে ডাকিতেছে। প্রকৃত ধর্মরাজ্যের প্রার্থনা আর-এক প্রকার, তাহা বলে, "হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার দ্বারা।" "আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক তোমার দ্বারা" ও "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার দ্বারা" এই উভয়ে কত প্রভেদ তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

পূর্বোক্ত প্রভেদগুলির দ্বারা বিচার করিতে হইবে যে, আমরা মুখে ধর্ম ধর্ম, ঈশ্বর ঈশ্বর যতই করি-না কেন, প্রকৃত ধর্মজগতের প্রজা হইতে পারিয়াছি কি না— সাধুরা যে আশ্চর্য সহরের কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহার অধিবাসী হইতে পারিয়াছি কি না। "স্বর্গরাজ্য আসিয়াছে, স্বর্গরাজ্য আসিয়াছে" বলিয়া চিৎকার করিলে কি হইবে? আমাদের ভাব ও আচরণ যদি স্বর্গরাজ্যের অনুরূপ না হয়, লোকে সে কথায় কর্ণপাত করিবে কেন? ধর্মজগতে প্রবেশ না করিয়া ধর্মজগতে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া আত্মগরিমায় কাল কাটাইলে কি হইবে? ব্রাহ্মসমাজকে প্রকৃত ধর্মসমাজ করিবার জন্য সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই।

১৩০৭

ধর্মের সম্ভাবনীয়তা

প্রাচীন কৌলিক আচারের ধর্ম এবং জীবন্ত প্রেমের উন্নতিশীল ধর্ম এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ? চিন্তা করিলে আমার এক দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। কৌলিক আচারের ধর্ম যেন একটা musical box আর জীবন্ত প্রেমের ধর্ম যেন একখানি সুরবাঁধা বেহালা। musical box ও বেহালা এ দুয়েরই সুর আছে, উভয়ই সুরকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। একটা musical box বাজাইলেও সুর বাহির হয়, একটা বেহালা বাজাইলেও সুর বাহির হয়। কিন্তু একটু প্রভেদ আছে। musical box যখনই বাজাইবে, সেই এক সুর শুনিতে পাইবে। সকালে বাজাও, বিকালে বাজাও, দ্বিপ্রহরে বাজাও, সেই এক সুর। কিন্তু বেহালাটি বাজাইলে অসংখ্যপ্রকার সুর শুনিতে পাইবে। তাহাকে যখনই বাজাইবে, তখনই তাহাতে অসংখ্যপ্রকার সুরের সম্ভাবনীয়তা আছে। 'সম্ভাবনীয়তা' এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে। যেমন মানুষের হাতে পড়ে অথবা মানুষ যেমন ইচ্ছা করে, তেমনই সুর তাহার ভিতর হইতে বাহির করিতে পারে। দশ বৎসর যদি রাখিয়া দাও, নিত্য নূতন নূতন সুর শুনিতে পাইবে। কত প্রকার সুর তাহার ভিতর হইতে বাহির হইতে পারে, কেউ কি আমাকে তাহা বলিয়া দিতে পারেন ? তেমনই দুই ধর্মেতেই আধ্যাত্মিকতা আছে। প্রাচীন কৌলিক আচারের ধর্ম, তাহার মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা আছে। কিন্তু তার যে আধ্যাত্মিকতা তাহা একঘেয়ে। একই জিনিস আবহমান কাল হইতে এক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। একই আধ্যাত্মিকতা তার মধ্যে। কিন্তু জীবন্ত প্রেমের ধর্মে আধ্যাত্মিকতার সম্ভাবনীয়তা অসীম, অসংখ্য, অগণ্য। তাহার ভিতর হইতে কত

আধ্যাত্মিকতার ভাব উঠিতে পারে তাহা কি কেউ নির্ণয় করিতে পারে? এটা বড় আশ্চর্যের ব্যাপার।

অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষত জীবনের রাজ্যে এই এক আশ্চর্যের ব্যাপার দেখা যায়। ঐ যে বটবৃক্ষ, একটি বালকে মাটিতে যাহা পুঁতিয়া দেয়, তাহার সম্ভাবনীয়তার বিষয় একবার চিন্তা কর। ঐ বীজ হইতে কালে শাখাপ্রশাখাকাণ্ড-সমন্বিত প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। তাহার সম্ভাবনীয়তা ঐ বীজ -মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। ঘটনার যোগাযোগ হইলে, সমুচিত উপাদান-সকল সংগৃহীত হইলে, ঐ একটি সর্ষপসদৃশ বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ বাহির হইবে; তাহার সম্ভাবনীয়তা উহাতে রহিয়াছে। তেমনই মানবের ভ্রূণদেহ; মানবের মস্তিষ্ক, মানবের বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য সমুদয়ের সম্ভাবনীয়তা ঐ ভ্রূণদেহের মধ্যে আছে। যে শক্তি -প্রভাবে ঐ ভ্রূণদেহ কালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট জড়দেহে পরিণত হইবে, তাহার নাম জীবনী-শক্তি। জীবনী-শক্তি চালক হইয়া, ঘটক হইয়া, পোষক হইয়া উহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবে; উপাদান-সকল সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে জীবদেহ গঠন করিবে।

কিন্তু এই জীবনী-শক্তি কি, ইহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা আজ পর্যন্ত কোনও পণ্ডিতই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার স্বরূপ কি তাহা আজ পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। কেহ ইহাকে life বলিয়াছেন, কেহ ইহাকে vitality বলিয়াছেন, কেহ বা secret power বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে life বল, vitality বল, secret power বল, সে কেবল মানবের অজ্ঞতার যবনিকাকে ঘন হইতে ঘনতর করা মাত্র। সে কেবল আমাদের অজ্ঞতার প্রাচীর বিস্তৃত করা মাত্র। জীবনী-শক্তি যদি life হয়, তবে

life কি? এ প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত কেহই দিতে পারেন নাই।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, এই জীবনী-শক্তিই সব, ইহাই সমুদয়। ইহা হইতে মানবের পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, বর্তমান জগতের এই শ্রীবৃদ্ধি, সমুদয় উদ্‌ভূত হইয়াছে। এ-সকল জীবনী-শক্তির প্রকাশ মাত্র। ক্যাণ্ট, শঙ্কর, ডারউইন প্রভৃতির যে মহত্ত্ব, তাঁহাদের যে শক্তি, সে সমুদয় ইহা হইতে স্ফুরিত হইয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের যে অদ্ভুত প্রকাশ, তাহা এই জীবনী-শক্তি হইতে। ইহার সম্ভাবনীয়তা কত অধিক এবং ইহা হইতে ভবিষ্যতে জগতের কি পরিমাণ উন্নতি হইবে বা হইতে পারে, তাহা কি কেহ বলিয়া দিতে পারেন? ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এতটা সুখসভ্যতার বিস্তার হইতে পারে, মানব-সমাজের এতটা উন্নতি হইতে পারে, যার সঙ্গে তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর এই অত্যুন্নত সুখ ও সভ্যতা অতি সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে। মানব-জাতি যখন সর্বপ্রথমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন কি এই শতাব্দীর এই অভূতপূর্ব ব্যাপার-সকল কেউ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? আবার এই বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর এতটা উন্নতি হইতে পারে, যার সঙ্গে তুলনায় বর্তমানের এই সুখসভ্যতাকে অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে। এই সমুদয় ভাবী উন্নতি, জগতের এই ভাবী বিকাশ জীবনী-শক্তির প্রকাশ মাত্র।

কেবল জীবদেহ কেন? মানবীয় উন্নতির সর্ববিধ বিভাগে, মানবের চিন্তারাজ্য, ধর্মরাজ্য, রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বত্র জীবনী-শক্তির অত্যদ্ভুত কার্য ও ইহার আশ্চর্য সম্ভাবনীয়তা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহার সমকক্ষ বস্তু আর নাই। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে কি মহৎ ফল ফলিয়াছে, চিন্তা করিলে

অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ষ্টিফেন যখন সর্বপ্রথমে এই ধর্মের জন্য প্রাণ দেন তখন সমগ্র য়িহুদী জাতি তাঁর পার্থিব সম্পদ দেখিয়া হাস্য করিয়াছিল, তখন কেহ একবার কল্পনার চক্ষেও দেখে নাই যে, সেই দিন হইতে খ্রীষ্টধর্মের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইল। তখন সকলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল আর কতিপয় লোক ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতি ছুড়িয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। সে দিন কি কাহারও পক্ষে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভব ছিল, সে দিন কি কোনও চিন্তাশীলের পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব ছিল যে, আজ সূর্য অস্ত যাবে না কোটি কোটি কণ্ঠে 'যীশু' নাম উচ্চারিত না হইয়া? তখন কি কাহারও পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব ছিল যে, আজ কোটি কোটি লোক 'প্রভু প্রভু' বলিয়া যীশুর চরণে মস্তক অবনত করিবে? কখনই নয়। অথচ আমরা দেখিতেছি, যেমন বীজের ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে বৃক্ষের সমুদয় শক্তি নিহিত থাকে, যেমন সর্ষপসদৃশ একটি অতিক্ষুদ্র বীজকোষের মধ্যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের সমুদয় সম্ভাবনীয়তা নিহিত থাকে, তেমনই মহাত্মা যীশুর চরণাশ্রিত আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী -ভুক্ত সেই কয়েকটি লোকের ধর্মপ্রাণতার মধ্যেই খ্রীষ্টীয় জগতের শক্তি বা ইহার সম্ভাবনীয়তা নিহিত ছিল।

তাই আমার মনে হয়, জগতের ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ বটবৃক্ষের বীজের ন্যায় ধর্মের বীজ জগতে পুঁতিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সেই বীজ হইতে ধর্মসমাজ-সকল উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা কিন্তু তাহার শক্তির বিকাশ দেখিয়া যাইবার অবসর পান নাই। আমরা দেখিতে পাই, ধর্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কত শাস্ত্র, কত সংহিতা রহিয়াছে। ধর্ম-প্রবর্তক মহাজনগণ কিন্তু এ-সকলের কিছুই জানিতেন না। মহাত্মা যীশুর উক্তির মধ্যে এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে তিনি শিষ্যবর্গকে

সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবার উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, অথবা তিনি কোনও সংহিতাও রচনা করিয়া যান নাই, তিনি কোনও গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। কিন্তু তিনি ধর্মের ফুৎকার দিয়াছিলেন, তিনি ধর্মের উদ্দীপনা দিয়াছিলেন, তিনি ধর্মের impulse দিয়া গিয়াছিলেন। সংক্ষেপে বলিতে হয়, বটবৃক্ষের বীজের ন্যায় ধর্মভাবের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহাই জগতে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই জগতে বলশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত হইয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং জগৎকে গ্রাস করিয়াছে।

মহাপুরুষগণ এই কাজ করিয়াছেন, কেহ বা জ্ঞাতসারে ইহা করিয়াছেন, কেহ বা অজ্ঞাতসারে করিয়াছেন। মহাত্মা যীশুর উক্তি-সকল পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি তাঁর ধর্মের এই শক্তি বা ইহার এই সম্ভাবনীয়তা কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার ধর্ম সর্ষপের ন্যায়, যাহা ভবিষ্যতে প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া সমুদয় লোককে ছায়া প্রদান করিবে।" তিনি বলিয়াছেন, "আমার ধর্ম দম্বলের ন্যায়, এক কলসি দুগ্ধে এক বিন্দু দম্বল দিয়া রাখিলে যেমন দেখা যায় সমুদয় দুগ্ধ দধি হইয়া গিয়াছে, তেমনই এই ধর্ম, যাহা আমি দম্বলের ন্যায় জগতে রাখিয়া যাইতেছি, কালে ইহা মানবের ধর্মচিন্তাকে পরিবর্তন করিয়া দিবে; ইহা মানব-হৃদয়ের ধর্মভাবকে জাগ্রত করিবে।" তিনি আপনার কাজের স্বরূপ, আপনার কার্যের প্রভাব এবং তাহার আশ্চর্য সম্ভাবনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁর ধর্ম জগতে ধর্মজীবন উৎপন্ন করিবে, জগতের ধর্মচিন্তাকে পরিবর্তন করিবে, ইহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যে ভক্তিনদী, যে নব ভক্তিধারা প্রবাহিত হইয়াছে, ইহার কি কোনও সম্ভাবনীয়তা নাই? এই যে ধর্মভাব

জগতে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা মৃত নয়, ইহা musical box নয়। ইহা জীবন্ত ধর্মভাব, ইহা পৃথিবীর লোককে নবজীবন দিবে। পাপীরা এ ধর্ম প্রাণে রাখিয়া বাঁচিবে। জ্যান্ত, আধ্যাত্মিক ধর্ম, জগতের ধর্মচিন্তাতে ইহা পরিবর্তন আনয়ন করিবেই করিবে। নূতন নূতন ধর্মজীবন, নূতন নূতন ধর্মচিন্তা, নূতন নূতন ধর্মভাব, নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা ইহা হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। ইহার ভবিষ্যৎ কি আছে, ভবিষ্যতে ইহা জগতে কিরূপ বিপ্লব আনয়ন করিবে, কিরূপ পরিবর্তন ঘটাইবে, তাহা কি কেহ আমাকে বলিয়া দিতে পারেন ?

ইহাকে নব ভক্তিধারা বলিতেছি কি কারণে ? ইহা জগতে এমন কি করিয়াছে যেজন্য ইহা নব ভক্তিনদী বলিয়া পরিচিত হইবার উপযুক্ত ? ইহাতে নূতন জিনিস কি আছে ? ইহার নূতনত্ব কোথায় ? সকলেই জানেন, আমাদের দেশে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ নামে ধর্মের দুই মার্গ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞানমার্গাবলম্বি-গণ মনে করিয়াছেন যে, জগতের অন্তরালে যে অপরিসীম জ্ঞানক্রিয়া রহিয়াছে, যে জ্ঞানকৌশলে এই ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়াছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং তাঁহারা জ্ঞানেরই সাধক। জ্ঞানকে তাঁহারা সর্বস্ব জানিয়া তাহারই সাধনা করিয়াছেন। ভক্তিপথাবলম্বিগণ এ দেশে অবতার-বাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। অবতারবাদ হইতে সাকারবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ভক্তি সাকারবাদকে আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু এই উভয়ের যে মিলিত হওয়া আবশ্যক তাহা আমাদের প্রাচীন কালের সাধকগণ বিশেষ ভাবে অনুভব করেন নাই।

অবশ্য সময়ে সময়ে এমন সকল লোক অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এতদুভয়কে মিলাইবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন। ঠিক কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় গীতা ও ভাগবতের গ্রন্থকর্তাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞান ও ভক্তিকে একত্র মিলাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। গীতায় এক স্থলে আছে—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

আর-এক স্থলে আছে—

যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলনের চেষ্টা যে এ দেশে কিছু কিছু হইয়াছিল, তাহা এই দুইটি শ্লোকে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। এখানে বলা যাইতেছে যে, উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান যাহা, ভক্তি তাহাই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা জ্ঞানানুগত ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন।

যদিও এই উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাই, এমন সকল সাধক এ দেশে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা জ্ঞান এবং ভক্তি এই উভয়কে মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি এ কথা সত্য যে, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এতদুভয় দুইটি স্বতন্ত্র ধারা রূপে চিরদিন এ দেশে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। মহাত্মা শঙ্কর, তিনি ছিলেন জ্ঞানপথের সাধক; তাঁর যে দর্শন তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে স্থাপিত। সুতরাং সেই ভাবের সাধনই তিনি প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত রামানুজ প্রভৃতি সাকারবাদ বা অবতারবাদের প্রবর্তনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভক্তিকে তাঁহারা সাকারবাদের আশ্রয়ে আনিয়াছিলেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, আমাদের দেশের শাস্ত্রসকল পাঠ করিবার পর তাঁর মনে এই ভাব উদয় হইল যে, এই যে দ্বিভাব, এই যে দুই সাধন-পন্থা আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এতদুভয়কে মিলাইয়া বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এক নূতন

সাধন-প্রণালী বাহির করিতে হইবে। তিনি মায়াবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা করিয়া বা মায়া শব্দের এক নূতন অর্থ দিয়া এক ভাষ্য বাহির করেন। তিনি মায়া শব্দের যে অর্থ দিয়াছিলেন, সে অর্থ ঠিক নূতন নয়, কারণ তার পূর্বে এ দেশে প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যেও সেরূপ অর্থ দেখা গিয়াছিল, তথাপি তাহা অনেকটা নূতন। তিনি বলিয়াছেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" সগুণ ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে এই জগৎ উদ্‌ভূত হইয়াছে এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া চরাচর স্থিতি করিতেছে। তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই জীবের সদ্‌গতি। এই যে সাধনের ভাব, ইহাই প্রদর্শন করা রামমোহন রায়ের প্রধান চেষ্টা ছিল। এই যে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", তাঁহার ভাব মানব-মনে প্রস্ফুটিত করাই তাঁহার সর্বপ্রধান বাসনা ছিল। তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, "ব্রহ্মস্বরূপ এক অখণ্ড। তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রাণ। তিনিই এই বিশাল মানব-পরিবারের পিতামাতা। মানবের সেবাই তাঁর সেবা। ইহাই প্রকৃত ধর্ম। ইহা তোমরা প্রাণে অনুভব কর। ইহাকে তোমরা ভক্তির চক্ষে দর্শন কর। এই ভাব তোমরা আপনাপন হৃদয়ে অনুভব করিবার চেষ্টা কর। এই ভাব তোমরা জীবনে সাধন কর।" রামমোহন রায় এই পর্যন্ত বলিয়া গেলেন। তিনি কেবলমাত্র সংকেত করিয়া গেলেন, তিনি কেবলমাত্র ইঙ্গিতে ধর্মের এই মহা আদর্শ জগতকে দেখাইয়া গেলেন। অবশিষ্ট কাজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্য রহিল।

রামমোহন রায় যাহা করিতে বাকি রাখিয়া গেলেন, মহর্ষি তাঁর অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রতিভা -বলে তাহা করিতে সমর্থ হইলেন। রামমোহন রায় যাহার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিলেন, রামমোহন রায় যাহা কেবলমাত্র দেখাইয়া গিয়াছিলেন, মহর্ষি তাহা কার্যে পরিণত করিলেন। তিনি বহুকালব্যাপী অনুসন্ধানের পর এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হইলেন

যে, এই যে নবালোক, এই যে মহা ভাব, যাহা রামমোহন রায় দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে হইবে, এবং তদ্দ্বারা মানবের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসকল সাধন করিতে হইবে। উপনিষদের যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান, যাহা কতিপয় দার্শনিকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, যাহা কেবলমাত্র জ্ঞানীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহাকে সেখান হইতে তুলিয়া মানবের সর্ববিধ আধ্যাত্মিক অভাব মোচন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গৃহে, পরিবারে, জনসমাজে সর্বত্র তিনি এই ব্রহ্মজ্ঞানকে স্থাপন করিবার বাসনা করিলেন। এইটুকু তাঁর মৌলিকত্ব।

তৎপরে আসিলেন স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা -বলে ইহাতে আরও কিছু যোগ করিয়া দিলেন। যে ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের প্রাচীন আর্য ঋষিগণের মধ্যে ফুটিয়াছিল, যাহা গভীরতাতে ও উচ্চতাতে পৃথিবীর আদর্শ রূপে রহিয়াছে— এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বিষয়ে আমাদের কাছে পৃথিবীর সকল জাতি হীন— ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমুদয় জাতিকে ভারতীয় ঋষিদের চরণে বসিয়া এ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে এই জ্ঞান ফুটিয়াছিল। রামমোহন রায় অলৌকিক প্রতিভা -বলে ইহাকে সাকারবাদ, অবতার-বাদ প্রভৃতি গণ্ডী হইতে উদ্ধার করিয়া, উদার বিশ্বজনীন সার্বভৌমিক ভিত্তির উপরে স্থাপন করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরণে বসিয়া আমরা ইহাকে হিন্দু ভাবে পাইয়াছি। কিন্তু স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ইহাতে পাশ্চাত্য জগতের ভক্তির ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি সাধারণের উপযোগী কতকগুলি ভাব ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, যেমন, অনুতাপ, প্রার্থনা, পরসেবা ইত্যাদি। এইগুলি খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রধান ভাব। ব্রাহ্মধর্মেরও এইগুলি প্রধান ভাব। কেশবচন্দ্র বলিলেন, "বিবেকে ঈশ্বরের বাণী

শ্রবণ কর এবং সেই বাণীর অধীন হইয়া কাজ কর।" পাশ্চাত্য ধর্মের এই প্রধান ভাব আমরা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভিতর দিয়া পাইয়াছি। এ ভাব আমাদের এই ভারতবর্ষে ফুটে নাই, আমাদের এই আর্যজাতির মধ্যে এ ভাব প্রস্ফুটিত হয় নাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণ অনুদার সীমা হইতে উদ্ধার করিয়া উদার, সার্বভৌমিক, বিশ্বজনীন, সমগ্র জগতের উপযোগী এক সুবিস্তৃত ভিত্তির উপরে স্থাপন করিলেন। সেজন্য অন্তরের সমূহ কৃতজ্ঞতা আজ তাঁহাকে জানাইতেছি। তিনি পরকালে কোথায় আছেন জানি না। কিন্তু তিনি যেখানেই থাকুন, আজ তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার উপহার অর্পণ করিতেছি, তিনি তাহা গ্রহণ করুন। তাঁর প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল এই ধর্মকে সমগ্র জগতের উপযোগী করিয়া গঠন করা। তার অর্থ ইহা নয় যে, আমরা ভারতীয়, অভারতীয় হইয়া যাইব। এ কথার অভিপ্রায় এ নয় যে, ব্রাহ্ম হইতে গেলে যিনি ইংরাজ তিনি অ-ইংরাজ হইয়া যাইবেন। ইংরাজের ইংরাজত্ব ঘোচা চাই, ভারতীয়ের ভারতীয়ত্ব ঘোচা চাই, তবে এই সার্বভৌমিক ধর্মভাব গঠিত হইবে। না, না, কখনই নয়। বরং এই কথাই সত্য যে, এই সার্বভৌমিক ধর্মের আশ্রয়ে ভারতীয়ের ভারতীয়ত্ব আরও ফুটিবে, ইংরাজের ইংরাজত্ব আরও ফুটিবে। জাতীয়তাও রক্ষা পাইবে, অথচ এই সার্বভৌমিক ধর্মভাব গঠিত হইবে।

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের পরে আমরা আসিয়াছি। আমরা ইহাকে আরও উন্নত করিয়া তুলিব। আমার মনে হয়, এই ব্রাহ্মধর্ম যেন runner-এর ডাক। যেমন পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে রানারে ডাক লইয়া যায়। একজন লোক কাঁধে করিয়া খানিক দূর লইয়া গেল, সেখান হইতে আর-একজন লোক কাঁধে করিয়া আর খানিক দূর লইয়া গেল, সেখান হইতে আর-একজন লইয়া গেল। তেমনই ঐ দেখ, কত কাঁধ দিয়া

এই ব্রাহ্মধর্ম-রূপ ডাক চলিয়া আসিয়াছে। ঐ দেখ, রামমোহন রায় সর্বপ্রথমে ইহাকে কাঁধে করিয়াছিলেন। তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে কাঁধে করিয়া অনেক দূর আনিয়াছিলেন। মহর্ষির স্কন্ধ হইতে নামাইয়া কেশবচন্দ্র সেন ইহা কাঁধে করিয়া বহু দূর আনিয়াছিলেন। এখন আমাদের স্কন্ধে ইহা চাপিয়াছে। আরও কত লোকে ইহা কাঁধে লইয়া কৃতার্থ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ইহার সম্ভাবনীয়তা কত, ভবিষ্যতে ইহা কতদূর বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা কি কেহ বলিয়া দিতে পারেন?

খবরের কাগজের জল্পনা এবং খবরের কাগজের আলোচনায় যাহারা জীবনের অনুমান করে, তাহারা ইহাকে ছোট, সংকীর্ণ ভাবে দেখিতে পারে। কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহার জীবনী-শক্তি মহতী। ইহা ভবিষ্যৎ জগতে কি পরিবর্তন আনিবে, তাহা কেহ জানে না। সংবাদ-পত্রের উত্থানের সঙ্গে যাহাদের আশা উত্থিত হয়, এবং সংবাদপত্রের পতনের সঙ্গে যাহাদের আশারও পতন হয়, তাহারা ইহাকে ছোট ভাবিবেই। তাহারা বলিবে, "ঐ তোমরা গুটিকতক লোক টিম্‌টিম্ করছ, কেউ তোমাদের মানে না, তোমরা আবার জগতের ধর্মভাবকে বদলাইয়া দিবে কিরূপে?" স্থূলদর্শী লোকে ইহা বলিতে পারে। কিন্তু ইহার স্বরূপ কি, ইহার শক্তি কত, তাহা তাহারা জানে না। যেমন মনুষ্যজীবনের মহা সম্ভাবনীয়তা ক্ষুদ্র ভ্রূণদেহে লুক্কায়িত থাকে, যেমন বটবৃক্ষের মহা সম্ভাবনীয়তা ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকে, তেমনি এই ব্রাহ্মধর্মের মহা সম্ভাবনীয়তা বর্তমানের এই ক্ষুদ্র কোষে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহার জীবনী-শক্তি যাহা ফুটিবেই। ভবিষ্যতে ইহা বিকশিত হইবেই হইবে।

যীশুর ধর্ম জগতে যে মহা পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহা কি-জন্য? কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখি, গুটিকতক লোক, তাহাদের

অধিকাংশই নীচ-জাতীয়, এই রাখিয়া মহাত্মা যীশু মরিয়াছিলেন। বিশপ হবে কি না, পুরোহিত (•priest) থাকিবে কি না, তাঁর ধর্ম জগতে দাঁড়াইবে কি না, তৎসম্বন্ধে তিনি কোনও উপদেশই দেন নাই। কিন্তু উপদেশ দিয়াছিলেন, "Repent ye for the kingdom of Heaven is at hand"·— তোমরা অনুতপ্ত হও, তোমরা নিজ নিজ হৃদয়ে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ কর। তোমরা ঈশ্বরের হাতে আপনা-দিগকে সমর্পণ কর। তোমরা সমুচিত শক্তি দিয়া এই ধর্মকে ধর, তোমরা হৃদয় পরিবর্তন কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। এইরূপ দুই-চারিটি কথা মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন। কিন্তু ঐটুকুই সব। ঐটুকু প্রাণ, ঐটুকু বীজ, উহা হইতে সব ফুটিয়াছে। আজ তাঁর নামে যে কোটি কোটি প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়, তার শক্তি ওখানে।

তেমনই আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম, ইহা জগতে বেশি কথা বলে নাই। দুই-একটি কথা মাত্র বলিয়াছে। কিন্তু তাহাই সব। আমাদের একজন ব্রাহ্ম কবি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের প্রথম নগর-কীর্তনে গাহিয়াছিলেন—

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।

এটা একটা ছোট কথা, কিন্তু এটা মহাকথা, এর ভিতরে সব আছে। "যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি", যে অকপটে ঈশ্বরের চরণে পড়িতে পারিবে যে ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে পারিবে, সে পুরুষ হোক আর স্ত্রী হোক, ব্রাহ্মণ হোক আর চণ্ডাল হোক, জ্ঞানী হোক আর মূর্খ হোক, ঈশ্বরের চরণে সে স্থান পাইবেই পাইবে। ব্রাহ্মেরা জগতে বেশি কিছু বলেন নাই, অতি অল্প দুই-চারিটি কথা বলিয়াছেন, অনেকে হয়ত তাহাও ভাঙিয়া বলিতে পারে নাই। কিন্তু ঐ যে দুই-

চারিটি কথা, যাহা রামমোহন রায় বলিয়াছেন, কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, উহাই সব। উহাই ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। এই দুই-চারিটি কথা জগৎকে আশার বাণী শুনাইয়াছে, পৃথিবীতে নবজীবনের বার্তা প্রচার করিয়াছে।

অনেকে হয়ত আমাকে ধৃষ্ট মনে করিবেন। তাঁরা হয়ত বলিবেন, "দেখেছ কি দেমাক! দেখেছ কি অহংকার! দেখেছ কি-রকম আত্মশ্লাঘা! কর্নওআলিস স্ট্রীটের একটা বাড়িতে মস্ত একজন ব'সে বলছেন, তাঁরা যে দুটো-চারটে কথা বলেছেন, সেই কয়টি কথা নাকি জগতের আশা। পৃথিবীর লোককে নাকি তাই গ্রহণ করতে হবে।" কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, আমি বলিতেছি, আমাদের এই কয়টি কথার মধ্যে এমন এক মহা সম্ভাবনীয়তা রহিয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়া জগতে নবশক্তি আনয়ন করিবে। ইহা জগতের ভাবী ধর্মভাবের উৎস। বেহালার সুরের ন্যায় ভবিষ্যতে ইহা হইতে কত নূতন নূতন আধ্যাত্মিকতার সুর বাহির হইবে তাহা কেউ জানে না, কেউ বলিয়া দিতে পারে না।

আমি ইহাকে নদীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছি। ঐ যে গঙ্গা নদী, যেখানে উহার উৎপত্তি, তাহাকে গঙ্গোত্রী বল বা গোমুখী বল, সেখানে গিয়ে দেখ, গিরিপৃষ্ঠ হইতে এক সূক্ষ্ম জলধারা ঝির্‌ঝির্ করিয়া নামিতেছে, সেখানে উহার গভীরতা এতই অল্প যে, একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও অনায়াসে তাহা পার হইয়া যাইতে পারে। যুগের পর যুগ কাটিয়া গিয়াছে, কালে সরস্বতী, গণ্ডকী, চর্মোন্নতি প্রভৃতি নদী-সকল উহার সহিত মিশিয়া ঐ জলধারাকে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত করিয়াছে, উহার প্রসার ও গভীরতা বাড়াইয়া উহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। পুরাণে কথিত আছে, বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গা নদী পৃথিবীতে অবতীর্ণ

হইয়াছে; ভগীরথ কঠোর তপস্যার দ্বারা বিষ্ণুপদ হইতে এক ক্ষুদ্র জলধারা পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই জলধারা গঙ্গা নামে খ্যাত হইয়াছে। তেমনই আমরা বলিতে পারি, রামমোহন রায় কঠোর তপস্যার বলে ভগবানের চরণে হইতে এক ক্ষুদ্র ভক্তিনদী পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন, এখন চারিদিক হইতে ভক্তিনদী-সকল আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেছে। ঐ দেখ, কত দিক হইতে কত স্রোতস্বতী আসিয়া এই ভক্তিধারাতে মিশিয়া ইহাকে মহৎ ও উন্নত করিয়া তুলিতেছে। কাহাকেও ইহা বর্জন করে না।

বর্জন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা বর্জন তত করিতে চাই না, যত গ্রহণ করিতে চাই। এটা ছাড়িতে হবে, ওটা ছাড়িতে হবে, এ ভাব আমাদের নয়। আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী যেমন মনে করিত, "আমরা ইহা মানি না, আমরা উহা মানি না," আমাদের কিন্তু সে ভাবে এ ধর্মকে অবলম্বন করা উচিত নয়। বর্জন আমাদের প্রধান কাজ নয়, বরং এই কথাই ঠিক যে, গ্রহণ আমাদের প্রধান কাজ। বর্জন অপেক্ষা গ্রহণ আমাদের কাছে অধিক আদরণীয় হওয়া কর্তব্য। আমরা যেখানে, যে কোনও দেশে, যে কোনও সম্প্রদায়ে যা কিছু ভাল জিনিস পাইব, তাহা গ্রহণ করিব। মহাত্মা বুদ্ধের উক্তির মধ্যে যা কিছু ভাল জিনিস আছে, তাহা আমরা গ্রহণ করিব। চীন দেশের মহাত্মা কংফুচের যা কিছু ভাল কথা আছে, তা আমরা গ্রহণ করিব। প্রাচীন গ্রীস দেশে যে মহাত্মা সক্রেটিস জন্মিয়াছিলেন, তাঁর যা ভাল কথা, তাও আমরা গ্রহণ করিব। আমরা পেটুকের মত সমুদয় জগতের ভাল জিনিস আহার করিব। আমরা পৃথিবীর ধর্মভাবের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মিয়াছি, সকল সাধু-পুরুষ আমাদের পূর্বপুরুষ; আমরা তাঁহাদের সকলের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মিয়াছি। গ্রহণ আমাদের প্রধান কাজ।

যেমন বর্জন করা আমাদের তত উদ্দেশ্য নয় যত গ্রহণ করা, তেমনই আবার বিদ্বেষ আমাদের তত নয় যত প্রেম। অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের ভাব দেখি, প্রেমের নামে তাঁরা বিদ্বেষ ছড়ান। খ্রীষ্টান যিনি তাঁর যে নর-প্রীতি তার নাম ওরফে বিদ্বেষ। অপর ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর বিজাতীয় ঘৃণা। আমাদের প্রেমবাহু কিন্তু সকলের জন্যই বিস্তৃত। আমরা যেখানে যাহা কিছু সৎ পাইব, তাহার সহিত প্রেমে মিলিত হইব। যিনি যথার্থ মানব-হিতৈষী, তিনি যেখানেই থাকুন-না কেন, তাঁহার সহিত আমাদের মিলন। মিলন, মিলন ; প্রেম, প্রেম। ইহা ব্রাহ্মধর্মের আর-এক কাজ।

যেমন গ্রহণ আমাদের কাজ, যেমন মিলন আমাদের কাজ, তেমনই আবার গঠন আমাদের আর-এক কাজ। ভাঙা অপেক্ষা গড়া আমরা অধিক ভালবাসি। ভাঙা আমাদের তত কাজ নয়, যত গড়া। আমি জানি, অনেক ব্রাহ্ম আছেন, তাঁদের ভাব এই, "আমরা ভাঙিব।" এটা ভাঙ ওটা ভাঙ সেটা ভাঙ, এইরূপ ভাঙ-ভাঙ করিয়া তাঁদের মনে এক প্রকার উৎকট ভাঙার ভাব আইসে। ভাঙিতে তাঁরা অধিক ভাল-বাসেন। প্রবল, উৎকট ভাঙিবার ইচ্ছা। কিন্তু আমি আজ বলিতেছি, ভাঙাটা ব্রাহ্মের তেমন কাজ নয়, যেমন গড়া। গঠন আমাদের কাজ, ইহাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা মানুষের অন্তরে নরপ্রেম গঠন করিব, আমরা মানব-অন্তরে সাধু ভাব ও সাধু আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিব। আমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের সিংহাসন স্থাপন করিব। আমরা পরিবার গঠন করিব, জনসমাজ গঠন করিব। মানব-সমাজে ঈশ্বরের সিংহাসন স্থাপন করিব।

এই নব ভক্তিধারা, যাহা বিধাতার ইচ্ছায় প্রবাহিত হইয়াছে, ইহার মহা সম্ভাবনীয়তা আছে। পৃথিবীতে ইহার করিবার অনেক আছে। এখনও অনেকে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন না। ইহার প্রধান কাজ মানুষকে জীবন দেওয়া, পাপীর মুখ ফেরান।

ধর্মের সম্ভাবনীয়তা

অনেকে ব্রাহ্মধর্মকে কেবল মতের দিক দিয়া দেখেন। অনেকে ব্রাহ্মধর্মকে এইজন্য ভালবাসেন যে, ইহার মতগুলি বিচারসম্মত, ইহা জ্ঞানকে বর্ধিত করে ও তাহাকে চরিতার্থ করে। জ্ঞানের চরিতার্থতার প্রয়োজন আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্মকে কেবল এ ভাবে দেখিতে নাই। ধর্ম যে জ্ঞানকে চরিতার্থ করিবে না, তাহা আমি বলিতেছি না। ধর্ম যদি জ্ঞানকে চরিতার্থ করিতে না পারিল, তবে ধর্মের একটা মস্ত কাজ করা হইল না। প্রাচীন কালের ধর্ম-সকল বিজ্ঞান-বিরোধী ছিল বলিয়া বর্তমান জগতে আর সে-সকলের স্থান হইতেছে না। বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞান ও উন্নত বিচারের সঙ্গে যে ধর্মের যোগ নাই, সে ধর্ম পৃথিবীতে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। মানবের কল্পনা-প্রসূত মত ও বিশ্বাস এক্ষণে চলিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান-বিরোধী ধর্মমত আর টেঁকিতেছে না। পুরাকালে বলা হইয়াছে, হনুমান সূর্যকে বগলে পূরিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে, এই পৃথিবী সূর্য অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র, পৃথিবীবাসীর পক্ষে সূর্যকে ধারণ করা অসম্ভব ও হাস্যজনক কথা, এবং পৃথিবী লাখ লাখ বৎসর ধরিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানকে চরিতার্থ করা ও বিশুদ্ধ ধর্মমত-সকল গঠন করা ধর্মের এক প্রধান কাজ। কিন্তু যাঁহারা ধর্মকে কেবলমাত্র জ্ঞানের পরিপোষক বলিয়া জানেন, তাঁহারা ধর্মের প্রধান কাজ কি তাহা এখনও অনুভব করতে পারেন নাই। জ্ঞানকে চরিতার্থ করা অপেক্ষা হৃদয় পরিবর্তন করা ধর্মের অধিক কাজ। মানবের সাধু আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করা, আত্মার মুখ ফেরান, ইহাই ধর্মের প্রধান কাজ। পাপীকে পরিত্রাণ দেওয়া, মানুষকে বাঁচান ধর্মের প্রধান কাজ। ধর্ম যদি এ কাজ করিতে না পারে, তবে ধর্ম তার প্রধান কাজ করিতে পারিল না।

আমাদের কাছে বর্তমান সময়ে এই যে নবভাব আসিয়াছে, এই যে

নব আদর্শ ফুটিয়াছে, ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম বলিতে হয় বল, Theism বলিতে হয় বল, অথবা আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় বল। কাহারও যদি ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম বলিতে আপত্তি থাকে, তিনি বলিবেন না। নাম নিয়া মারামারি করিবার প্রয়োজন নাই। এই নবভাব, এই নবভক্তির আদর্শ মানব-সমাজে আসিয়াছে। পাপীকে উদ্ধার করিতেই হইবে, সংসার-তাপে তপ্ত যে ব্যক্তি তাহাকে সুশীতল ছায়া দেখাইতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মধর্মের আকাঙ্ক্ষা।

আমরা এ সংসারে কি চাই? এই দুঃখ শোক দুর্বলতা -পরিপূর্ণ পৃথিবীতে আমরা কি চাই? আমরা উন্নত জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে চাই না; আমরা শুধু মতের বিশুদ্ধতাকে তেমন প্রাধান্য দেই না; আমরা পৃথিবীতে বাঁচিতে চাই, আমরা সংসারে দাঁড়াইতে চাই। এই যে মানুষের প্রতিদিনের সুখদুঃখপূর্ণ জীবন; এই যে বাহিরের নানাপ্রকার কোলাহল; এই যে সংসারের পাপপ্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া আমরা মারা যাই; এই যে আমরা একবার আলো দেখি, একবার অন্ধকার দেখি; এই যে কখনও উঠি, কখনও পড়ি; এই যে সংসারের পথে চলিতে চলিতে আমরা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইয়া যাইতেছি—ওগো, এই মানুষকে কে পথ দেখায়? কে আমাদিগকে অমৃতধামে লইয়া যায়? ঋষিরা ঠিক প্রার্থনা করিয়াছেন, "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও।"

আমরা যে ক্ষুদ্র মানুষ, আমরা যে অহংকার করিয়া মারা যাই। কি হবে দেমাক করিলে? কি হবে অহংকার করিলে? আমরা যে আমাদের প্রতিদিনের কর্তব্য করিতে পারি না, আমরা যে আঁধার দেখে ফেলি, আমরা যে আলো চাই। আমরা যে পৃথিবীর বন্ধন হতে মুক্ত

হতে চাই। খোঁয়াড়ের গরুর মত আমরা যে এই পৃথিবীতে আবদ্ধ। ওগো, পৃথিবীতে কোথায় এমন কোন্ বন্ধু আছেন, যিনি আমাদের পায়ের শিকল খুলে দিতে পারেন? হায় হায়, ধর্ম যদি আমাদিগকে ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত করতে না পারল, তবে ধর্ম আর কি করল? ধর্ম যদি আমাদিগকে পাপতাপের ভিতর হতে তুলিতে না পারিল, তবে শুধু কেবল বিশুদ্ধ মতের ভাজা বালি খেয়ে কি হবে? তাতে ত পিপাসা যায় না। ওগো, তৃষ্ণায় যখন মানুষের ছাতি ফেটে যায়, তখন তাকে যা তা একটু জল দিলে সে যে খায়। পচা পুকুরের জল, অথবা নদ্দামার জল একটু দিলেও সে খেয়ে বাঁচে। এইজন্য বরং মানুষ উপধর্মকে আশ্রয় করে, একটা বিকৃত ধর্মকে গ্রহণ করে। পাপীরা পরিত্রাণ চায়। আজ বল "পাপীর পরিত্রাণ", আজ আর অন্য শব্দ নাই।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, "ব্রাহ্মেরা নিরাকারের উপাসনা করে, নিরাকার ঈশ্বরে কি কখনও মানুষকে পরিত্রাণ দিতে পারে? কি ক'রে পারবে? আছে কি নাই তাই বোঝা যায় না। চোখ বুজে ব্রাহ্মেরা কি দেখে? ও ত সব ধোঁয়া। এর জন্য আবার ভারী ভারী শব্দ ব্যবহার করা, ইহা আবার মানুষকে পাপ হতে উদ্ধার করিবে!" ওগো, নিরাকার ব্রহ্ম মিথ্যা নয়। নিরাকার আগে, তার পর সাকার। নিরাকার আছেন ব'লে আর সব আছে। তিনি আগে সত্য, তার পর আর যা কিছু সত্য। তিনি ছাড়া আর কোনও সত্যবস্তু নাই। বরং বল, তোমরা সব মিথ্যা, এ জগৎ মিথ্যা, এই যা কিছু দেখি সব মিথ্যা। আছেন সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষ, আছেন তিনি জগতের পরিত্রাতা হইয়া।

আমি ব্রাহ্ম হইয়াছিলাম এইজন্য। এইজন্য পিতামাতাকে কাঁদাইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম। ব্রাহ্ম আচার্যদের কাছ থেকে

এই কথা শুনেছিলাম, "যে চায় সে পায়।" তাঁরা আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি নিরাশায় অধোবদন হয়ে কেন থাক? তুমি নিরাশার অন্ধকারে হাতড়াইয়া কেন জীবন কাটাও? এস, এস, আমাদের কাছে এস। এই সত্যপুরুষের চরণ আশ্রয় কর, প্রাণে শান্তি পাবে।" মহর্ষির মুখ হতে এই কথা শুনেছিলাম, মনে করেছিলাম, "যাই তবে এই ঘাটে যাই, ব্রহ্ম-চরণ আশ্রয় করি গিয়ে।" এ জীবনে আর কাহাকেও জীবন দিতে ইচ্ছা করি নাই, আর কিছু এমন মূল্যবান্ মনে হয় নাই। এ জিনিসের জন্য ত ব্রাহ্মদের প্রাণ ব্যাকুল হয় নাই। আজ কিন্তু পরিত্রাণের দিন। আজ পরিত্রাণ নিয়ে ঘরে যেতে হবে। পরিত্রাণ আজ বড় মিষ্ট কথা। এই কথা আজ আমাদের। এই জিনিসের জন্য আজ আমরা আসিয়াছি। বল তবে, "জয় মঙ্গলময়, মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা ঈশ্বর।" দেখ পরিত্রাণ হয় কি না। এখান থেকে উঠে আজ কেউ যেও না। প্রতিজ্ঞা কর, "পরিত্রাণের বাণী না শুনিয়া আজ ঘরে ফিরিব না।" দেখ তবে পরিত্রাণ পেলে কি না। দাও মাটিতে কান, শোন তোমাদের জন্য আজ কোনও আশ্বাসবাণী আসিতেছে কি না।

১৩০৯

পরিত্রাতা ঈশ্বর

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা যাঁহারা পাঠ করেছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে, গীতার এক স্থানে এইরূপ বর্ণনা আছে যে একবার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই সৃষ্টিতে তিনি যে সহস্র দিকে সহস্র ভাবে কার্য করছেন, সহস্র দিকে সহস্র ভাবে তাঁর শক্তির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে— আদি নাই, অন্ত নাই— বহু দিকে বহু ভাবে তাঁর শক্তির মহিমা প্রকাশিত রয়েছে, লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড তাঁর সত্তাতে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে, সেই যে তাঁর বিশ্বরূপ, সেই যে তাঁর অনন্ত মূর্তি, আপনার সেই বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ একবার অর্জুনকে দেখালেন। অর্জুন তাহা দেখে একেবারে ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অবশেষে আর না পেরে নানা প্রকারে স্তুতিবন্দনা ক'রে বলতে লাগলেন, "আর পারি না, আর পারি না। এ রূপ আর আমি সহ্য করিতে পারি না। তুমি যা ছিলে তাই হও। তুমি আমার যে সখা ছিলে, তাই হও। তুমি তোমার সেই সখা-রূপ শীঘ্র ধারণ কর। এ বিরাট্‌ মূর্তি শীঘ্র পরিহার কর। এ রাজবেশ শীঘ্র উন্মোচন কর। তোমার সেই সখা-রূপ শীঘ্র ধারণ কর, শীঘ্র ধারণ কর। আমি তোমার এ রূপ আর সইতে পারছি না।"

অর্জুন বলিয়াছিলেন—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

অর্থ— তুমিই আদিদেব পুরাণ পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের অর্থাৎ এই সৃষ্টির পরম নিধান। হে অনন্তরূপ! তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই পূজনীয় এবং তুমি পরম ধাম। তোমার দ্বারাই এই সৃষ্টি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

তুমি বায়ু, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ, তোমাকে নমস্কার করি, সহস্র বার নমস্কার করি, বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতাবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

তোমার সম্মুখে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, তোমার দক্ষিণে নমস্কার, তোমার বামে নমস্কার, তোমার সর্বত্র নমস্কার। হে সর্বদেব, হে সর্বাত্মন্, তুমি অনন্তবীর্য, অমিতবিক্রম হইয়া তুমি চরাচর বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, তুমিই সকলের মূল।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥

তোমার এই মহিমান্বিত রূপ অজানা হেতু আমি প্রমাদবশত বা প্রণয়হেতু তোমাকে সখা মনে করিয়া 'হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তোমাকে কতবার সম্ভাষণ করিয়াছি।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

হে অচ্যুত, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনের কালে যখন তুমি একা থাকিতে অথবা যখন তুমি সখিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতে, অপ্রমেয় (অচিন্ত্যপ্রভাব), আমি সে-সকল সময়ে পরিহাসপূর্বক কতবার তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তজ্জন্য আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি।

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ॥

এই চরাচর বিশ্বসংসারের পিতা তুমি, তুমিই প্রভাব, পূজনীয়, গুরু হইতেও গুরুতর। ত্রিভুবনে তোমার সমান আর কেহ নাই।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥

হে ঈশ্বর, তুমি সকলের পূজনীয়, তোমার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আমি তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। হে দেব, পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, বন্ধু যেমন বন্ধুর অপরাধ সহ্য করে এবং অপর প্রিয় ব্যক্তি যেমন তাহার প্রিয় ব্যক্তির অপরাধ সহিয়া লয়, তেমনি তুমি আমার কৃত অপরাধসকল সহ্য করিয়া লও।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥

তোমার অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইতেছি, কিন্তু ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইতেছে। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হইয়া তোমার সেই দেবরূপ আমাকে দর্শন করাও।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥

আমি তোমাকে সেই পূর্বের ন্যায় কিরীটিগদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে বিশ্বমূর্তি, হে সহস্রবাহু, তুমি আমার সেই পূর্ব-পরিচিত চতুর্ভুজ আকারে আবির্ভূত হও।

এই যেমন গীতা হতে কিঞ্চিত উদ্ধৃত ক'রে দেখান হ'ল, এইবারে বাইবেল গ্রন্থ হতে সকলের সুবিদিত মহাত্মা যীশুর Parable of the Lost Sheep হতে কয়েক পংক্তি পাঠ করছি—

Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. And the Pharisees and

scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. And he spake this parable unto them, saying,

What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it? And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me; for I have found my sheep which was lost.

অর্থ— তৎপরে তাঁহার নিকটে পাপী তাপী ভারাক্রান্ত ব্যক্তিরা আসিয়া সমবেত হইল। পুরোহিতেরা ও ধর্মযাজকগণ বলিতে লাগিলেন, "এ ব্যক্তি পাপীদের গ্রহণ করে, তাহাদের সহিত মিলিত হয় ও তাহাদের সঙ্গে বসিয়া ভোজন করে।" তখন মহাত্মা যীশু এই আখ্যায়িকা তাহাদের নিকট বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও একশতটি মেষ থাকে এবং তন্মধ্য হইতে একটি যদি হারাইয়া যায়, তবে কি সে ব্যক্তি নিরানব্বইটি মেষকে পথে দাঁড় করাইয়া বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া সেই হারান মেষটিকে খুঁজিয়া বেড়ায় না? এবং যখন সেটিকে প্রাপ্ত হয়, তখন সে কি করে? সে ব্যক্তি আনন্দের সঙ্গে সেটিকে কাঁধে তুলিয়া লয়। যখন সে বাড়িতে ফিরিয়া আইসে তখন বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসী সকলকে ডাকিয়া বলে, 'তোমরা আনন্দ কর, আমি আমার হারান মেষ খুঁজিয়া পাইয়াছি।' "

এই কথা ব'লেই যীশু বলছেন—

I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

"আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, সেইরূপ নিরানব্বইজন অননুতপ্ত ব্যক্তিকে ফেলিয়া একটি অনুতপ্ত পাপীর জন্য স্বর্গে তেমনি আনন্দ প্রকাশ করা হইবে।"

আবার বলছেন—

Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house and seek diligently till she find it? And when she hath found it she calleth her friends and her neighbours together, saying, Rejoice with me; for I have found the piece which I had lost. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over the sinner that repenteth.

"অথবা মনে কর, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের দশটি টাকা ছিল। তাহার একটি যদি হারাইয়া যায়, তবে কি সে বাতি জ্বালিয়া সমস্ত ঘর ঝাড়ু দিয়া সেটিকে খুঁজিয়া বাহির করে না? এবং যখন সেটিকে পায়, তখন কি বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশী সকলকে ডাকিয়া বলে না, 'তোমরা আনন্দ কর, আমার হারান টাকাটি আমি পাইয়াছি'? তোমরা জানিও একজন অনুতপ্ত পাপীকে ফিরিয়া পাইলে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে তেমনি আনন্দ উত্থিত হয়।"

গীতাতে অর্জুনের মুখে গীতাকার যে কথা দিয়েছেন, এইরূপ কথা ও এইরূপ মনের ভাব এ জগতে অনেকবার উঠেছে। এরূপ কথা জগতে

অনেকবার শুনা গিয়েছে। এ জগতে অনেকবার এমন হয়েছে যে, ঈশ্বরের যে মহিমার ভাব, তাঁর যে গৌরবান্বিত ব্রহ্মভাব তাই শুধু দেখে সাধুরা সন্তুষ্ট হন নাই। অথবা মানব-সমাজে, মানবের কার্যকলাপে এবং এই সৃষ্টিতে তাঁর অস্তিত্ব মানিয়াই সাধুরা পরিতৃপ্ত হন নাই। প্রত্যেক অন্তরে, প্রত্যেক হৃদয়ে তাঁর শক্তির কার্য দেখবার জন্যে সাধুরা ব্যস্ত হয়েছেন। তত্ত্বজ্ঞানের দিক দিয়ে ঈশ্বরের যে প্রকাশ দেখা যায়, তার ভিতর দিয়ে তাঁর যে ভাব পাওয়া যায়, শুধু তাই পেয়ে সাধুদের মন পরিতৃপ্ত থাকে নাই ; মানবের কার্যে, মানবের ব্যবহারে, মানবের চরিত্রে তাঁর লীলা দেখবার জন্য তাঁরা ব্যস্ত হয়েছিলেন।

আমাদের দেশের যে বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদ তা ঈশ্বরকে মানব-হৃদয় হতে দূরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। তাঁর মহিমার যে অনন্তভাব তাই তাতে দেখা হয়েছে, তাঁর যে নির্গুণভাব, তাঁর যে ব্রহ্মভাব তাই তাঁরা ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছেন।

ঈশ্বরকে আজ পর্যন্ত দুই ভাবে দেখা হয়েছে— তাঁর ঈশ্বরভাব ও তাঁর ব্রহ্মভাব। এই সৃষ্টিতে তাঁর যে প্রকাশ, এখানে তাঁর যে অভিব্যক্তি, সে তাঁর একরকম অভিব্যক্তি। যেমন কাব্যে কবির অভিব্যক্তি। রামায়ণে বাল্মীকির অভিব্যক্তি, বাল্মীকি ফুটে 'রামায়ণ' হয়েছে। মিলটন ফুটে 'প্যারাডাইস লস্ট' হয়েছে। 'প্যারাডাইস লস্ট'-এ মিলটনের যেমন অভিব্যক্তি, তেমনি এক ভাবে বলা যায়, এই জগতে, এই সৃষ্টিতে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। কিংবা আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কোনও সুন্দর চিত্রে যেমন চিত্রকরের অভিব্যক্তি। একখানি সুন্দর চিত্র দেখে যেমন বলা যায় যে, তাতে যে সৌন্দর্য ঢালা হয়েছে সে সৌন্দর্য চিত্রকরের ; যে সৌন্দর্য চিত্রকরের মনের মধ্যে ছিল, তাই তুলি ধ'রে বাহিরে এনে তবে ঐ ছবিখানা হয়েছে ; এ যেমন সত্য, তেমনি

বলা যায়, এই সৃষ্টিতে যে জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি দেখা যায়, সৃষ্টিকর্তার মনের মধ্যে এ সকলই ছিল। তাঁর সেই জ্ঞান, সেই প্রেম ও সেই মঙ্গলভাব দিয়ে এ জগৎ রচিত হয়েছে। এই এক অর্থে জগৎকে তাঁর অভিব্যক্তি বলা যায়, অর্থাৎ যা কিছু তাঁর ভিতরে ছিল, তিনি সেই সব বাহিরে এনেছেন। এই এক অর্থ।

আর-এক অর্থে এ জগৎকে তাঁর অভিব্যক্তি বলা যেতে পারে। যেমন, জলকে বিশ্লেষণ ক'রে বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, জলকে যে কোনও আকারে দেখা যায়, সে সব জলের প্রকৃত স্বরূপ নয়। জলকে আমরা কখনও তরল বাষ্পাকারে দেখি, কখনও বা কঠিন বরফ রূপে দেখি, কিন্তু এ-সব যেমন জলের যথার্থ স্বরূপ নয়, জল স্বরূপত দুইটি গ্যাসের সংযোগ মাত্র, তেমনি বলা যায়, এই জগতে যা কিছু দেখছি, এর কিছুই সত্য নয়, একমাত্র সত্যবস্তু তিনি। আমরা সব আপেক্ষিক ভাবে সত্য। তিনি আছেন ব'লে আমরা আছি, তিনি সত্য হয়েছেন ব'লে আমরা সত্য হয়েছি।

তাঁর সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর ব্যাখ্যান পুস্তকে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, যেমন বক্তার সঙ্গে বাক্যের সম্বন্ধ। বাক্য আপনা হতে উৎপন্ন হয় না, আপনি স্থিতি করে না। বাক্য বক্তার সঙ্গে বাঁধা অথচ বক্তা বাক্য নহে। এই যে আমি কথা বলছি, এ কিছু আমি নই। আমি সেই বস্তু যা হতে এমন লক্ষ লক্ষ বাক্য উৎপন্ন হতে পারে। এই যে সকল বাক্য আমা হতে উত্থিত হয়ে অপরের কর্ণে গিয়ে প্রবেশ করছে এ সবই আমার, অথচ এর একটিও আমি নই। তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখা যায় এ সকলই তাঁ হতে, অথচ এর কিছুই তিনি নন। এ ব্রহ্মাণ্ডের সকলই তাঁতে, এর সকলই তাঁ হতে; তাঁকে ছেড়ে

এর কিছুই থাকতে পারে না। এ ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখ এ তাঁর সত্ত'র অতি ক্ষুদ্র প্রকাশ মাত্র। এ ব্রহ্মাণ্ড তিনি নন। তিনি সেই বস্তু যিনি এই সকলকে ধারণ ক'রে আছেন এবং যিনি ইচ্ছা করলে এমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিমেষের মধ্যে উৎপন্ন করতে পারেন। এ ব্রহ্মাণ্ড তাঁর শক্তির অতি ক্ষুদ্র প্রকাশ মাত্র। আমাদের সংগীতে আছে—

প্রকাশে ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মহিমার কণিকা।

তাঁর এই যে বিশ্বরূপ, তাঁর এই যে অনন্তমহিমান্বিত মহৎ রূপ, এই তাঁর আর-এক অভিব্যক্তি। আবার আরও গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, মূলে একই জ্ঞানবস্তু। এক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই এ জগতে নাই। তাঁর এই যে প্রভাবান্বিত ভাব, তার যতটুকু এই জগতে ও এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তা তাঁর কিছুই নয়, তা তিনি নন। এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখ, তিনি ইহা নন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, তিনি চরাচর বিশ্বের অতীত; সেদিক দিয়ে দেখলে তাঁর ব্রহ্মভাবই আমাদের মনে আসে। তাঁহার শুধু সত্তা মাত্র বোঝা যায়; 'আছেন' এই পর্যন্ত। স্বরূপ-লক্ষণ কি তা স্থির ক'রে বলা যায় না। 'নেতি নেতি' শব্দের দ্বারা আমাদের জ্ঞানীরা এর বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন।

আর-এক ভাবে তাঁর ঈশ্বর-ভাব আমাদের মনে আসতে পারে। সে হচ্ছে এই যে, এই জগতের কাছে, মানব-সমাজে, আমাদের আত্মাতে তিনি ব্যক্ত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু এও তাঁর মহিমান্বিত ভাব। বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত ঈশ্বরসত্তার যতখানি আমাদের জানতে দিয়েছে, সেও তাঁর মহিমার ভাব। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এমন তারা আছে যারা আলো-সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে ছুটছে— আলোকের গতি কি পরিমাণ তা অনেকেই জানেন, আলোকরেখা এক এক মুহূর্তে কত হাজার হাজার মাইল যায়— এইরূপ ক্ষিপ্রগতিতে সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে ছুটে ছুটে আজও

পর্যন্ত সে আলো ধরাধামবাসীদের কাছে এসে পৌঁছিতে পারে নাই। মনে কর তবে এ ব্রহ্মাণ্ড কিরূপ প্রকাণ্ড। আবার ভূতত্ত্ব ব'লে দিচ্ছে, এ পৃথিবীর জন্ম কবে হয়েছে তা কেহ জানে না। যেমন দেশ সম্বন্ধে বলেছি, তেমনি কাল সম্বন্ধেও বলা যায়। ভূতত্ত্ব প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে, হাজার হাজার লাখ লাখ বৎসর ধ'রে এই পৃথিবী বর্তমান আকারে এসেছে। লাখ বৎসরে অথবা হাজার বৎসরে কত দিন তা জগদ্‌বাসীর কল্পনায় আসে না, মানুষ তা মনে ধরতে পারে না। জগতের বাহিরের দিক দিয়ে যখন দেখি, তখনও দেখি, দেশের দিক দিয়ে যেমন বলেছি, কালের দিক দিয়েও বিচার করলে মানুষের মন ধরতে পারে না। এখানে গিয়েও দেখছি, ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান তা জানতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব জানতে গিয়েই আমাদের ধারণাশক্তি পরাস্ত হয়, ব্রহ্মাণ্ড-পতির কথা আমরা কি জানব? এই তাঁর নির্গুণ ভাব; এই তাঁর পরমমহিমান্বিত মহাভাব।

এ ভাবেও মানবাত্মা চরিতার্থ হয় নাই। মানবাত্মা জিজ্ঞাসা করেছে, তাঁকে আমাদের হৃদয়ের কাছে কি ক'রে পাওয়া যায়? মানব-হৃদয় ঈশ্বরকে এত মহৎ ভাবলে তাঁকে এ প্রকার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় নির্গুণ প্রভৃতি ভাবে দেখে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাতে মানব-হৃদয়ের প্রেম পরিতৃপ্ত হয় নাই। অতি প্রাচীন কাল হতেই ঈশ্বরের ব্রহ্মভাব মানবাত্মাতে এসেছিল, কিন্তু তাতে মানুষের মন সন্তুষ্ট হতে পারে নাই। মানুষের হৃদয় আরও কিছু চেয়েছিল। কেন ও কি ভাবে চেয়েছিল তা আমাদের একজন বক্তা প্রকাশ ক'রে বলবার চেষ্টা করেছেন। ঐ বিস্তৃত অনন্ত আকাশ, যা সৃষ্টিতে চিরদিনই আছে, তার সঙ্গে যখন মানবের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তখন মানুষ তাকে একেবারে পিতা ব'লে সম্বোধন করলে। বললে, "হে বরুণ, তুমি আমাদের পিতা। ওঁ পিতা

নোঽসি, পিতা নো বোধি। তোমার মহদ্‌ভাবে আমাদের প্রাণ সন্তুষ্ট হইতেছে না। হে বরুণ, তুমি আমাদের পিতা। পিতৃতম হি পিতৄণাম্‌, পিতাদিগের মধ্যে তুমিই আমাদের পরমপিতা। তুমি পিতা হয়ে, তুমি মাতা হয়ে, তুমি সখা হয়ে আমাদের ব্যাকুল প্রাণের কাছে উপস্থিত হও।"

বাস্তবিক এই ভাবে মানব-প্রাণ তাঁকে চেয়েছে, তদ্‌ভিন্ন মানবাত্মা সন্তুষ্ট হতে পারে নাই। প্রেমের স্বভাব এই যে, ইহা কাছে পাইতে চায়। প্রেম কাছে চায়, প্রেম আদানপ্রদান চায়, নতুবা প্রেম সন্তুষ্ট হয় না। তাই চিরদিন মানুষের মন ঈশ্বরকে প্রাণের কাছে চেয়েছে, তাঁকে এমন ভাবে দেখতে চেয়েছে, এমন ভাবে ধরতে চেয়েছে যা প্রাণে রাখা যায়, যার সঙ্গে আদানপ্রদান হয়। খুব গূঢ় ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই ভাব হতেই জগতে অবতারবাদ এসেছে। মানুষ অনুভব করেছে যে, তিনি তাঁর ঐশ্বর্যভাব উন্মোচন না করলে, তিনি তাঁর রাজভাব কিঞ্চিত খর্ব না করলে আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগ হয় না।

একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা পরিষ্কার ক'রে বুঝান যেতে পারে। একবার শোনা গেল, আমেরিকা হতে একজন লোক ইংলণ্ডে এসেছিলেন। মহাত্মা গ্ল্যাডস্টোনকে দেখবার জন্য সে ব্যক্তি কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিঞ্চিৎ পরে খবর হ'ল তাঁর উপরে যাবার জন্য। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে অট্টহাস্যের ধ্বনি তাঁর কানে এল। খানিকটা উঠে দেখেন, মহাত্মা গ্ল্যাডস্টোন হাত পা নীচু ক'রে দিয়ে ঘোড়ার আকার ধারণ ক'রে চারি পায়ে চলছেন। আর তাঁর পিঠের উপর ছোট একটি ছেলে চ'ড়ে মহা আনন্দে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, আর আধ-আধ স্বরে বলছে, "ঘোড়াটা কোনও কর্মের নয়।" ইংলণ্ডেশ্বরের Prime Minister মহাত্মা গ্ল্যাডস্টোন ঘোড়া হয়েছেন, আর ঐ শিশু

তাঁর সোয়ার হয়ে ঐরকম বলছে, তাই শুনে ঘরের যত লোক সব একেবারে হিহি ক'রে হাসছে।

এইখানে যেমন দেখছেন, ঐ ক্ষুদ্র শিশুর জন্য মহাত্মা গ্ল্যাডস্টোনকে ঘোড়া হতে হয়েছে, ছোট হতে হয়েছে, তেমনি যাঁরা অবতার মানেন তাঁদের অবতারবাদের ভিতরকার কথা এই যে, সেই সময়ের জন্য মহাত্মা গ্ল্যাডস্টোন তাঁর Prime Ministry-র পোষাক খুলেছেন। যিনি বাটলার-এর Analogy-র উপরে বই লিখেছেন, যিনি হোমার-এর কবিতার উপরে মন্তব্য প্রকাশ ক'রে বই লিখেছেন, যাঁর উপরে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধানের ভার, সেই সময়ের জন্য তিনি সে-সকল কথা ভুলে গিয়েছেন। সকল বেশ খুলে রেখে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়েছেন যেখানে সেই ছেলের সঙ্গে তাঁর ভাবের বিনিময় হতে পারে, যেখানে তাঁতে আর সেই ছেলেতে এক হয়ে যেতে পারে। তখন যদি তিনি হোমারের লেখক হয়ে বসতেন কিংবা যদি ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার সেজে থাকতেন, তা হলে আর শিশুর সঙ্গে তাঁর যোগ হ'ত না। শিশুর সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে তাঁকে খানিকটা নেমে আসতে হয়েছে, নেমে এসে এমন একটি জায়গায় দাঁড়াতে হয়েছে যেখানে তার ছোট প্রাণের ভালবাসার সঙ্গে ওঁর বড় প্রাণের ভালবাসা মিলতে পেরেছে। তেমনি মানুষ কতবার এই জগতে বলেছে, "হে মুক্তিদাতা পরিত্রাতা ঈশ্বর, তুমি যদি তোমার অনন্ত মহান্ বিশ্বরূপ কিঞ্চিৎ সংবরণ না কর, তুমি যদি তোমার রাজবেশ উন্মোচন না কর, তবে আমি পাপী, আমার ত আর পরিত্রাণ হয় না! তুমি যদি রক্তমাংসের আকার ধারণ ক'রে আমার কাছে এসে উপস্থিত না হও, তবে ত আমার আর উদ্ধার নাই।" গ্ল্যাডস্টোন যদি তখন ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিস্টারই থাকতেন, চার পায়ের উপর ভর ক'রে ঘোড়া সেজে যদি তার কাছে

উপস্থিত না হতেন, তবে তার সঙ্গে তাঁর যোগ হ'ত কি ক'রে? তেমনি ঈশ্বর যদি শুধু মহিমাময় হয়েই থাকতেন তবে আর আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগ হতে পারে কি ক'রে?

এই কারণে দেখা যায়, এ দেশের ভক্তিপথাবলম্বিগণ সকলেই অবতার মেনেছেন। কেন মেনেছেন? এরই জন্যে মেনেছেন যে, তাঁরা মনে করেছেন ঈশ্বর আপনি রক্তমাংসের আকার ধারণ না করলে আমাদের রক্তমাংসের হীনতা বুঝি আর কাটে না। আমাদের পাপ তাপ থেকে ওঠবার আর বুঝি কোনও উপায় হয় না। তাই তাঁরা মনে করেছেন যে, তাঁর রক্তমাংসের আকার ধারণ ক'রে আমাদের কাছে নেমে আসা প্রয়োজন, নইলে মানব-হৃদয়ের শক্তিতে কুলায় না। মানব-হৃদয়ের তাঁর নিমিত্ত এই যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা, ইহা আব কোনও প্রকারে শান্ত হয় না। তাই মানুষ তাঁকে এমন ভাবে চেয়েছে যাতে প্রাণে তাঁর স্পর্শ পাওয়া যায়, যাতে তাঁর কথা শুনে চলতে পারা যায়। সেই সময় সেই সর্বশক্তিমান্ পরব্রহ্মকে যেন ঘোড়া হতে হয়েছে, তাঁকে যেন ছোট হয়ে নেমে আসতে হয়েছে। এর থেকেই অবতারবাদের উৎপত্তি হয়েছে।

আমরা কিন্তু অবতারবাদ মানতে পারি না। কেন পারি না, তাও একটু বলা প্রয়োজন। এইজন্য পারি না যে, অবতারবাদ যে যে অভাব পূরণ করতে চেয়েছিল, সে অভাব পূরণ করতে পারলে না। মানব-হৃদয়ের যে ব্যাকুলতা হতে অবতারবাদ মানুষ মেনেছিল, সে অভাব সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ হ'ল না। কেন হ'ল না? তার একটা দৃষ্টান্ত, যা আমি অনেকবার এই বেদী হতে দিয়েছি, আজ আবার সেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

মনে কর, আমি বললাম, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুরের পশুশালায় শ্বেত

ভল্লুক এসেছিল। তার রং এই রকম, তা দেখতে এই রকম ইত্যাদি। এই বললে অথবা এই জানলে কি কারও শুক্ল ভল্লুক দেখা হ'ল? তেমনি যদি বলি, ২০০০ বছর পূর্বে জুডিয়া দেশে পাপীদের উদ্ধারের জন্য জগতের প্রভু একবার পৃথিবীতে নেমেছিলেন এবং সেখানে তাঁর লীলা দেখিয়েছিলেন, এ কথা জানলেই কি আমাদের প্রাণ সন্তুষ্ট হয়? তিনি জুডিয়ায় নেমেছিলেন, তাতে আমাদের কি? জুডিয়ায় তখন পাপী ছিল, আর এখন কি জগতে পাপী নাই? আমরা কি পাপী নই? তিনি জুডিয়ায় নেমেছিলেন তা শুনে যে আমাদের প্রাণের ব্যাকুলতার শান্তি হয় না। আলিপুরের পশুশালায় একবার শুক্ল ভল্লুক এসেছিল তা শুনে যেমন আমার শুক্ল ভল্লুক দেখা হয় না, তেমনি ঈশ্বর একবার অবতার হয়ে নেমেছিলেন তা শুনে আমার প্রাণের যাতনা দূর হয় না। আমি তাঁকে প্রাণের কাছে চাই, প্রতি মুহূর্তে তাঁকে অনুভব করতে চাই, নইলে যে আমি পাপী, আমি আর বাঁচি না। আমাদের যে প্রতি মুহূর্তেই তাঁর সাহায্য প্রয়োজন।

ঠিক এই উত্তর আমি একবার বম্বের লর্ড বিশপকে দিয়েছিলাম। বম্বের লর্ড বিশপের সঙ্গে আমার একবার অবতারবাদ নিয়ে তর্ক উঠেছিল। সেদিন তাঁকে যে জবাব দিয়েছিলাম, তাই আজ আবার বলছি।

তিনি আমাকে বললেন, "আমাদের খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে একটা অতি সুন্দর ভাব আছে, সেটা তোমরা দেখতে পাও না। মানুষ কি স্বয়ং আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি আপনি ক'রে উঠতে পারে? ঈশ্বর ছোট হয়ে এসে মানুষকে সাহায্য না করলে কি মানুষ উঠতে পারে? শিশু আপনার ছোট হাতখানা তুলে মায়ের মুখে মিষ্টান্ন দিতে গেল, মা যদি সেই সঙ্গে অমনি টুপ ক'রে নত হয়ে তার হাত থেকে জিনিসটি না নেন,

তবে আর শিশুর শক্তিতে কতটুকু কুলায়? তেমনি পাপী যখন ভাল হতে চাচ্ছে, সেই সময় ঈশ্বর যদি আপনার প্রভাব কিছু খর্ব ক'রে এসে তার হাতখানা না ধরেন, তবে আর পাপীর পরিত্রাণের উপায় কি আছে? এই ভাবটা কেমন সুন্দর! এতে পাপীর প্রাণে কতটা আশার সঞ্চার করে!"

আমি বললাম, "হাঁ, ঠিক কথা, এ ভাবটা কেমন সুন্দর! ভারী সুন্দর! খুব সুন্দর! অতি সুন্দর! কিন্তু এই সঙ্গে আপনারা আর-একটা কেন ভাবুন না। যেমন বৃক্ষের উৎপত্তিতে ও তাব বিকাশে দেখেন যে দুই শক্তি একত্র কাজ করে, এক শক্তি নীচ হতে আর এক শক্তি উপর হতে— নীচ হতে ওঠে পৃথিবীর রস, উপর হতে আসে সূর্যের উত্তাপ, বায়ুর হিল্লোল ইত্যাদি— এই দুই শক্তি যদি একত্র কাজ না করে তবে বৃক্ষের প্রাণরক্ষা হয় না, তেমনি মানবের সর্ববিধ উন্নতিতে এইরূপ দুই শক্তি একত্র কাজ করে। মানবীয় এমন কোনও উন্নতি নাই যাতে নীচ হতে মানবের ব্যাকুল প্রার্থনা আর উপর হতে ব্রহ্মকৃপা এই দুই এক জায়গায় সম্মিলিত না হয়। ঈশ্বর স্বয়ং জুডিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা শুনে আমার লাভ কি? আমি যে পাপী, প্রতি মুহূর্তে আমার যে তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন, প্রতি মুহূর্তে আমার ব্যাকুল প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহায্য যে আমি চাই। আমি যে তাঁর সাহায্য সর্বদা চাই। সকালে, বৈকালে, মধ্যাহ্নে সর্বদাই যে তিনি না হলে আমার চলে না, উঠতে, বসতে, আমার প্রত্যেক উত্থান এবং পতনের সঙ্গে তাঁর শক্তির যে আমার একান্ত প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর সান্নিধ্য না দেখলে কি আমাদের চলে? তিনি কেন দূরে থাকবেন? তিনি কেন একবার জগতে অবতীর্ণ হয়ে আপনার লীলা দেখিয়ে অন্তর্হিত হবেন? এ যুগে কি আর পৃথিবীতে পাপী নাই?

আমরা কি সকলেই পাপী নই ? আমরা সে মত মানি না যাতে বলে, ঈশ্বর একবার মাত্র ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ; সে ভাষা আমাদের কাছে মৃত ভাষা যাতে এই শিক্ষা দিতে চায় যে, জগতের প্রভু একবার মাত্র পৃথিবীর পাপভার হরণের জন্য জগতে এসেছিলেন। তাই যদি হয়, আমরা সেরূপ ঈশ্বর মানিতে চাই না। হায়, হায়, এ কি অবিচার! জগতের প্রভুর এ কি নিন্দনীয় কাজ! এ কি তাঁর নির্দয়তা! এখন কি আর পৃথিবীতে পাপী নাই ? আমরা যে সবাই পাপী, আমরা তবে যাই কোথায় ? না, না, তিনি একবার আসিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি প্রতি মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন, প্রতি মুহূর্তে তিনি আমাদের কাছে আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করছেন, প্রতি মুহূর্তে তিনি পাপীকে সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছেন। কোনও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয় তাঁকে বাদ দিয়ে, কোনও মহদ্ভাব প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব নয় তাঁকে বাদ দিয়ে, চরিত্রের কোনও উন্নতি সম্ভব নয় তাঁর কৃপা হতে বঞ্চিত হয়ে। তিনি, তিনি, তিনিই সব, তিনিই আমাদের সম্বল, তিনিই সর্বদা আমাদের সঙ্গে।"

আমরা অবতারবাদ মানি না। তা যখন আমরা মানি না, তখন আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য কিরূপে অনুভব করব ? মানব-হৃদয় তাঁকে কাছে চায়, নতুবা সন্তুষ্ট হতে পারে না। প্রেমের স্বভাবই এই, যে যাকে ভাল-বাসে সে তাকে কাছে চায়।

এর একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ছে। আমার বালককালের একটি গল্প বলছি। ছেলেবেলা আমার এক আত্মীয় আমাকে এক জোড়া পায়রা উপহার দিয়েছিলেন। তার মাদী যেটা সে একটা গোলা পায়রা, আর পুরুষ যেটা সেটা হচ্ছে দিশি কালো সিরাজু পায়রা। পায়রা দুটো বাড়িতে এনে ভাবতে লাগলাম, তাদের কি ক'রে রাখা যায়। উড়ে

পালাতে পারে, সুতরাং কি ক'রে আবদ্ধ ক'রে রাখা যায়, তাই ভাবতে লাগলাম। একজন বললেন, "ডানায় সুতো বেঁধে দাও।" কিন্তু কি ক'রে ডানায় সুতো বাঁধে, তা ত জানি না। তার পর একজন বললেন, "ডানা কেটে দেও। ঐ নর যেটা তার ডানা কেটে দেও।" কিন্তু কি ক'রে ডানা কাটি? এমন সুন্দর সিরাজু পায়রা, তার ডানা কাটতে ইচ্ছে হ'ল না। আমার মা বারণ করলেন, "ওরে, ঐ মাদীটার ডানা কাট্।" আমি মাকে বললাম, "ওমা, উড়ে যাবে যে। সিরাজু পায়রাটা উড়ে যাবে।" তা শুনে মা বললেন, "না, যাবে না।" তখন মাদীটার ত ডানা কেটে দেওয়া গেল। তার পরেই দেখি, নর পায়রাটা উড়ে গেল। তখন আমি মাকে বললাম, "ওমা, তুমি বললে উড়বে না, ঐ ত উড়ে গেল।" এই ব'লে ত মাকে মারতে যাই। মা বললেন, "ওরে, তুই সবুর কর্, সন্ধ্যার মধ্যে যদি না আসে, তখন তুই আমাকে মারিস।" তার পর বৈকালে দেখি কোথেকে সেই নর পায়রাটা উড়ে এসে সেই মাদীটার কাছে বসেছে। তখন আশ্চর্য বোধ করতে লাগলাম। মাকে গিয়ে বললাম, "ওমা, কেন এল মা?" মা বললেন, "আরে, ভালবাসে যে, তাই এসেছে।" তখন প্রেমের এই শিক্ষা হ'ল সেই আট বছর বয়সের সময়, যে যাকে ভালবাসে, সে তাকে চায়, সে তাকে অন্বেষণ করে।

এখানে কেহ প্রশ্ন করতে পারেন, "এই যে আপনি বললেন, যে যাকে ভালবাসে সে তাকে চায়, তবে কি ঈশ্বরও আমাদিগকে চান, তিনি কি আমাদের ভালবাসেন? তিনি কি আমাদিগেতে interested? পাপীর জন্য কি তাঁর হৃদয় কাঁদে?" এ কথার জবাব পৃথিবীর সাধুরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, "হাঁ, তিনি চান।"

তাঁর চাওয়ার কথা ভাবলে চক্ষে জল আসে। ঐ যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, যা পূর্বে বলেছি, সেটা তাঁর চাওয়ার দৃষ্টান্ত। ঐ যে মহাত্মা যীশু

বলেছেন, একজন মেষপালক একশতটি ভেড়া নিয়ে বনে চরাতে গিয়ে যদি ফিরে আসবার সময় দেখে যে, তার নিরানব্বইটা ভেড়া আছে আর একটা ভেড়া পাওয়া যাচ্ছে না, তা হলে সে কি করে? সে কি বলে, "দূর হোক, একটা বোকা ভেড়া, কোথায় চ'লে গিয়েছে।" এই কি সে বলে? না, সে বলে, "কোথা গেল আমার হারান মেষ?" এই ব'লে সে সেই নিরানব্বইটিকে পথে দাঁড় করিয়ে রেখে, ছুটে গিয়ে বনে জঙ্গলে জলে ঘুরে ঘুরে তাকে অনুসন্ধান করে। দেখুন কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! তার পরে যখন তাকে পায়, তখন কি সে রেগে মেগে তাকে বলে, "হতভাগা জানোয়ার, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?" সে কি এরূপে মারে? না তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটে যায় যেখানে তার সেই নিরানব্বইটা দাঁড়িয়ে আছে? তেমনি যীশু বলেছেন, "তোমরা জেন, জেন, জেন, পাপীর বন্ধু পরিত্রাতা ঈশ্বর চিরদিনই এমনি ক'রে জগতে পাপী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যারা হতভাগ্য হয়েছে, যারা তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে চ'লে গিয়েছে, তাদের খুঁজে আনা তাঁর এক মহাকাজ। ঐ মেষপালক যেমন তার নিরানব্বইটি ভেড়া পথে দাঁড় করিয়ে ছুটে গিয়েছিল, কোন্ বনে কোন্ জঙ্গলে তার একটি ভেড়া পথ হারিয়ে 'ভ্যা ভ্যা' করছে, তেমনি জেন, ঈশ্বর তাঁর হাজার হাজার সন্তানকে পথে দাঁড় করিয়ে রেখে ঐ যে তাঁর এক সন্তান বিপথে চ'লে গেল, তাকে খোঁজবার জন্য বাহির হন।"

অনেকে বলেছেন, তিনি অনুগতবৎসল, তিনি ভক্তবৎসল, যে তাঁকে ব্যাকুল প্রাণে ডেকেছে, সেই তাকে পেয়েছে। হাঁ, হাঁ, এ কথা ঠিক। কিন্তু যে তাঁকে ডাকছে না, যে তাঁকে চায় না, তিনি যে তাকেও ডাকেন, তাকেও তিনি খোঁজেন। কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! তিনি শুধু ভক্তবৎসল কেন, তিনি অভক্তবৎসল। এই যে তাঁর পাপী-খোঁজার ভাব,

ইহা অনুভব করতে পারাতেই জগতে ভক্তির জন্ম হয়েছে। সকল ভক্তগণই এটা অনুভব করতে পেরেছিলেন।

কেহ বলতে পারেন, "এ কথা ব'লে পাপীর প্রাণে কত সাহস এনে দেওয়া হয়, তাকে আরও পাপের পথে যেতে বলা হয়। সে ভাবতে পারে, 'ঈশ্বর যখন আমাকে ছাড়বেন না, তখন আর আমার ভয় কি? আমি নিশ্চিন্ত মনে পাপ করতে পারি।'" তা নয়। সে ভয় আমি পাই না। ঈশ্বর পাপী খুঁজে বেড়ান। সব দেশের সব সাধুরাই ইহা অনুভব করেছেন। এই ভাব হতেই জগতে ভক্তির জন্ম হয়েছে।

এতে যে তাঁর মহিমার ভাব একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তা নয়। এতে যে তাঁর রাজভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়, তাঁর রাজবেশ সম্পূর্ণ রূপে উন্মোচন করতে হয়, তা নয়। কিন্তু তিনি খুঁজে বেড়ান। তিনি আমাদের উদ্ধারসাধনে ব্যস্ত। তাঁর এই পরিত্রাতা-ভাব জগতে আসাতে সাধুদের জন্ম হয়েছে। যেমন ঘরে ঘরে দেখতে পাই, মায়ের কোলে শিশু থাকে, মা শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে ব'সে থাকেন, মায়ের প্রেম আমাদের কত অপরাধ মার্জনা করে, মায়ের সহিষ্ণুভাব ও প্রেমের ভিতর দিয়ে যেমন ঈশ্বরের মাতৃভাব ফুটে বেরুচ্ছে, তেমনি জগতের সাধু মহাজনগণের ভিতর দিয়ে তাঁর মঙ্গলস্বরূপ ফুটে উঠছে।

সাধুরা আমাদের মা। পৃথিবীতে সাধুজীবনের দ্বারা জগতের কত কল্যাণ হয়েছে, জগদ্বাসীর কত উপকার হয়েছে। আমাদের পাপ হতে রক্ষা করবার জন্য তাঁদের কি চেষ্টা! কি সংগ্রাম! ভাবলে অবাক্ হতে হয়। পাপীদের ভাল করবার জন্য পৃথিবীর সাধুরা যেমন ক'রে যত্ন করেছেন, তেমন আর কে করেছে? সে-সমুদয়ের উল্লেখ এখন আর নিষ্প্রয়োজন। আমাদের ক্ষুদ্রতার আবরণ কাটবার জন্যে, আমাদের অজ্ঞতার ও মোহের ঘোর কাটবার জন্যে তাঁরা কতই না পরিশ্রম করেন। মহাত্মা বুদ্ধ পাপীদের

উদ্ধারের জন্য কি প্রকার চেষ্টা করেছিলেন! সব সাধুরাই করেছেন। জগতের সমুদয় সাধুরই এক চেষ্টা— পাপীদের মুখ ফেরান। তাঁরা যেন পাপীদের হাত ধ'রে নিয়ে গিয়েছেন ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের দিকে। সব সাধুরই চেষ্টা পাপীদের প্রাণে পরিত্রাতা ঈশ্বরের পরিত্রাণের বার্তা শুনিয়ে দেওয়া।

আমি একবার একটি গল্প শুনেছিলাম, মহাত্মা যীশুর শিষ্যগণের মধ্যে একজন— ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, বোধ হয় পিটার কি আর কেহ হবেন— একটি লোক দুষ্ক্রিয়ান্বিত হয়ে তাঁহাদের দল ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল। সেই লোকটি ক্রমে এতদূর খারাপ হয়েছিল যে, পরে সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন ক'রে এক ডাকাইতের দলে গিয়ে মিশেছিল। তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ফিরে এসে যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর সেই শিষ্য তাঁর দল ছেড়ে চ'লে গিয়েছে, তখন তিনি দলের অপর সকলকে পরিত্যাগ ক'রে কাকেও কিছু না ব'লে সোজা একবারে সেই ডাকাইতের দলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সেই লোকটিকে খুঁজতে লাগলেন। তাকে দেখবামাত্র ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, "তুমি আমায় না ব'লে কেন চ'লে এলে? তোমার কি হয়েছে বল।" তাঁকে দেখে তার প্রাণে এমনি ভাবের উদয় হ'ল যে, সে একেবারে তাঁর পায়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল। সেই দিন থেকে সে ফিরে গেল, তার জীবন বদলে গেল। এ কি আশ্চর্য প্রেম! এ কি আশ্চর্য ব্যাকুলতা! পাপীর জন্য মানব-হৃদয়ে এ কিরকম ব্যাকুলতা!

এ ব্যাকুলতা যে হৃদয়ে হয়, ধন্য সে হৃদয়! ধন্য পরিত্রাতা পরমেশ্বর যে তিনি কৃপা ক'রে মানব-হৃদয়ে এমন ব্যাকুলতার উদ্রেক করেন। যেমন জননী তাঁর সন্তানের জন্য ব্যাকুল হন তেমনি জগতের সাধুরা পৃথিবীর পাপীদের জন্য ব্যাকুল হন। এ ব্যগ্রতা যে কিরূপ, আমার

এমন ভাষা নাই যা দিয়ে তা বর্ণনা করতে পারি। আছে, আছে, পাপীর জন্যে প্রেম আছে।

প্রেমের আধার ঈশ্বর চিরদিনই এমনি ক'রে সাধুদের দিয়ে জগতের পাপী ধ'রে বেড়ান। তিনি আমাদের ছাড়েন না। আমরা ছাড়লেও তিনি ছাড়েন না। ঐ যে তিনি রয়েছেন, ঐ যে তিনি আমাদের আলিঙ্গন করছেন। ঐ তিনি আমাদের কোলে ক'রে তুলে নেবার চেষ্টা করছেন। আমরা যখন বিষয়সুখে ডুবি, আমরা যখন পৃথিবীর ক্ষুদ্র মোহে ডুবে যাই, তখন সেই জ্ঞানময়ের জ্ঞানদৃষ্টি আমাদের পশ্চাতে থাকে। তাঁকে ছেড়ে আমি যাব কোথায়? এমন কোন্ স্থান আছে যেখানে গিয়ে আমি ভাবতে পারি, আমি একা হয়েছি? ঐ যে একজন রয়েছেন, ঐ আমার বাঁচবার জন্যে আমার পশ্চাতে একজনের দৃষ্টি সর্বদাই রয়েছে, তা না হলে কি পাপী বাঁচে? ঐ যে পাপী গোঁ ধ'রে ছিল, ঐ যে পাপী ছুটেছিল, ঐ যে পাপী ঈশ্বরের চরণ হতে উঠে ক্ষুদ্র সুখে ডুবতে গিয়েছিল, ও পাপীর মুখ কে ফিরাল? ঐ মা, ঐ আমাদের জগন্মাতা। শিশু রাগ ক'রে মায়ের কোল ছেড়ে চ'লে গেলে কি হবে, মায়ের দৃষ্টি তার সঙ্গে সর্বদাই আছে। সে বুঝতে পারে না, তাই যায়। তেমনি, ও পাপী তুমি ঈশ্বরের চরণ হতে যতই দূরে যাও-না কেন, জেন, জেন, একজন তোমার সঙ্গে সর্বদাই আছেন। এক পরমপুরুষের জ্ঞান সর্বদাই তোমার পশ্চাতে আছে। সেই জ্ঞান সর্বদাই তোমায় কোলে তুলে নেবার চেষ্টা করছে। ছেলে যেমন আপনার ছোট পায়ের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে ছুটে যায়, ভাবে তার মাকে আর ধরা দেবে না, শেষে যেমন তাকে আসতেই হয়, ছুটে এসে মায়ের কোলে পড়তেই হয়, তেমনি, হায় হায়, এ জগতে পাপী সন্তান ছুটেছিল, ভেবেছিল ঈশ্বরের সঙ্গে আর তার দেখা হবে না। আপনার শক্তির উপর নির্ভর ক'রে সে

চলেছিল, ঐ কৃপাময়ের পরম কৃপা তার পশ্চাতে ছুটে ছুটে তাকে ফিরিয়ে এনেছে।

সে কৃপার যে পার নাই। মায়ের স্নেহ কি কখনও হার মানে? শিশু যখন মা'র কোল হতে মাথা তুলে ছুটে যায়, তখন এক দিকে মায়ের স্নেহ আর-এক দিকে তার চেষ্টা। বল, যাবে কোথা? একবার, দু'বার, তিনবার, না হয় পাঁচবার। অবশেষে সে যখন কাবু হবে, তখন সে ছেলে ধরা দেবেই দেবে। তেমনি, ওগো পাপী, তুমি যাবে কোথা, ঈশ্বরের দয়াতে যেদিন কাবু হবে, সে প্রেমে যেদিন পরাস্ত হবে, সেই দিন— সেই দিন— সেই দিন সব পরিশ্রম বৃথা জেনে তাঁর চরণে এসে পড়তেই হবে। সেই দিন মাথা গুঁজে সে চরণে প'ড়ে তোমায় কাঁদতেই হবে। তাঁর চরণে আসা যে তোমার অপরিহার্য। পরিত্রাতা ঈশ্বর তাঁর পরিত্রাণপ্রদ কোল পেতে আমাদের পশ্চাতে ছুটছেন, তাঁর কাছে আমাদের আসতেই হবে। পরিত্রাণ আমাদের পেতেই হবে। We are doomed to be saved.

কেহ হয়ত বলবেন, এ কি ভয়ানক কথা! এরূপ ক'রে পাপীর সাহস বাড়িয়ে দেওয়া ভাল নয়। আমি কিন্তু ভয় পাই না। ঐ দেখ পবিত্র-স্বরূপ ঈশ্বরের পবিত্র মুখ, ঐ দেখ তাঁর মুক্তিপ্রদ চরণ। পাপীকে জব্দ হতেই হবে। পাপীকে তাঁর চরণ আশ্রয় করতেই হবে। মুক্তিদাতা ঈশ্বর এইজন্য আমাদের সকলকে ডেকেছেন, তাই এই বর্তমান শুভ মুহূর্তে তাঁর এই মুক্তিপ্রদ ধর্মবিধান জগতে এসেছে। আমাদের প্রত্যেককে তিনি ডাকছেন।

এস, কে পাপী আছে, এস, কে ভগ্নহৃদয় হয়ে আছে, শীঘ্র এস। ধর, বুকে সাহস ধর, এস কে আছ আপনার হীনতা দেখে নিজকে অধম মনে করছ, এস, কে আপনাকে অপদার্থ জেনে নিরাশায় ডুবে যাচ্ছ,

এস, ঐ মুক্তিদাতা ঈশ্বর, ঐ তাঁর মুক্তিপ্রদ চরণ, তাঁর পরিত্রাণের সংবাদ সকলের জন্য। জানি না, কোন্ শুভ মুহূর্তে এই ধর্মবিধান জগতে এসেছিল। এক-একবার মনে হয়, না জানি সেদিন কি দিন, যেদিন ঐ গঙ্গানদী জগতে এসেছিল। ইচ্ছা হয় একবার সেই স্থান দেখে আসি, একবার দেখে নয়ন সার্থক করি, যে স্থান হতে ঐ গঙ্গানদী হিমালয়ের পাদদেশ হতে পৃথিবীতে নামছে। তেমনি ইচ্ছা হয়, একবার সেই পুণ্য-স্থান দেখে আসি, যেখান হতে এই ভক্তিনদী ঈশ্বরের চরণপ্রান্ত হতে পাপীদের উদ্ধারের জন্য জগতে নামছে। এস এস, তোমরা এই ভক্তি-নদীতে অবগাহন কর। এস এস, এই পুণ্যনীরে স্নান কর। প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। হৃদয় শীতল হবে। হয় না? প্রাণ জুড়ায় না? ঈশ্বরের চরণে মাথা রাখলে পাপীর প্রাণ জুড়ায় না? এ কি তবে মিথ্যা কথা? ওগো, মিথ্যা কথা নয়, আজ মিথ্যা কথা বলতে আসি নাই। আজ সত্য সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমরা শোন। তোমরা দেও প্রাণ, জুড়াবে। যদি প্রাণ না জুড়ায়, আমায় তোমরা মিথ্যাবাদী ব'লো, আমার তোমরা গাল দিয়ো, মনের সাধে গাল দিয়ো। একবার তাঁর চরণে আপনাকে দিয়ে দেখ, প্রাণ জুড়াবে, ওগো প্রাণ জুড়াবে। এস তবে, দেও তাঁর চরণে আপনাকে ফেলে, আজ ঐ অর্জুনের মত বল, "হে ঈশ্বর, তুমি তোমার অনন্ত-রূপ সংবরণ কর, তুমি তোমার রাজবেশ উন্মোচন কর, তুমি তোমার মহিমান্বিত রূপ সংবরণ কর, আমরা তোমায় দেখে নি। তুমি তোমার মাতা-রূপ আজ আমাদের কাছে প্রকাশ কর, আজ আর সৃষ্টিতে তোমায় দেখতে যাব না। ঢের হয়েছে, আজ তুমি পরিত্রাতা ঈশ্বর হয়ে আমাদের কাছে প্রকাশিত হও।" এই কথা বল, বল, সকলে বল। আজ আর অন্য শব্দ নাই, আর সব ভুলে যাও। আর কোনও মন্ত্র নাই, আজ এক মন্ত্র— "পরিত্রাতা ঈশ্বর, পরিত্রাতা ঈশ্বর।" এই আজ জপের মন্ত্র, জপ' সকলে,

জপ কর, আজ প্রতিজ্ঞা কর, কর, ভাল ক'রে প্রতিজ্ঞা কর, তাঁর চরণে দেওয়া ভিন্ন তোমরা আর কিছু দেখবে না। আজ এই পুণ্যগঙ্গায় তোমরা অবগাহন কর। আজ এই ভক্তিধারায় তোমরা অবতরণ কর। পুরাণে কথিত আছে, গঙ্গার স্রোতে ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল। আজ এই ভক্তি গঙ্গাতে তোমাদের অহংকারের ঐরাবত উল্টোপাল্টা হয়ে ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক। আজ উঠ, সকলে মিলে উঠ, কর, আস্বাদন কর, মুক্তি-দাতা ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদ দয়া আজ প্রাণ ভ'রে আস্বাদন কর। আজ ভুলে যাও, পরস্পরের প্রতি ক্ষুদ্র ভাব সব ভুলে যাও। ঈশ্বরের চরণে প্রাণ দাও, প্রাণদাতা ঈশ্বরকে আজ সকলে প্রাণে ধর। এস, আজ বিনয়ে নত হয়ে সকলে মিলে তাঁর চরণে প্রণাম করি।

১৩১০

বর্তমান যুগ ও পারমার্থিকতা

ব্রাহ্মসমাজ কি কাজ করিতে জগতে আসিয়াছেন এবং সে কার্যের জন্য কিরূপ ভাবে আপনাকে প্রস্তুত করিতেছেন, আজ মাঘোৎসবের দিন একবার তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

জগতে সাধারণত তিন শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তিন প্রকারে ধর্মকে দর্শন করিয়া থাকেন।

প্রথম এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, বিষয় সম্মুখে আর পরমার্থ পশ্চাতে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোক পরমার্থের প্রতি একরূপ উদাসীন। বিষয় তাঁহাদের কাছে শ্রেষ্ঠ, বিষয় তাঁহাদের সর্বোপরি, তাহাকেই তাঁহারা সর্বস্ব বলিয়া জানেন। তাঁহারা মনে করেন, পরমার্থ বিষয়ে চিন্তা করিয়া করিয়া মানুষ আজ পর্যন্ত কিছু একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় যাইতে পারে নাই, পারিবেও না, উহা মানব-জ্ঞানের অতীত, উহা অজ্ঞেয়, সুতরাং জানিতে চেষ্টা করিয়া কাজ নাই। ঐহিক উন্নতিই সব, সেই বিষয়েই মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদের উপদেশ এই— মানব-সমাজকে সুখী করিবার যে-সকল উপায় হাতের কাছে আছে তাহা অবলম্বন কর, পরমার্থ বিষয়ে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিও না। কিন্তু এই শ্রেণীর আরও অনেক লোক আছেন, তাঁহারাও এই ভাবাপন্ন, তাঁহারা পরমার্থ-চিন্তা বিষয়ে একেবারে উদাসীন।

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান ভাব কি, এই প্রশ্ন যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি এক কথায় তাহার এই উত্তর দেই যে, তাহা পরমার্থ-বিমুখতা; দৈহিক ও বৈষয়িক সুখে অতিমাত্রায় অভিনিবেশ বর্তমান সভ্যতার প্রধান লক্ষণ। রেলওয়ে এখন ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল যায়, যাহাতে তাহার অপেক্ষা বেশি যাইতে পারে অথচ তজ্জনিত

শারীরিক ক্লেশ না হয়, এমন উপায় কর। গরমের সময় রেলের গাড়িতে যাইতে বড় ক্লেশ বোধ হয়, সেজন্য গাড়িতে খস্‌খস্ লাগাও। এক সময় গ্যাসের আলো ছিল, এখন তাড়িতের আলো হইয়াছে, তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর ও স্নিগ্ধতর আলো আবিষ্কার কর। এখন মানুষ রেলে যায়, যদি এমন কোনও উপায় বাহির করা যায় যাহাতে উড়িয়া যাওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে মন্দ হয় না।

এইরূপে দেখা যায়, বর্তমান সভ্যজগতে মানুষের ভোগ-লালসার সীমা-পরিসীমা নাই। বৈষয়িক উন্নতি ও বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি, তাহাতেই মানুষ সমুদায় মনোযোগ অর্পণ করিতেছে। এই যে অতিরিক্ত সুখ-লালসা, এই যে অতিরিক্ত সুখস্পৃহা, যাহাকে ইংরাজিতে বলা যায় insatiable greed for personal comfort, ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান লক্ষণ। এই যে ভাব, ইহার কাছে পরমার্থ দাঁড়াইতে পারিতেছে না। একবার এই বেদী হইতে বলিয়াছিলাম যে, এই অতিরিক্ত greed for personal comfort—শারীরিক ও ভোগ-লালসার চক্ষে ভোগ-সুখের অভাব যত ক্লেশকর, নৈতিক অবনতিও তত ক্লেশকর নহে। সহরে প্লেগ বা অপর কোনও কঠিন রোগ প্রবেশ করিয়াছে, ইহা জানিলে মানুষ যেরূপ ব্যস্ত হয়, মানুষগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা জানিলে সেরূপ হইবে না। আজ যদি শোনা যায়, সহর-সুদ্ধ সব লোক মাতাল হইয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে মানুষ তেমন দুঃখ করিবে না, প্লেগে দশজন মারিলে যত দুঃখ করিবে। দেহ-মহারাজকে যাহাতে আরামে রাখা যায় তাহারই জন্য মানুষের সর্বপ্রধান চেষ্টা, আত্মা বেচারির জন্য কেহ চিন্তিত নয়।

এই ত পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব। পরমার্থের প্রতি তাঁহারা উদাসীন। এই অতিরিক্ত বৈষয়িক অভিনিবেশের নিকট পরমার্থ

দাঁড়াইতে পারিতেছে না। পরমার্থের ছিটাফোঁটাও যেন আর রক্ষা করা যাইতেছে না। যেমন বড় মানুষের বাড়িতে লক্ষ্মীর আড়ী বা খুঁচি থাকে— একটা বড ধামা, গায়ে দুই চারিটা চন্দনের ফোঁটা, ভিতরে ধামা বা খুঁচি পোরা মোহর, তাকে বলে লক্ষ্মীর আড়ী— তেমনি ভোগ-বিলাসের, ধনসম্পদের আড়ম্বরের উপরে একটু পরমার্থের ছিটাফোঁটাও যদি থাকিত তাহা হইলেও হইত; কিন্তু তাহাও থাকিতেছে না। কেবল ভোগ, ভোগ, ভোগ। ঈশ্বর পিছাইয়া পড়িতেছেন। তিনি প্রবেশের পথ পাইতেছেন না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বিষয় এবং পরমার্থ এই দুইকেই এক সঙ্গে রক্ষা করিতে চান, কিন্তু তাহা পরমার্থকে বিষয়ের অধীন করিয়া। অর্থাৎ ধর্ম ততক্ষণ, পরমার্থ-চিন্তা ততক্ষণ, যতক্ষণ বৈষয়িক কোনও ক্ষতি না হয়; পরমার্থ-চিন্তা ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহা বিষয়ের অনুকূলে যায়। আদালতে মামলা বাধিয়াছে, যদি দেখা যায় দুইটা মিথ্যা কথা না বলিলে আমার বৈষয়িক ক্ষতির সম্ভাবনা, তবে তাহাতেই আমি রাজি আছি। ধর্ম যতক্ষণ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যায় ততক্ষণ আমি ধর্মের অধীনতা স্বীকার করিতে পারি; নতুবা ধর্ম যদি বিষয়কে বাধা দেয়, ধর্ম যদি বিষয়ের প্রতিকূলে যায়, ধর্ম যদি তাহার প্রতিবন্ধক হয়, তবে আর আমি তাহাতে রাজি নই। এইরূপে দেখা যায়, অনেক লোক ধর্ম ও বিষয় এই দুইকে একত্র রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন; ধর্মকে তাঁহারা বিষয়ের অধীন করিয়া লইতে চান।

তৃতীয় এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম অগ্রে, বিষয় তাহার অধীন; বিষয়কে তাঁহারা ধর্মের বা পরমার্থের অধীন করিয়া লইতে চান।

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজ কি কার্য করিতে জগতে

আসিয়াছেন, কেন ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইল, তাহার উত্তর যদি কেহ চান তবে বলিতে হয়, বর্তমান সুসময়ে বিধাতার বিশেষ বিধানে ইহার জন্ম হইয়াছে। এটা কি বিধাতার বিধান নয়? ঈশ্বরের হাত কি আমরা ইহাতে দেখিতে পাই না? কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠিল? আমরা জনকতক মানুষ 'যেহেতু' 'অতএব' বলিয়া যুক্তি দিয়া কি এই ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিয়াছি, আমাদের তর্কযুক্তির দ্বারা কি এই ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়াছে? না, কখনই না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে যাঁহারা আপনাদিগকে দেখেন, তাঁহারা এ ব্রাহ্মসমাজ কি তাহা জানেন না। কোনও সভাতে কোনও নির্ধারণ (resolution) করিয়া এই ব্রাহ্মসমাজ হয় নাই। বিধাতার অঙ্গুলিস্পর্শে এই ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে— ঐ পদ্মানদীর চর যেমন করিয়া হয়, কেহ সভাসমিতি করিয়া পদ্মার অথবা গঙ্গার চর প্রস্তুত করে না, জলের স্বাভাবিক গতিতে ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে উহা প্রস্তুত হয়। তেমনি বিধাতার স্বাভাবিক ধর্মনিয়মে এই ব্রাহ্মসমাজ আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

অনেক দিন দেখিয়া আসিতেছি, বাহিরের লোকে ব্রাহ্মসমাজের আসন্ন মৃত্যু ঘোষণা করিতেছে। আমার এই বয়সে আমি যে কতবার দেখিলাম মানুষ ইহাকে মারিল; তাহা বলিতে পারি না। "ঐ গেল, গেল, গেল, ব্রাহ্মসমাজ মরিল" এই ধ্বনি বার বার উঠিয়াছে। কিন্তু এই এক আশ্চর্য দেখি, তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হইতেছে না। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী আজ পর্যন্ত পূর্ণ হইল না। কেন হইবে? এ ব্রাহ্মসমাজ আমাদের হাতের গড়া নয়। বিধাতার নিয়মে, তাঁহার শুভ বিধানে, শুভ সময়ে, অতি মহৎ উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছে।

কি জন্য এই ব্রাহ্মসমাজ উত্থিত হইল, কেহ যদি তাহা আমাকে

জিজ্ঞাসা করেন, আমি সংক্ষেপে বলি. বর্তমান যুগে পরমেশ্বরকে মানব-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা ইহার প্রধান কাজ।

আমরা দেখিতেছি, বিজ্ঞান মানব-মনের চিরাগত সংস্কার-সকলকে পরিবর্তিত করিতেছে। প্রধানত ধর্মের ক্ষেত্রে মানবের ধর্মবিশ্বাসে যে-সকল প্রাচীন ধারণা ছিল, যেরূপ সংস্কার ছিল, যে-সকল ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান ছিল, বিজ্ঞানের প্রভাবে সে-সকল ভিত্তি স্থির থাকিতেছে না। ইহাতে দুই দিকে দুই প্রকার ফল ফলিতেছে। প্রথমত, প্রাচীন-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ মনে করিতেছেন যে, পরমার্থ বুঝি এ যুগে আর মানব-মনে স্থান পাইবে না, তাহা বুঝি মানব-মন হইতে বিলুপ্ত হইবে। যাঁহারা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু তাঁহারা মনে করিতেছেন. বেদে যখন আর মানুষের নিষ্ঠা থাকিতেছে না, শাস্ত্রে ও গুরুতে যখন বিশ্বাস থাকিতেছে না, তখন পারমার্থিকতা আর কিরূপে থাকিবে? প্রাচীন ভিত্তিগুলি চলিয়া গেলে যে মানব-মনে ধর্মভাব থাকা সম্ভব, তাহা তাঁহারা মনে করিতেই পারেন না। সুতরাং তাঁহারা "ধর্ম গেল" ভাবিয়া নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন। ধর্মই যদি মানব-সমাজ হইতে চলিয়া গেল, তবে আর কি দিয়া মানব-সমাজকে বাঁধিয়া রাখা যাইবে? এই ভাবিয়া তাঁহারা গভীর দুঃখে নিমগ্ন হইতেছেন। আবার অপর দিকে যাঁহারা ধর্মের প্রাচীন ভিত্তিতে আস্থাহীন হইতেছেন, তাঁহারাও ভাবিতেছেন ধর্মের ভিত্তি যখন গেল তখন ধর্ম আর কোথায় দাঁড়াইবে, সুতরাং পারমার্থিকতাকেও মন হইতে বিদায় করা আবশ্যক। ইহাতে তাঁহারা আরও নিরীশ্বর ও পরমার্থহীন হইয়া পড়িতেছেন।

জগতে এই যে পরিবর্তন যাইতেছে ইহাতে এ দেশে আমাদের বিশেষ চিন্তিত হইবার কথা, কারণ আমরা পারমার্থিকতার জন্য চিরদিন প্রসিদ্ধ। আমাদের পূর্বপুরুষগণ স্বজাতীয়গণের মনে পারমার্থিকতাকে

দৃঢ়নিবদ্ধ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-বিষয়ে ইঁহারা যেরূপ গভীর তত্ত্বসকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন আমাদের জাতীয় সম্পদ রূপে থাকিবে। বলিতে কি, তাঁহারা পরমার্থ-চিন্তাকে আমাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের কৃতকার্যতার বিষয় যখন স্মরণ করি, তখন আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে, এমন কি আইন-আদালতে পর্যন্ত পরমার্থ যেন অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। বিবাহানুষ্ঠান, সন্তানোৎপাদন এ-সকলও ইঁহাদের ধর্মের অঙ্গীভূত।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্।

পিণ্ডং দত্ত্বা ধনং হরেৎ।

স্ত্রী কিসের জন্য? না, পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে। পুত্র কি জন্য? না, পিণ্ডদানের জন্য। যে পিণ্ডদানে অধিকারী, সে-ই উত্তরাধিকারী-সূত্রে ধনলাভের অধিকারী। এইরূপে সামাজিক জীবনের সমুদয় ব্যাপার, এমন কি দায়াধিকার পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাসের সহিত বাঁধা। এমনি করিয়া সে কালের মানুষেরা হিন্দু জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধর্মকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই ধর্মপ্রবণ জাতি যদি পরমার্থ-বিবর্জিত (secularist) হইয়া যায়—পাশ্চাত্য দেশের জাতিসকলের মধ্যে যেমন দেখা গিয়াছে, "খাও, দাও, ঘুমাও" এই তাহাদের প্রধান ভাব—ইহাদেরও যদি তাহাই হয়, যদি ইহারা ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, পাশ্চাত্য জাতি-সকলের যাহা হইয়াছে, ইহাদেরও যদি তাহাই হয়, তবে সুর-নরে অশ্রুপাত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এই পারমার্থিকতা দেশ হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম। ইহা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন। তিনি

তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্দর্শনের শক্তিতে ঋষির (seer) ন্যায় দেখিয়াছিলেন যে, ইংরাজি শিক্ষা ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী ; এবং যখন তাহা হইবে, যখন এই ইংরাজি শিক্ষার নবীন আলোক ভারতবর্ষবাসীর মনে প্রবেশ করিবে, তখন তাহার শক্তিতে পুরাতন সংস্কারসকল ভাঙিয়া যাইবেই যাইবে। তৎপরে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি করা যাইবে ? পুরাতন সংস্কারগুলির সঙ্গে সঙ্গে কি ধর্মভাবও বিপর্যস্ত হইতে দেওয়া হইবে ? পারমার্থিকতাও কি আমাদের জাতীয় চিত্ত হইতে উঠিয়া যাইবে ? তাহা যদি হয়, তবে ত বড়ই বিপদ। তাহা হইলে কি করা যাইবে ? রামমোহন রায় গভীর ভাবে এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

তিনি যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইল, পুরাতনের উপরে জোর দেওয়া আর বৃথা, তাহাকে রাখিবার চেষ্টা করিয়া আর কোনও ফল নাই। লোকে প্রাচীন দেবদেবী মানিবে না, জাতিভেদকে রাখিবে না, বেদ-বেদান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিবে না, ও-সকলকে আর রাখা যাইবে না। যে জ্ঞানালোক আসিতেছে, তাহার নিকটে ও-সকল আর দাঁড়াইবে না। তখন কি করা যাইবে ? তখন কি হইবে ? ধীরভাবে রামমোহন রায় এ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ যে ধর্মের আবরণগুলি, ঐ যে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি, যাহাতে মানবহৃদয়ে ধর্মভাবকে ধারণ করিয়া আছে, ওগুলি না হইলে ধর্মের থাকা হইবে কি না ? চিন্তা করিয়া অনুভব করিলেন যে, ঐ যে সকল দেব-মন্দির, দেব-প্রতিমা, ঐ যে সকল গ্রন্থ, সেগুলি ধর্মের বহিরবলম্বন মাত্র। এগুলি ব্যতীতও ধর্ম থাকিতে পারে। নিগূঢ় ভাবে দর্শন করিতে গিয়া প্রতীতি করিলেন যে, যতই চিন্তা করা যায় ততই প্রতীয়মান হয় যে, এ জীবন আমাদের নয়, জীবনের পশ্চাতে এক

মহা পুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা এই জীবন বিধৃত, তাঁহা কর্তৃক এই জীবন নিয়মিত। জীবনের পশ্চাদ্‌বর্তী, অন্তরালবর্তী এই যে মহা জীবনী-শক্তি, তাহাকে জ্ঞান বল, প্রেম বল, জীবন বল, অথবা আর যাহা কিছু বল, যে নামই দেওয়া যায়, একে কিন্তু অস্বীকার করিবার জো নাই।

রামমোহন রায় এই মহাজ্ঞানকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তাহার উপর জোর দিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ যে জীবন, উহাকে রামমোহন রায় বলিলেন জ্ঞান এবং প্রেম। উহাতে জ্ঞান এবং প্রেম আরোপ করিয়া জ্ঞানময় এবং প্রেমময় পুরুষ রূপে তাঁহাকে দেখিলেন। উপনিষদে যাঁহাকে বলা হইয়াছে, "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ।" তিনিই মহান্ প্রভু, তিনিই পরম পুরুষ, সেই পুরুষের হাতে এই জীবন রক্ষিত, তাঁহার দ্বারা ইহা বিধৃত, তাঁহাকে ভিত্তি করিয়া এই জীবন দণ্ডায়মান।

রামমোহন রায় যখন ইহা দেখিলেন তখন তিনি মনে করিলেন, এই পুরুষের হাতে মানব-জীবন রাখিতেই হইবে, এই পরম পুরুষের হাতে মানব-জীবনকে স্থাপন করিতেই হইবে, উহাকেই অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। তাহা হইলে সেই অবলম্বনে প্রচলিত কুসংস্কার-সকল দেশ হইতে চলিয়া গেলেও ধর্ম যাইবে না, ধর্মকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে।

কিন্তু এই ভাব দেশের লোক গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বুঝিতেই পারিতেছেন না যে, অভ্রান্ত শাস্ত্রের মত ত্যাগ করিয়া, জাতিভেদ ত্যাগ করিয়া, দেবদেবী বর্জন করিয়া, বেদ বেদান্ত না মানিয়া ধর্মের দাঁড়ান সম্ভব। এ-সকল পরিত্যাগ করিলেও আত্মায় পরমাত্মায় যোগ হওয়া যে সম্ভব, ইহা দেশের লোক বিবেচনা করেন

-না, এবং সেই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এত বিরুদ্ধ ভাব। তাঁহারা সকলেই বিদ্বেষপরবশ হইয়া এই কথায় আপত্তি করেন, তাহা নয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চিন্তাশীল মানুষ, আধ্যাত্মিকতায় উন্নত মানুষ, পারমার্থিকতা-সম্পন্ন মানুষ, তাঁহারা যতই চিন্তা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছেন না যে, জাতীয় চিত্ত হইতে ঐগুলি উঠিয়া গেলে ধর্ম আর কিরকম করিয়া থাকিবে। অতএব যাঁহারা ব্রাহ্মব্রাহ্মিকার নিন্দা করেন, তাঁহারা যে সকলেই বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া তাহা করেন, তাহা মনে হয় না। ব্রাহ্মদিগকে তাঁহারা ধর্মের বিলোপকারী বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু তাহা নয়, তাঁহারা যাহা ভাবিতেছেন তাহা সত্য নয়। আজ কি আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন নমুনা-স্বরূপ ইঁহাদের সমক্ষে ধরিতে পারি না? আজ কি তাঁহার জীবন দেখাইয়া লোককে বলিব না, "তোমরা যাহা বলছ, তোমরা যে ভয় পাচ্ছ, তাহা ঠিক নয়?" যিনি সমুদয় জীবন অতিবাহিত করিলেন পারমার্থিকতাকে জীবনে স্থাপন করিবার জন্য, তাঁহার জীবন আজ আমাদের দৃষ্টান্তের স্থল হইবে না? আজ মহর্ষির জীবন উজ্জল তারকার ন্যায় হইয়া এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। স্থির, ধীর, গম্ভীর, নিঃশব্দ ও নীরব ভাষায় মহর্ষির জীবন আজ আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে যে, দেবদেবী না মানিয়া, জাতিভেদ-বর্জিত হইয়া, সকল প্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ, মঙ্গলময় পবিত্র ঈশ্বরের অর্চনা করা এবং তাঁহাকে হৃদয়ে স্থাপন করা মানবের পক্ষে সম্ভব। তাঁহার চরিত্রের মূল্য কত, তাঁহার জীবনের দাম কত, তাহা বুঝিতে এখনও এ জাতির সময় লাগিবে। শুধু কি এই ভারতবর্ষে? সকল দেশের জন্যই তাঁহার এই জীবন দৃষ্টান্তস্থল। ইউরোপ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় যে-সকল দেশ, তাহারাও দেখুক, সে-সকল

দেশের লোকও জানুক যে, এই বর্তমান জ্ঞানোন্নত যুগে, এই নবালোক-প্রাপ্ত সময়ে মহর্ষির জীবন এক মহানিশান-স্বরূপ। শাস্ত্রের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিয়া, গুরু না মানিয়া, সকল প্রকার কুসংস্কার -বর্জিত হইয়া, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনার দ্বারা এ যুগেও যে মানুষ ধ্যানেতে ঋষি, প্রেমেতে ভক্ত, কর্তব্যসাধনে নীতিমান্ পুরুষ হইতে পারে, তার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহর্ষি এই নবযুগে রাখিয়া গেলেন। এ কথা বড় সামান্য নয়। যদি চিন্তাশীল কেউ থাকেন, তিনি একবার চিন্তাতে ধারণ করিবার চেষ্টা করুন, কত বড় কথা মহর্ষি তাঁহার জীবনের দ্বারা আমাদিগকে বলিয়া গেলেন। "তোমরা যাকে ধর্মের ভিত্তি মনে কর, তোমরা অধিকাংশ লোক যাকে ধর্মের সর্বপ্রধান অবলম্বন মনে কর, তাকে পরিহার ক'রে, তাকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন ক'রে মানুষ সহজে ধর্মপথে অগ্রসর হতে পারে"—এই কথা তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার দ্বারা মহর্ষি আমাদিগকে বলিয়া গেলেন।

কিন্তু আমাদের কাছে ইহা কঠিনতা আনয়ন করিতেছে। আমি যতই এ বিষয়ে চিন্তা করি, ততই আমার কাছে এটা বড়ই কঠিন বোধ হয়। কেন কঠিন বোধ হয়, তাহাও বলা প্রয়োজন। যে পরিমাণে বর্তমান সময়ে দিন দিন জগতের সুখ ও ভোগ বাড়িয়া যাইতেছে, সেই পরিমাণে ইহা কঠিন হইতেছে। পূর্বকালে যতটা সাধনের প্রয়োজন হইত, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সাধনার প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ, যে পরিমাণে বিঘ্ন সেই পরিমাণে বলপ্রয়োগ না করিলে কার্যে সিদ্ধিলাভ হয় না। ব্রাহ্মসমাজ মহর্ষির সাধনার ভাব উপার্জন করিতে না পারিলে এ দুষ্কর কার্যে সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদের ধর্মভাব যদি গাঢ় না হয় তাহা হইলে তাঁহারা যে কাজে হাত দিয়াছেন তাহা তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হইবে না।

যে সরিষা লইয়া ভূত ছাড়াইবে, সেই সরিষাতেই যদি ভূত লাগে, তবে আর ভূত তাড়াবে কি দিয়ে? তোমরা যে ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠিত করবে বলছ, আরে! তোমাদেরই যদি আধ্যাত্মিকতা না হয়ে থাকে তবে তোমরা তা করবে কি দিয়ে? আমাদেরই যদি তেমন ব্যাকুলতা না হয়ে থাকে, আমাদেরই যদি ইহাতে তেমন আগ্রহ না হয়, আমাদেরই ইহার প্রতি তেমন দৃঢ় ভাব না এসে থাকে, তা হলে আমরা কেমন ক'রে আশা করব যে, ইহার দ্বারা আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক ব্যাধি দূর করব?

আজ মহর্ষির সাধনের কথা মনে করুন সকলে। তিনি যেমন ক'রে সাধন করেছিলেন, তা তাঁর আত্মজীবনী পড়লে জানতে পারেন সকলে। তা পাঠ করলে গায়ে কাঁটা দেয়, আপাদমস্তক বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে যায়। মনে হয়, যদি ধর্মকে ধরতে হয়, তবে এমনি ক'রেই ধরা উচিত। সকলে মুক্তা তোলার বিবরণ পাঠ ক'রে থাকবেন; সিংহল, জাপান প্রভৃতি স্থানে যে মানুষ মুক্তা তোলে, তার বিবরণ যখন আমি পাঠ করি, আমার সমুদয় শরীর একেবারে কণ্টকিত হয়ে যায়। সেখানে কি দেখি? প্রথমত দেখি উন্মোচন। শরীর হতে বস্ত্রাদি খুলে ফেলে দিচ্ছে। কাপড়খানা খুলে ফেললে, জামাজোড়া খুলে ফেললে; আর যা কিছু সব খুলে ফেললে, খুলে ফেলে দিয়ে ডুবে গেল সমুদ্রের গভীর জলে। সেখানে তার কত বিপদ, হাঙ্গরে কেটে নিয়ে যেতে পারে, অন্য কোনও জলজন্তু এসে তার অনিষ্ট করতে পারে। কিন্তু সে দিকে তার দৃষ্টি নাই। সে সেখানে নেমে মুক্তা কুড়ুচ্ছে— সেখানে সাড়া নাই, শব্দ নাই, প্রতি মুহূর্তে তার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কেবল বেঁচে থাকবার জন্যে নাকে একটা নল বেঁধে দিয়েছে, যা দিয়ে বাতাস যেতে পারে— আর কোনও দিকে তার দৃষ্টি নাই, সে শুধু মুক্তা কুড়ুচ্ছে।

আমি যখন মহর্ষির বিষয় চিন্তা করি, আমার যেন ঠিক তেমনি মনে হয়। মহর্ষির জীবনে প্রথম দেখি উন্মোচন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্পাদক, খুলে ফেললেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকতা, খুলে ফেললেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছেলে, খুলে ফেললেন পদমর্যাদা; সমুদয় খুলে ফেলে একেবারে ডুবে গেলেন। তলায় ডুবে গিয়ে যেন তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর কোনও কথায় তাঁর মন রহিল না। ঐ এক কথা, ঐ এক সাধন, ঐ এক চেষ্টা। আর সমুদয় যেন তাঁর কাছ থেকে চ'লে গিয়েছে। তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর কোনও দিকে মন নাই। তিনি কাজ করেছেন, কর্মক্ষেত্রে গিয়েছেন, মন বলেছে, "ও কি, ও কি, ও যে কিছু হ'ল না। আত্মপ্রসাদ যে এল না। কি করতে এসে কি করলাম। যার জন্যে সব ছাড়লাম, যার জন্যে সব ত্যাগ করলাম, তা কই? যে জিনিসের তপস্যায় সব ত্যাগ করলাম, যে জিনিসের সাধনার জন্য এত করলাম, তা আমার কই?" এমনি ক'রে মহর্ষি সাধন করতে লাগলেন, এমনি ক'রে মহর্ষি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। এমনি ক'রে খুঁজে খুঁজে যে মুক্তো পেলেন, তাই বুকে ধ'রে মহর্ষি উঠে এলেন। তিনি কি পেয়েছিলেন, কি বুকে ধ'রে মহর্ষি উঠে এসেছিলেন, তা প'ড়ে দেখবেন সকলে তাঁর আত্মজীবনের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। তিনি তখন সেই পরম বস্তু বুকে ধ'রে বেরিয়ে পড়লেন সকলের কাছে "আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি" এই কথা ব'লে। তিনি কি পেয়েছিলেন? ভারত-কৌস্তুভ পেয়েছিলেন, পরমার্থ পেয়েছিলেন, পরব্রহ্মের সন্ধান পেয়েছিলেন, ঈশ্বর-দর্শন পেয়েছিলেন। এমনি ক'রে মহর্ষি ধরেছিলেন, এমনি ক'রে সাধন করেছিলেন, তবেই তিনি দেখা পেয়েছিলেন,

তবেই পারমার্থিকতা তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবেই আধ্যাত্মিকতা তাঁর হৃদয়ে কাজ করতে পেরেছিল।

কিন্তু আমাদের সে সাধন কই ? সে তপস্যা কই ? সে ব্যাকুলতা এবং সে চেষ্টা কই ? এই জন্যই আমরা হারিয়া যাইতেছি, এই জন্যই আমাদের দ্বারা কিছু হইতেছে না। আমরা জগৎকে যাহা দিব বলিয়াছিলাম, আমরা জগৎকে যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা আমরা পারিয়া উঠিতেছি না। যাহারা মানব-জীবনে আধ্যাত্মিকতা স্থাপন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যাহারা পারমার্থিকতা জীবনে ফলাইয়া দেখাইবে বলিয়া জগতের কাছে ঘোষণা করিয়াছিল, তাহারা তাহা পারিয়া উঠিল না। পারিল না এই জন্য যে, এরা এটাকে শক্ত করিয়া ধরিল না। আমরা যদি ইহাকে শক্ত করিয়া না ধরি, আমাদের যদি ভাব এই হয় যে, এটা থাকিলেও হয়, গেলেও হয়, তবে আর কেমন করিয়া পারমার্থিকতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে ? তবে আর কিরূপে তাহা মানবসমাজে কাজ করিবে ? "ঈশ্বর একজন আছেন, মানব-জীবনের প্রভু এবং নিয়ন্তা একজন আছেন"— এই কথাটা বলবার জন্যে কি কতকগুলো মানুষের প্রয়োজন হয়েছে ? আমরা বলিলে তিনি থাকিবেন আর আমরা না বলিলে তিনি যাবেন, এই যদি হইত, তবে এটা আমাদের বলিবার প্রয়োজন ছিল। অথবা "জগতে আধ্যাত্মিকতা মস্ত জিনিস, আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেষ্ঠ জিনিস আর কিছু নাই"— এরূপ কথা বলিবার কি প্রয়োজন আছে ? আরে, আধ্যাত্মিকতা যে মস্ত জিনিস তা জীবনে করিয়া দেখাও, তা না হলে তোমাদের ও কথার দাম কি ?

আমরা ব্যক্তিগত জীবনে কি চাই ? আমরা জীবনে আশা চাই, বল চাই ; আমরা পাপ থেকে উঠে যেতে চাই, আমাদের কে তোলে ?

সেই জিনিসের জন্য আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে, সেই জিনিস আমাদের প্রাণে পেতে হবে, সেই জিনিসের জন্যে আমাদের ব্যাকুল অন্তরে অপেক্ষা করতে হবে। ধর্মকে যদি ধরিতে হয় তবে এমনি শক্ত ক'রেই ধরিতে হইবে। এর রাস্তা সোজা কিন্তু সাধন বড় কঠিন। মহর্ষি নিজে বলিয়াছেন, "আমি কোনও গুরুর কাছে ধর্ম পাই নাই, কোনও শাস্ত্রেতেও পাই নাই।" কি ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি ধর্মসাধন করিয়াছিলেন, কি একটা দৃঢ়তা নিয়ে তিনি ডুবেছিলেন, আর কোনও দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তেমনি করিয়া দৃঢ় হইয়া, তেমনি করিয়া ব্যাকুল হইয়া আমাদিগকে ধর্মকে ধরিতে হইবে, আমাদের ধর্মকে খাঁটি জিনিস করিয়া তুলিতে হইবে। এমন করিতে হইবে, যাহা না হইলে নয়, যাহা না হইলে আমাদের চলে না। মুখে ধর্মের কথা বলিলে আমাদের কি হইবে? গলা টিপলে যে আর তার সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাণ দিয়ে একে আমাদের ধরিতে হইবে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেমন করিয়া ধরিয়াছিলেন তেমনি করিয়া আমাদিগকে ধরিতে হইবে। এই জিনিস আমাদের আগে, তার পর আর সব, তার পর আর সমুদায়। এমনি করিয়া যাহাকে ধরিতে না পারি, এমনি করিয়া যার হাতে প্রাণ দিতে না পারি, তার আবার দাম কি?

সংসারে যেটা সবচেয়ে মানুষের দরকারি, যেটা সবচেয়ে কাজে লাগে, যেটাতে সবচেয়ে অধিক আয় হয়, সেটাকে কি মানুষ সর্বাগ্রে রাখে না? সেটাকে সর্বোপরি স্থাপন ক'রে তার পরে কি আর সব রাখে না? মনে কর, যেন একটা পরিবার, সেই পরিবারে কোনও এক ব্যক্তি, একজন পূর্বপুরুষ, একটা ঔষধ পেয়েছিলেন, স্বপ্নেতে যেন একটা ঔষধ পেয়েছিলেন; সেই ঔষধটাতে তাদের ভারি উপকার হয়, মাসে আড়াই শত কি তিন শত টাকা ক'রে তাতে আয় হয়। সেই ঔষধটা তাদের সব কাজে

লাগে ; ওলাউঠা, প্লেগ যে কোনও রোগই হোক না কেন, সবেতেই সেই ঔষধটা লেগে যায়। এই রকম যদি হয়, তা হলে কি দেখা যায়? দেখা যায় এই যে, পরিবারের যত লোক সবাই মিলে সেইটাতে মন দিচ্ছে, সেটাকে তারা ভোলে না, সেইটে তাদের আগে, তার পর আর সব। এই ত দেখা যায় মানুষ ক'রে থাকে। ওগো, জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি ধর্মকে তেমনি ক'রে ধরতে পেরেছ? তা যদি না পেরে থাক, ধর্মটাকে যদি তেমনি মূল্যবান্ ভাবতে না পেরে থাক, তবে দরকার কি আছে তোমাদের মুখে ধর্মের বড় বড় কথা বলবার? যদি না ভাবতে পার যে, ধর্ম তোমাদের অগ্রে আর বিষয় পশ্চাতে, তবে ব'লো না ধর্মের বড় বড় কথা লোকের কাছে। "আমরা বিষয়ও রাখব ধর্মকেও রাখব"— এমনতর লঘুভাবে যে ধর্মকে ধরে তার সে ধর্মের এক কড়ারও মূল্য হয় না। "ধর্ম আমার সর্বাগ্রে, তার পর আর সব"— এমন ক'রে শক্ত ক'রে যদি না ধরা যায়, এমন ক'রে কঠিন ক'রে যদি একে না ধরা যায়, তবে আর এ জিনিসের দাম কি?

লজ্জা দিন, লজ্জা দিন আজ মহর্ষি আমাদিগকে যে, আমরা ধর্মকে এমন লঘুভাবে, এমন হীনভাবে, এমন হালকা, পাতলা, ছোট ভাবে ধরেছি ; এবং আসুন সকলে, আজ ঈশ্বরচরণে প'ড়ে গিয়ে আমরা এই প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে তুলুন এই দুর্বলতা হতে, তুলুন আমাদিগকে এই লঘুতা হতে। উঠি আজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে স্মরণ ক'রে। তাঁর জীবনের যে কথা তিনি নিজ জীবনচরিতে লিখে গিয়েছেন, আজ তা স্মরণ করি। তাঁর আত্মজীবনচরিতে যে আদর্শের ছবি অঙ্কিত ক'রে রেখে গিয়েছেন, আজ তা স্মরণ করি। "বিষয় পশ্চাতে ধর্ম অগ্রে, বিষয় দূরে ধর্ম নিকটে"— এই তাঁর জীবনের মূল কথা। আজ স্মরণ করি সকলে তাঁর জীবনের মূল কথা। আজ স্মরণ

করি সকলে তাঁর জীবনের এই আধ্যাত্মিকতার কথা। তিনি কতবার কত বিপদে পড়েছেন, গৃহ হতে বহির্গত হতে হয়েছে, কিন্তু তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপও ছিল না। "যে যায় যাক যে থাকে থাক"— এই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। "খাও দাও, পেট পোর, আবার তার সঙ্গে একটু একটু ছিটেফোঁটা ধর্ম রাখ"— এমনি হালকা ভাবে যারা ধর্মকে ধরে তাদের কাজ নয় জীবনে আধ্যাত্মিকতা স্থাপন করা, তাদের কাজ নয় মানব-জীবনে ঈশ্বর-পূজা স্থাপন করা।

প্রতিজ্ঞা ক'রে ওঠ আজ সকলে যে, ব্রহ্মোপাসনা তোমরা গৃহে গৃহে এবং প্রতি জীবনে স্থাপন করবেই করবে। এমন হালকা, লঘু ভাবে ধর্মকে ধরতে নাই, অপরাধ হয়ে যায়, মহা অপরাধ হয়ে যায়। যেমন সাপুড়েরা সাপ খেলাতে এসে, দেখা যায়, এক এক মুঠো ধুলো কি একটা মন্ত্র প'ড়ে সাপের মাথায় দেয় আর সাপের মাথা হেঁট হয়ে যায়, তেমনি কি তোমরা মনে করেছ যে, ধুলো দিয়ে তোমরা জগতের পর্বতপ্রমাণ অবিশ্বাসের মাথা হেঁট ক'রে দেবে? না, না, না, এমন কথা কেউ মনে ক'রো না। এস সকলে, আজ স্মরণ করি মহর্ষির উপদেশ। তিনি বলেছেন, "ধর্মং চর, ধর্মাৎ পরতরং নাস্তি, ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাম্ মধু"— তোমরা ধর্ম আচরণ কর, ধর্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, ধর্ম সকল ভূতের মধু। আজ মুক্তিদাতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি কৃপা করুন আমাদের সকলকেই, তাঁর পবিত্র নাম-রূপ যে ধর্ম, সেই ধর্ম আমরা সাধন করি। এই যে পবিত্র নাম, এর সঙ্গে কারও বিবাদ নাই, ব্রহ্মের সঙ্গে কারও বিবাদ নাই, তাঁর সঙ্গে কারও বিরোধ নাই। এখানে এমন কেউ কি আছেন, যিনি বুকে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, "চাই না, আমি ঈশ্বরকে চাই না, আমার ঈশ্বরে প্রয়োজন নাই। মুক্তিদাতা ঈশ্বরের মুখ আমি দেখিতে চাই না"? এ কথা কে

বলতে পারেন? তাঁর সঙ্গে কারও বিরোধ নাই। আমাদের এই জাতিভেদ-প্রপীড়িত দেশে তাঁর নাম নিয়ে অনেক কথা-কাটাকাটি হয়েছে, নতুবা ঈশ্বরের নাম নিয়ে সম্প্রদায় হয় না। তাঁর সঙ্গে কারও বিবাদ নাই, সকলের সকল সময়ের বন্ধু তিনি। আসুন, সকলে আজ তাঁর চরণে প্রার্থনা করি, তাঁর চরণে মাথা রেখে আজ প্রতিজ্ঞা ক'রে উঠি, যাতে তাঁর পূজা আমাদের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যাতে তাঁর আরাধনা আমাদের প্রতি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। তাঁরই চরণে আমাদের আশা এবং তাঁরই চরণে আকাঙ্ক্ষা রাখি।

১৩১১

জাতীয় সাধনা

জগতের প্রাচীন জাতিসকলের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মহানদীর উপকূলেই বড় বড সহর-সকল স্থাপিত হইয়াছিল। সিন্ধু নদের উপকূলে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ফুটিয়াছিল, নীল নদের উপকূলে আদিম মিশর জাতির সভ্যতা বিকাশ পাইয়াছিল। এই যে নদী-সকলের উপকূলে নগর-সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নদী-সকল জগতে ত্রিবিধ কার্য সম্পাদন করিয়াছে। প্রথম, বিষয়-বাণিজ্যের বিস্তার দ্বারা জগতের ধনধান্য বৃদ্ধি; দ্বিতীয়, ভূমির উর্বরতা সম্পাদন; তৃতীয়, নগর-সমূহের সঞ্চিত আবর্জনারাশি ধৌত করা। এখনও নদী-সকল জগতে এই ত্রিবিধ কার্য সাধন করিতেছে। এখনও নদী-সকল বিষয়-বাণিজ্যের বিস্তার দ্বারা দেশের ধনধান্য বৃদ্ধি করিতেছে, ভূমির উর্বরতা সাধন করিতেছে ও নগর-সমূহের সঞ্চিত আবর্জনারাশি ধৌত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে।

কিন্তু সমুদয় নদীই এই কাজ করে না। জগতে দুই প্রকার নদী আছে। এক প্রকার নদী আছে, তাহার নাম গিরিনদী; অর্থাৎ পর্বতময় প্রদেশ হইতে যে ছোট ছোট নদী বাহির হয়, তাহা। দ্বিতীয়, মহানদী, যেমন গঙ্গা প্রভৃতি। গিরিনদী-সকলে অধিকাংশ সময় শুষ্ক বালুকারাশি মাত্র পড়িয়া থাকে, সামান্য অল্প জল ঝির্‌ঝির্ করিয়া বহিয়া যায়, তাহা হয়ত সামান্য শেয়ালটা কুকুরটা অনায়াসে পার হইয়া যাইতে পারে। আবার কখনও বা তাহাতে প্রবল জলধারা নামিয়া আইসে। দেখিলে বোঝা যায় না কখন জল হঠাৎ আসিয়া পড়ে। এমন শুনা গিয়াছে যে, অনেক সময় লোক নদীর মধ্যস্থান পর্যন্ত যাইতে না যাইতে মহাবন্যা হু হু করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, লোকগুলিকে আর চোখে কানে দেখিতে দেয় নাই, কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

এইরূপে অনেক মানুষ মারা গিয়াছে। আবার এক বা দু'ঘণ্টা পরে নদী যে শুষ্ক সেই শুষ্ক, আবার শেয়ালটা কুকুরটা পার হইয়া যাইতেছে, সেই প্রকাণ্ড জলধারার আর চিহ্ন মাত্র নাই।

গিরিনদীগুলি সর্বদাই শুষ্ক, মধ্যে মধ্যে জলধারা নামিতেছে, তাহাদের গভীরতা অতি অল্প, হয়ত আধ হাত জলও পাওয়া যায় না। কিন্তু মহানদীর প্রকৃতি আর-এক প্রকার ; যেমন পদ্মা, দেখিতে দেখিতে জল আসিল, সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল, আবার এক ঘণ্টা পরেই যেই সেই, এরূপ নয়। যে নদীতে পৃথিবীর বিষয়-বাণিজ্যের সাহায্য করিবে, নগরের সঞ্চিত আবর্জনারাশি ধৌত করিবে, মেদিনীর উর্বরতা সম্পাদন করিবে, সে মহানদীতে আধ ঘণ্টার মধ্যে তর্ তর্ তর্ ক'রে জল এল আবার দেখতে দেখতে চ'লে গেল, এ রকম হলে চলে না। সে নদীর জল ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ভাবে থাকে, সে নদী স্থিরগতি, তার জল সর্বদাই গভীর থাকে। সে নদী পাতলা নয়, অগভীর নয়।

চল, এখন একবার আমরা হরিদ্বারে যাই, চল গঙ্গোত্রীর মুখে যাই, যেখানে গঙ্গা বাহির হইতেছে, যেখানে জলরাশি পাথর কাটিয়া পাহাড়ের তলদেশ পর্যন্ত নামিয়াছে, যেখানে গিরিদুর্গ ভেদ করিয়া গঙ্গা নিরন্তর বহিতেছে। দিন নাই রাত নাই, গ্রীষ্ম নাই বর্ষা নাই, অবিরাম চলিয়াছে। সেখানে গঙ্গা কি গভীর, কি স্থিরগতি !

এই যে গিরিনদী ও মহানদীর দৃষ্টান্ত দিলাম, ইহা দিবার তাৎপর্য এই যে, যে স্রোতে জাতীয় জীবনের সম্পদ বাড়ায়, ইহার আবর্জনারাশি ধৌত করিয়া লইয়া যায়, ইহার উর্বরতা সম্পাদন করে, তাহা ক্ষণিক, হালকা, পাতলা স্রোত নহে। যে স্রোত প্রবাহিত হয়ে জাতীয় মহত্ত্ব, জাতীয় উন্নতি প্রভৃতিকে সংগঠিত করবে, যাহাতে মনুষ্যত্ব ফুটে উঠবে, রাজনৈতিক আন্দোলন বল, আর যা বল, তা গিরিনদীর ন্যায় পাতলা,

হালকা, লঘু হলে চলে না। তর্ তর্ তর্ ক'রে এল আর গেল, তার এমন হলে চলে না। যে স্রোতের দ্বারা জাতীয় আবর্জনা দূর করিতে চাও, জাতীয় জীবনকে উর্বরা করিতে চাও, জাতীয় জীবনকে ধনসম্পত্তিতে পূর্ণ করিতে চাও, তাহার আধ্যাত্মিকতার ও জাতীয় চরিত্রের গভীর ভূমি দিয়া প্রবাহিত হওয়া চাই। গিরিনদীর ন্যায় পাতলা, হালকা, অগভীর স্রোত দ্বারা তাহা কখনও হইবে না। যে স্রোত জাতীয় জীবনের গভীরতাকে স্পর্শ ক'রে এবং আধ্যাত্মিকতাকে বর্ধিত ক'রে চলিবে, তাহার দ্বারাই হইবে।

দুইয়ে আর দুইয়ে চারি হয়, এ কথা যেমন সত্য, আজ প্রাতঃকালে সূর্য উদিত হয়েছে, এ কথা যেমন সত্য, আজ এই ঘরে এতগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিতেছি, এ কথা যেমন সত্য— যে স্রোত জাতীয় জীবনে মহত্ত্ব, জাতীয় জীবনে মনুষ্যত্ব প্রভৃতি আনয়ন করিবে, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর, জাতীয় চরিত্রের উপর, মানব-প্রকৃতির উপর তাহার বনিয়াদ স্থাপন করা চাই, এ কথাও তেমনি সত্য।

"ভারত উঠ", "ভারত উঠ" বলিবামাত্রই ভারত যে অমনি ছেঁড়া ন্যাকড়া ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবে, তা মনে ক'রো না। যেমন ভিখারীরা ব'সে থাকে, একজন এসে বললে, "ওঠ", বলতেই যেমন ন্যাকডা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়— অনেকে দেখে থাকবেন— তেমনি কি "ভারত ওঠ" এই কথা বলতে না বলতেই ভারত উঠে দাঁড়াবে? তা কেউ মনে করিবেন না। "ভারত ওঠ" বললেই ভারত উঠিবে না। উঠিবার উপযুক্ত পায়ে যদি বল থাকে, হৃদয়ে যদি শক্তি থাকে, চরিত্রে যদি তেজ থাকে, সেরকম যদি মনুষ্যত্ব থাকে, তবেই উঠবে, নতুবা "ওঠ" বললেই ভারত উঠবে না। যে খোঁড়া তাকে যদি হাত ধ'রে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে কি সে দাঁড়ায়? আমরা তাকে ছাড়বামাত্র অমনি সে প'ড়ে যাবে। তেমনি দেশ

যদি খোঁড়া হয়ে থাকে, রসনার দ্বারা তাকে খাড়া করিতে পারিবে না। যেই তোমরা ছেড়ে দেবে অমনি আবার যে খোঁড়া সেই খোঁড়া। তাই বলি, যে নদী দেশের আবর্জনা-সকল দূর করবে, দেশকে উর্বরা করবে, দেশকে সমৃদ্ধিশালী করবে, তার পাথর কেটে গভীর, গভীর, অতি গভীর স্থান দিয়ে প্রবাহিত হওয়া চাই, জাতীয় আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ভিতর দিয়ে সেই স্রোত প্রবাহিত হওয়া চাই।

ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আদিম কালে পৃথিবীর এক এক দেশে এক এক সময়ে মহা মহা ঘটনা-সকল সংঘটিত হয়ে, এক এক বিপ্লব উপস্থিত হয়ে, মানব-সমাজ হইতে দুর্নীতি কুরীতি প্রভৃতি আবর্জনারাশি ধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, সেই সকল বিপ্লব উপস্থিত হবার পূর্বে মানব-আত্মাতে অতি গভীর স্থানে আরও বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

একজন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক তাঁহার রচিত গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা ইউরোপে যে-সকল পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা ইউরোপে যে কত পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। একটির উল্লেখ করিতেছি।

প্রচারিত হবার পূর্বে আদিম গ্রীক ও রোমান সমাজে শিশু-দিগকে হত্যা করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। বিশেষত যে-সকল শিশু দুর্বল ও বিকলাঙ্গ, তাহাদিগকে হত্যা করা হইত। যেমন এ দেশে রাজপুতদিগের মধ্যে কন্যাদিগকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাকে তাহারা পাপ মনে করিত না; ইংরাজ গভর্নমেণ্ট আইন করিয়া এবং অপর নানা উপায়ের দ্বারা এই প্রথা রহিত করিয়াছেন। যেমন পাঞ্জাবীদের মধ্যে প্রথা ছিল যে, কোনও গৃহস্থের গৃহে কন্যা জন্মিলে পাড়ার বৃদ্ধ স্ত্রীলোকেরা গিয়ে তার হাতে একটি কাঠি দিয়ে

এই কথা বলিতেন, "এবার ভাই পাঠায়ে দিস।" এই বলিয়া যেমন তাহাকে হত্যা করিত, তেমনি প্রাচীন রোমে ও গ্রীসে শিশুদিগকে হত্যা করার নিয়ম ছিল। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার হওয়ায় সে প্রথা রহিত হয়েছে, খ্রীষ্টধর্ম অপরাপর মহা কার্যের মধ্যে ইউরোপে এই শিশু-হত্যা নিবারণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকার ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম যে মানুষকে বলিয়া দিয়াছে যে মানবাত্মা অমর এবং তাহার উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ইহাতেই এই প্রথা রহিত রয়েছে। যেই এই সমাচার মানুষের কাছে ঘোষণা করা হ'ল, অমনি সেই মুহূর্ত হইতে মানব-আত্মার মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। প্রত্যেক শিশু মানুষের চোখে পবিত্র হইয়া গেল। শিশু ঈশ্বরের বিশেষ দান, ভগবানের চোখে সে মহামূল্য, এই জ্ঞান মানুষের মনে বসিয়া গেল।

শুধু কি তাই? খ্রীষ্টধর্ম আরও অনেক কাজ করিয়াছে। ইহাতে নারীর অবস্থা ফিরিয়াছে, ইহা বহুবিবাহ বন্ধ করিয়াছে, দাসত্ব-প্রথা উঠাইয়া দিয়াছে। কেমন করিয়া দাসত্ব-প্রথা উঠিয়া গেল? যেদিন হইতে কোনও ক্রীতদাস যীশুকে অবলম্বন করিল, সেদিন হইতে সে স্বাধীন হইল, সে বড় হয়ে গেল, তার আত্মার দাম বেড়ে গেল। খ্রীষ্টান হয়ে সে তার প্রভুর চেয়ে বড় হয়ে গেল। স্থূল কথা এই যে, খ্রীষ্টধর্ম মানব-আত্মার অমরত্ব প্রচার ক'রে মানবের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে, এবং তাহাতে বাহিরের বিষয়-সকলও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন যে, যেদিন জগতে এই কথা সর্বপ্রথম প্রচার হইল যে, একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আছেন, তাঁহাকে প্রীতির দ্বারা পূজা করিতে হইবে, সেই দিন ডেলফির মন্দিরের দেবদেবীদিগকে ঘণ্টা দিয়া বলিয়া দেওয়া হইল

যে, "এখন তোমরা প্রস্থান কর, আর তোমাদের প্রয়োজন নাই।" সেই দিন হইতে মানব-জীবনের সর্ববিধ বিষয়ে পরিবর্তন উপস্থিত হইল। স্থূল কথা এই যে, মানবের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে যদি বদলাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা দ্বারা মানবের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি অপর সর্ববিধ বিষয় পরিবর্তিত হইবেই হইবে।

কি কি কারণে আমাদের এ দেশ এ প্রকার দুর্বল ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন। বাহিরের উত্তর— বিদেশীয় জাতি আসিয়া অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছে, রাজনৈতিক অধিকার সব হরণ করিয়াছে; আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ-কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছি; রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধীনতা না থাকাতে আমরা এত দুর্বল এবং অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। ভিতরের উত্তর এই যে, আমরা এত দুর্বল এবং অসহায় হইতাম না, ঝগড়া এবং বিবাদ থাকিত না, বিদেশীয় জাতির পদদলিত হওয়াও ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না, যদি ইহাদের আত্মার মধ্যে এই সকল দুর্বলতার বীজ না থাকিত।

এই বীজের বিষয় চিন্তা করিলে আমার তিনটি বিষয় মনে পড়ে। প্রথম, এক বিকৃত অদ্বৈতবাদ, জীব ও ব্রহ্মে ঐক্য। এই বিকৃত অদ্বৈতবাদের জাল বিস্তার করিয়া দেশের লোক তাহাতে এমনি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে তাহার বাহিরে যাওয়া আর তাঁহাদের শক্তিতে কুলাইতেছে না। বিকৃত অদ্বৈতবাদ বলিতেছি এইজন্য যে, একটা প্রকৃত অদ্বৈতবাদ আছে যাহাতে বলে, সত্য বস্তু দুই নয়, এক। আমরা সব আপেক্ষিক সত্য, তিনিই নিরপেক্ষ সত্য। তিনি সত্যতা দিয়াছেন, এইজন্যই আমরা সব সত্য হয়েছি, তাঁকে ছেড়ে আমরা সত্য নই। তিনি যথার্থ সত্য, স্বাধীন সত্য, সত্যের সত্য,

নিরপেক্ষ সত্য, স্বয়ম্ভূ অনাদি সত্য, আমরা সব তাঁর ইচ্ছাতেই সত্য হয়েছি। এখানেও সেই একই মানিতেছি ; কিন্তু যে বিকৃত অদ্বৈতবাদ বলে, জীব আর ব্রহ্ম এক, তাহা মানিতেছি না। যাতে বলে, এ-সব মায়া, যা কিছু দেখ সব মায়া, এ-সব রজ্জুতে সর্পভ্রম, মানবাত্মা সত্য নয়— এ কথা যে অদ্বৈতবাদে বলে সে অদ্বৈতবাদ মানি না। তাতে এ দেশের মহা অনিষ্ট সাধন করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক রূপে পাপ ও নৈতিক অবনতি আনয়ন করেছে, এবং পুণ্যের উজ্জ্বল জ্ঞানকে ম্লান করেছে। ধর্মের এই এক মহা কার্য যে ইহা মানবাত্মাকে উন্নত করে, পাপ হইতে রক্ষা করে, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মায় এবং প্রবৃত্তি-সকলকে সংযত করে। কিন্তু এই যে বিকৃত অদ্বৈতবাদ, যার কথা পূর্বে ব'লে এসেছি, ইহা মানবাত্মাকে হীন করেছে, পুণ্য হতে তাকে ভ্রষ্ট করেছে। ধর্মের কাজ এই যে, ইহা মানব-অন্তরে পাপে অরুচি ও পুণ্যে রুচি জন্মায়, এবং সাধুতার প্রতি আদর আনয়ন করে। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ ভেদজ্ঞান রহিত করিতে গিয়া পাপ ও পুণ্যের জ্ঞানকে অনুজ্জ্বল করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, আর-একটি কারণে এই জাতি হীন ও দুর্বল হইয়াছে। সে হ'ল ধর্মের সমাজবিমুখতা। আমাদের দেশের সাধকদিগের ভাব এই যে, জনসমাজে থেকে উচ্চ ধর্ম সাধন হইতে পারে না। তাঁরা বলেছেন, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ", কেই বা তোমার স্ত্রী, কেই বা তোমার পুত্র, এ-সব কিছু না, এ-সব ধোঁকার টাটি, তুমি এ-সব পরিত্যাগ কর। পরিত্যাগ ক'রে, যদি উচ্চ ধর্মকে অন্বেষণ কর, তবে নির্জনে যাও, নির্জনে গিয়া ধর্মকে সাধন কর। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্মভাবাপন্ন লোক যাঁরা সমাজে ছিলেন, তাঁরা সব জনসমাজ হতে চলিয়া গেলেন, শুধু বিষয়বুদ্ধি-বিশিষ্ট যে-সব মানুষ

তাঁরা পড়িয়া রহিলেন। ধার্মিকেরা সব বনে গিয়া পাহাড়ের গুহায় বসিয়া ধর্মকে সাধন করিতে লাগিলেন, আর অন্য লোক এখানে পড়িয়া রহিল। যাঁরা জনসমাজে থাকিলে কত কল্যাণ হইতে পারিত, মানব-সমাজ কত উপকৃত হইতে পারিত, হায়, হায়, তাঁদের ছাড়িয়া জনসমাজের কি ভয়ানক অনিষ্টই হইয়াছে!

এই সমাজবিমুখতার ফলে আরও এই অনিষ্ট হইয়াছে যে, জন-সমাজের উন্নতির জন্য কোনও চেষ্টা হয় নাই। আমাদের ধর্মসাধন জনসমাজের উন্নতি নয়, কিন্তু নির্জন সাধনায়; মানব-সমাজের যাহাতে কল্যাণ হয় সেরূপ প্রয়াসে নয়, কিন্তু নির্জনে একাকী ধ্যান ও তপস্যাতে। এজন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হয়। একটা দৃষ্টান্ত হয়ত আমি অনেক বার দিয়া থাকিব। সে এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন লোক হরিদ্বার হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত শুইয়া শুইয়া গিয়াছিল। ইহা এক প্রকার সাধন। যেমন সকলে দেখিয়া থাকিবেন, অনেক লোক বড়বাজার হইতে কালীঘাট পর্যন্ত শুইয়া শুইয়া যায়, তেমনি সে ব্যক্তি নয় বৎসরে এই কাজ করিয়াছিল। ভাবুন ত, কতটা স্বার্থত্যাগ, প্রাণের কতটা আগ্রহ, ধর্মের জন্য কতটা দৃঢ়তা। কুম্ভের মেলায় যান, দেখিবেন সেখানে কত লোক ঊর্ধ্ববাহু হইয়া রহিয়াছে, কেউ হয়ত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া হাতখানা উঁচু করিয়া রাখিয়াছে, এই এক প্রকার সাধন। আবার যান, ঐ গোদাবরী-তীরে যান, সেখানে হয়ত দেখিবেন কেউ গজালের শয্যা পাতিয়া দশ বৎসর ধরিয়া তাহাতে শুইয়া ধর্মসাধন করিতেছে। ধর্মের জন্য এঁদের যে এই স্বার্থত্যাগ ও বৈরাগ্য, এ যদি মানবের সেবায় নিযুক্ত হইত, যদি পৃথিবীর উপকারে ইহা আসিত, তবে না জানি তদ্দ্বারা পৃথিবীর কত কল্যাণই হইত।

মানবের সেবাই যে ঈশ্বরের সেবা, এ ভাব এ দেশে ফুটে নাই। সমাজের উন্নতিতে যে ধর্মের স্ফূর্তি, এ ভাব এদেশীয় ধর্মচিন্তায় প্রবেশ করে নাই।

সমাজবিমুখতার আর-এক অনিষ্ট ফল এই হইয়াছে যে, এ দেশের আপামর সাধারণ সকলের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ধর্ম ব্যক্তিগত জিনিস। ইহার যে একটা সামাজিক দিক আছে, সে বিশ্বাস আমাদের দেশের লোকের নাই। প্রত্যেক উপাসক একা একা মন্দিরে গিয়া তাঁহার ইষ্ট দেবতাকে ফুল দিবেন, সেখানে গিয়া একা একা তাঁর পূজা করিবেন, তৎপরে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু দশজনে মিলিত হইয়া যে ধর্ম করা যায়, সে বিশ্বাস তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই; সামাজিক সাধনার ভাব তাঁহাদের অন্তরে ফুটে নাই। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, দেশে সদনুষ্ঠান-সকল একা একা করা হইয়াছে, ধর্মচিন্তা একা একা করা হইয়াছে, পরোপকার একা একা করা হইয়াছে, খাতপূর্তাদি খনন, রথ্যা পান্থশালাদি নির্মাণ, মন্দিরের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি একা একা করা হইয়াছে। সকল প্রকার ভাল ভাল কাজ এ দেশের মানুষ একা একা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। পাঁচজনে একহৃদয় হয়ে যে কাজ করা যায়, সে ভাব ইঁহাদের অন্তরে জাগে নাই। ধর্মের এই ব্যক্তিগত একাকিত্ব কেবল ধর্মের এই সমাজবিমুখতা-নিবন্ধন। এই কারণে এখানে সামাজিক উদ্দেশ্যে একতা-প্রবৃত্তি ফোটে নাই, অপরাপর কারণের মধ্যে এ কারণেও জাতীয় একতা দুর্ঘট হইয়াছে। আজ স্বদেশপ্রেমিকগণ একতা-সূত্রে দেশকে বাঁধিতে চাহিতেছেন; ধর্মের সমাজবিমুখতা ও তজ্জনিত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র-প্রবৃত্তি তাহার পথে মহা বিঘ্ন রূপে দণ্ডায়মান।

তৃতীয় কারণ, নিয়তিতে বিশ্বাস। এই নিয়তিতে বিশ্বাস থাকার দরুন এ দেশের লোক একেবারে শক্তিহীন, উদ্যমহীন হইয়াছে এবং ইহারা বিশ্বাস করে যে, কপালে যাহা লেখা আছে তাহা হবেই হবে।

এই বিশ্বাস এদের সমুদয় উদ্যম, সমুদয় চেষ্টা একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছে, এবং এ জাতিকে একেবারে নিরাশ, অবসন্ন, নিস্তেজ ও ভগ্নোদ্যম করেছে। যত কিছু সৎ চেষ্টা মহৎ প্রয়াস, সমুদয়ে এদের মন একেবারে নিরাশ, নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ। এদের মনে মনে বিশ্বাস আছে, কপালে যা আছে তাই হবে, ও-সব বৃথা আয়োজন, ও-সব ক'রে কিছুই হবে না। দশজনে মিলে, দশজনে এক হয়ে কোনও একটা মহৎ কাজ ক'রে তোলা যায়, এদের হঠাৎ এ বিশ্বাস হওয়া কঠিন। মনে মনে বলবে, "ও-সব বৃথা চেষ্টা।" দেশে অজন্মা হয়েছে, তা দূর করার জন্য যে কোনওরকম চেষ্টা করা, তা এরা করবে না। বলবে, "ভগবান্ করেছেন, কি আর হবে। কপালে যা ছিল তাই হয়েছে।" এই যে অতিরিক্ত কপালে বিশ্বাস, এতে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে এই ভৌতিক জগতের কর্মশৃঙ্খলে একেবারে বেঁধে রেখে দিয়েছিল। এতে তাঁরা যেন একেবারে হাতপা-বাঁধা হয়ে এই জগতে বাস করেছিলেন। যা হোক, এই বিশ্বাস হিন্দু জাতির হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে, তাদের অস্থি-মজ্জাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এতে তাদের হাত পা যেন একেবারে বেঁধে রেখে দিয়েছে।

তৎপরে আর-এক কারণে আমাদিগকে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছে। সেটি সামাজিক কারণ। এই সামাজিক কারণ বিদ্যমান থাকাতে আমাদের সর্বনাশ হইয়া যাইতেছে। সেটি এই যে, আমাদের মধ্যে এই একটা ভাব প্রবল আছে যে, সব মানুষের সমান অধিকার নয়। সমাজের কোনও কোনও লোকের হাতে নেতৃত্ব থাকিবে, আর অপর সকলে তাহাদের চালনা স্বীকার করিতে ও তাহাদের অধীন থাকিতে বাধ্য। এতেও মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। নারীকে পুরুষের অধীন থাকিতেই হইবে। মনু বলিয়াছেন, স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল প্রভৃতি বেদের

উচ্চারণ পর্যন্ত শুনিতে পাইবে না। উচ্চ জ্ঞান তাহারা পাইতে পারে না। স্ত্রীলোকের পুরুষের অধীনে থাকাই ধর্ম, শূদ্রের দাসত্বই প্রধান কার্য। নারীর এই বন্ধনদশা ও হীনজাতীয়গণের এই হীনদশার ফল এই হইয়াছে যে, এ দেশের লাখ লাখ, কোটি কোটি পুরুষ ও নারী, তারা ছোট হতে হতে, দাসত্বতে নামিতে নামিতে মনুষ্যত্ব হতে একেবারে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। এই সকল মানুষের যে অবস্থা, এই দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকের যে দুর্দশা, তা স্মরণ করিলে চোখে জল আসে। হায় হায়, এতগুলি ঈশ্বরের সন্তান, এতগুলি অমরাত্মা ফুটিতে পেলে দেশের কতই মঙ্গল হইত! মানুষের মত মানুষ দেশে কই? অনুসন্ধান করিলে ত দুটি চারিটির অধিক আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দুজন চারিজন ছাড়া এই কোটি কোটি লোক প'ড়ে আছে, তাদের মনুষ্যত্ব ফুটিতে পারিতেছে না। তাদিগকে হীন ক'রে রেখে দিয়েছে। তারা ফুটিলে দেশ কত বড় হয়ে উঠত! জাতিভেদ-প্রথা এ দেশকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, দুর্বল ও হীনপ্রভ করিয়া রাখিয়াছে।

তার পর স্ত্রীজাতির কথা আর কি বলিব? তাদের যে আমরা কি শোচনীয় অবস্থায় রেখে দিয়েছি, তা আর কি বলিব? তারাও সকলে সেজন্য একেবারে নিস্তেজ, উদ্যমহীন ও হীনপ্রভ হয়ে রয়েছে।

এখন আপনারা ঐ দেখুন, একটা নদী নামিয়াছে। গঙ্গোত্রীর কাছে দেখুন, এক নদী নামিয়াছে, পাথর কাটিয়া, মানবাত্মার গভীর স্থান দিয়া, এক নদী প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ঐ দেখুন উনবিংশ শতাব্দীর ভগীরথ রামমোহন রায় এক নদী নামাইয়া আনিয়াছেন। ইহা স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় ক্ষণিক নয়। ইহা জাতীয় চরিত্রের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। উপরে যে-সকল রোগের নাম করিয়াছি, ঐ সব রোগেরই ঔষধ ইহার ভিতর আছে। কিছু দিন হইল, এক ব্যক্তি

আমার নিকট গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গার এত মাহাত্ম্য কেন? তিনি বলিলেন, "দেখুন, গঙ্গার জলে সব রোগের ঔষধ আছে।" তিনি ইংরেজি-জানা লোক, তিনি বলিলেন, "গঙ্গার জলে এমন সকল স্বাস্থ্যকর ingredients আছে, যাতে শারীরিক সকল প্রকার ব্যাধিই দূর হতে পারে।" যাই হোক, গঙ্গার জলে এই সকল ingredients আছে কি না আমি জানি না। কিন্তু আমি যে ভক্তিগঙ্গার কথা বলিতেছি, তাতে আছে, আমি তাহা জানি। আধ্যাত্মিক সকল প্রকার ব্যাধিই দূর করিবার মত জিনিস তাহাতে আছে।

তাতে কি কি ঔষধ আছে? প্রথম যে বিকৃত অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি, তাহার ঔষধ আছে। আমরা শুধু জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-সম্বন্ধ প্রচার করিতেছি না, কিন্তু উপাস্য ও উপাসক -সম্বন্ধ প্রচার করিতেছি। আমরা বলিতেছি, মুক্তিদাতা ঈশ্বর, তিনি মানুষকে পাপ হইতে রক্ষা করেন,তিনি পাপ হইতে উদ্ধার করেন। প্রেম দ্বিতীয় ব্যক্তিকে চায়, প্রেম প্রেমাস্পদকে চায়, সুতরাং প্রেমের ধর্ম অদ্বৈতবাদের ধর্ম নহে। আমরা ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া যে ধর্ম প্রচার করিতেছি, তাহা ভক্তিধর্ম; সুতরাং, ইহা বিকৃত যে অদ্বৈতবাদের কথা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহার ঔষধস্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, ধর্মে সমাজবিমুখতা। ব্রাহ্মসমাজ একেবারে ইহার বিপরীত মত জগতে প্রচার করিতেছেন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের কর্ণে এই মন্ত্র প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন যে, The service of Man is the service of God— মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। ব্রাহ্মেরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন এবং ইহা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার ফল অতি উচ্চ, অতি মহৎ। আবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ইহারই অনুরূপ কথা

বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব", তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষা দিয়াছেন যে, ধর্মের ক্ষেত্র সমাজে। সমাজ-মধ্যে যাহাতে পরমেশ্বরের উপাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার চেষ্টা কর, মানবের সেবা কর, পৃথিবীর পাপতাপ দূর কর, ভগবদ্‌ভক্তি বৃদ্ধি কর, তাঁহার সেবা কর, তাঁর আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ কর, নরনারীর যাহাতে কল্যাণ হয় তাহার উপায় বিধান কর। ধর্মের সমাজ-বিমুখতা ব্রাহ্মসমাজ নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

তৃতীয়ত, নিয়তি। এই নিয়তির পাশ ছেদন ক'রবার ভারও ব্রাহ্মসমাজ লইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছেন, "পাপকারী পাপোভবতি", যে পাপ করে, সে পাপই হয়। তুমি যদি আপনার শক্তি-সকলের বিকাশ না কর, তুমি যদি আপনাকে অধম করিয়া রাখ, তবে তুমি ঈশ্বরের কাছে দায়ী। তিনি তোমাকে যে শক্তি ও সুবিধা দিয়াছেন, তাহার ব্যবহার করিতে তুমি তাঁহার চরণে দায়ী। যদি তুমি না কর, তুমি যদি আপনাকে ছোট কর, তুমি যদি স্বার্থপর হয়ে আপনাকে ক্ষুদ্র কর, তুমি যদি আপনার শক্তি-সকলকে নষ্ট কর, তবে তুমি ঈশ্বরের কাছে অপরাধী। তুমি আপনার শক্তি-সকলের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে ঈশ্বরের কাছে দায়ী, এই ভাব ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষা দিয়াছেন। এই মানবাত্মার দায়িত্ব-জ্ঞান, যাহার অভাবে ধর্মকর্ম, রীতিনীতি, আইন-আদালত কিছুই থাকে না, ইহা এদেশীয় প্রজাসাধারণের চিত্তকে কঠিন নিয়তি-পাশ হইতে মুক্ত করিবে।

তবে বলি, পরপদতলে দলিত হয়ে কে আছ, নানা প্রকার শক্তির সংঘর্ষণে আপনাকে ক্ষুদ্র জেনে হীন হয়ে কে আছ? শোন, তোমাদের কাছে ব্রাহ্মসমাজ এই নূতন সমাচার আনিয়াছেন—

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।

ওগো, ব্রাহ্মসমাজের নারীগণ! বল, এ বাণী শুনিয়া কি তোমাদের আনন্দ হয় নাই? আজ ঈশ্বরকে দু'হাত তুলিয়া তোমরা ধন্যবাদ কর যে, তোমাদের জীবনের পথে অন্ধকার ছিল, তিনি তাহা দূর করিয়া তোমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তোমরা কি বিশ্বাস কর না যে, ভগবান্ তোমাদের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন? তোমরা আশান্বিত হও, তোমরা উঠ, তোমরা উঠিবার জন্য সংগ্রাম কর। তোমরা উঠিলে দেশ উঠিবে, তোমরা জাগিলে দেশ জাগিবে, তোমরা বড় হলে তোমাদের সঙ্গে আমরাও বড় হব।

ভারতের সমুদয় অনুন্নত জাতি এবং নারী জাতি, তোমরা শোন, তোমাদের জন্য ব্রাহ্মসমাজের ঐ বাণী আসিয়াছে। তাই বলিয়াছি যে, সমুদয় জাতীয় ব্যাধির ঔষধ এই গঙ্গার জলে আছে। ঈশ্বরের চরণে যে স্বাধীনতা, সেই হ'ল আসল স্বাধীনতা, সেই হ'ল যথার্থ স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতার পথ ব্রাহ্মধর্ম খুলিয়া দিতেছেন। ভগবান্কে পাইবার যে উচ্চ অধিকার, জগতের কল্যাণ-সাধন করিবার যে মহা অধিকার, তার পথ ব্রাহ্মসমাজ করিয়া দিতেছেন। তাই বলিতেছি, সর্বপ্রকার জাতীয় ব্যাধির প্রতিকারের বীজ এই ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে নিহিত আছে।

তবে কি এ ধর্মের জন্য ভগবান্কে ধন্যবাদ করব না? তবে এ ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য আমরা কি ভাল ক'রে চেষ্টা করব না? যদি কেউ একটা কৌটা দিয়ে ব'লে দেয়, "দেখ, এই যে কৌটাটি দিচ্ছি, একে ভাল ক'রে, খুব সাবধান ক'রে রেখ। এতে কলেরা, বসন্ত, সকল রকম রোগের ঔষধ আছে।" এই ব'লে একটা কৌটা যদি কেহ হাতে দেয়, আর যদি আমরা সেটাকে হারিয়ে ফেলি, যদি আমরা গোলমালে

সেটাকে যত্ন ক'রে রাখতে ভুলে যাই, তা হলে সে মানুষ আমাদের কি বলে? এই কথা কি বলে না যে, "ধিক্ তোমাকে, তুমি এমন মানুষ! এমন একটা জিনিস তোমার হাতে দিলাম, সেটাকে তুমি নষ্ট করলে? ধিক্ থাক্ তোমাকে।" তেমনি পরমেশ্বর যদি এই ব'লে ব্রাহ্মদের ধিক্কার দেন যে, "এমন একটা জিনিস তোমাদের হাতে দিলাম, যাতে সকল প্রকার জাতীয় ব্যাধির ঔষধ ছিল, তোমরা সেটাকে রাখতে পারলে না, তোমরা তার উপযুক্ত হলে না—ধিক্ থাক্ তোমাদিগকে", এই কথা ঈশ্বর যদি বলেন, তবে আমরা কি বলিব? এ কথা ত তিনি বলিতে পারেন। আমরা ত এ মহৎ জিনিসের উপযুক্ত হই নাই, আমরা ত ইহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি নাই।

তবে আজ ব্রত নেও। আজ ব্রত নেবার দিন। কাদের ব্রত নেবার দিন? যাদের প্রতি ভগবান্ এই মহৎ জিনিস রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, তাদের বলছি। আজ তোমাদের ব্রত নেবার দিন, আজ ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া কাঁদিবার দিন। আজ বল এই কথা, "ঠাকুর, মাপ কর, মাপ কর, অপরাধ মাপ কর। তোমার মহৎ জিনিস হাতে পেয়ে আমরা ভাল ক'রে তার যত্ন করি নাই, তুমি আজ মাপ কর। যে কৌটা তুমি আমাদের হাতে দিয়েছিলে, যাতে সকল প্রকার জাতীয় ব্যাধির ঔষধ ছিল, যাহাতে ভারতের সর্ববিধ দুর্দশার প্রতিকারের ঔষধ ছিল, আমরা বুঝিতে পারি নাই, না বুঝিয়া আমরা তার প্রতি উদাসীন হইয়াছি। আমাদের এ অপরাধ তুমি মাপ কর।" এই কথা তাঁকে বলি, আজ তাঁর কাছে মাপ চাই। আজ বলি, "হে ঈশ্বর, আমরা অপরাধ করেছি, তোমার কাজের মহিমা না বুঝে আমরা অবোধের মত আপনাদের আরাম ও সুখ খুঁজেছিলাম। তুমি ডাকিলে আমাদিগকে তোমার কাজে, আমরা সে ডাক শুনিলাম

না। তুমি তোমার নিশান হাতে দিয়ে আমাদের দিয়েছিলে তোমার কাজে দাঁড় করিয়ে, যাই চারিদিক হতে গোলাগুলি পড়ল, অমনি তা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে পড়লাম। তুমি মাপ কর আমাদের এ অপরাধ। আজ মাপ কর, ভগবান্।" এই কথা আজ বলতে হবে। আজ বলি, "ভগবান্, তুমি কি চাও? আমাদের শক্তি চাও? এই নেও তুমি শক্তি। তুমি ধন চাও? এই নেও ধন। কি তুমি চাও? শ্রম চাও? এই নেও। যা চাও তাই দেব।" এই কথা আজ তাঁকে বল। বলবে না? অনেক সময় ঘরে আগুন লাগলে মানুষ কি করে? দেখি এই, দলে দলে লোক সব ছুটছে। সবাই ব্যস্ত আগুন নেবাবার জন্যে, যার যা শক্তি আছে সে তাই দেয়। কেউ হয়ত দেখি একটা টব হাতে নিয়ে গিয়ে জলে নেমেছে, কেউ আরও কিছু করছে। সবারই লক্ষ্য সেই দিকে। আপনাদের সব ভুলে যায়। আর যারা শুধু মুখে বলে, "কর্-না, কর্-না, কর্, কাজ কর্," এই কথা যারা বলে, আর নিজেরা জলে নামে না, পাছে কাপড় ভেজে, পাছে গায়ে জল লাগে, তাদের দ্বারা কাজ হয় না। তেমনি যদি তোমরা আপনাদের কাপড় সামলাও আর লোককে বল "কর্-না, কর্-না, কাজ কর্," তবে তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না।

আজ ব্রত নেও। আজ ব্রত নেবার দিন। বেশি না পার, অন্তত এক বৎসরের জন্য ব্রত নেও। এক বৎসরের জন্য ব্রত নেওয়া যায় না? নারীরা অনেক সময় চৌদ্দ বৎসরের, কেউ দশ বৎসরের জন্য এক একটা ব্রত নিয়ে থাকেন। তোমরা পারবে না? তোমরা অন্তত এক বৎসরের জন্য ব্রত নিতে পারবে না? বল আজ এই কথা— ব্রাহ্মসমাজের যেখানে যা প্রয়োজন আছে, যেখানে যা দরকার হবে, তা আমরা করব। তবে নিন সকলে ব্রত, করুন সকলে প্রতিজ্ঞা। মাঘোৎসব সার্থক হউক।

১৩১২

প্রকাশ-মন্দির

প্রকাশ-মন্দিরের কথা পূর্বে কিছু বলেছি। সেদিন বলেছিলাম, কলিকাতায় যে মেলা হয়েছে, তাতে অনেক দেখবার জিনিস আছে, কত ঘর সুন্দররূপে সজ্জিত, কিন্তু উহার মধ্যে একটি কি দুইটি ঘর সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা দেখে সকলেই মুগ্ধ হচ্ছেন এবং বাহিরে এসে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন, "আহা, অমুক ঘর!" তার পর কেহ যদি সেই দু-একটি ঘর না দেখে বেরিয়ে এসে শোনেন এই কথা, তখন তিনি মনে করেন, "হায় হায়, এমন ঘরটা দেখলাম না! আমার মেলায় যাওয়াটাই বৃথা হইল।" অপরেও তাঁর কথা শুনে বলেন, "তুমি মেলায় গেলে, সেটা দেখলে না?" এই ব'লে লজ্জা দেয়।

আমাদের এই মাঘ-মেলায়, এই উৎসবেও, দেখবার অনেক জিনিস আছে। এই মন্দির পত্রপুষ্পাদির দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে, ইহা দেখবার জিনিস; ভক্তিভাবে পূর্ণ ব্যাকুল নরনারী রাত্রি ৩।৪টা হতে মন্দিরে সমাগত, এ দেখবার জিনিস; বালকবালিকার সুমধুর সমতান সংগীত, পশ্চাতে আনন্দবাজারের আনন্দ-ভবনের আয়োজন, দেখবার জিনিস; বালকবালিকাগণ আনন্দে প্রাঙ্গণে খেলিতেছে, ইহাও দেখবার জিনিস। দেখবার জিনিস অনেক আছে; কিন্তু একটি বিশেষ জায়গা না দেখলে সব বৃথা, উৎসবে আসাই বৃথা। যে সে জায়গা না দেখিল তাকে বাহিরে গিয়ে লোকের লজ্জা দেওয়া উচিত, "সেই ঘরটাই দেখলে না, তবে এসেছিলে কেন ভাই?"

এই মহোৎসবের মহামেলায় এমন ঘর কি আছে? তাহার নাম প্রকাশ-মন্দির। সেই মন্দিরে প্রবেশ করা চাই। যদি কেহ না করেন, তাঁর সব বৃথা। এই কথা যখন বলছি, সকলের মন যেন উৎসাহিত হয়, "সে মন্দির কোথায়?" যেমন মেলায় গিয়ে লোকে সেই বিশেষ ঘরের

কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "হাঁ গা, সে ঘরটা কোন্ দিকে গা?" তেমনি ব্যাকুল প্রাণে উৎসুক হয়ে অন্বেষণ করতে হবে, সেই প্রকাশ-মন্দির কোথায়? সেই মন্দিরকে প্রকাশ-মন্দির বলেছি এইজন্য যে সেখানে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখতে হবে। মেলায় এ জিনিস, ও জিনিস, নানা জিনিস দেখবার থাকে, এখানে একমাত্র দেখবার জিনিস প্রকাশ-মন্দিরে পরব্রহ্ম। চশমা দিয়ে কলিকাতার মেলায় সব জিনিস দেখতে হয়, এখানে চশমা খুলে চোখ মুদে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশ ক'রে এক অদ্ভূত ব্যাপার দেখা যায়।

প্রথমত দেখা যায়, ঋষিদের ভাষায়, "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।" তিন হাজার বৎসর হতে এই কথা ব'লে আসছেন, 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে', আত্মাতে, 'বিরজ', রজোরহিত ব্রহ্মকে দেখতে হবে। ঋষিরা আর এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ভাষা পান নাই।

সেখানে ব্রহ্মকে দেখলে কি হবে? উদ্বোধনে বলেছিলাম, সেখানে গেলে মুখ ফিরে যায়— যে মন সংসারের দিকে ছিল তা ভগবানের দিকে ফিরে যায়। সে কি রকম? আমরা কি সন্ন্যাসী হয়ে সংসারের বাহিরে চ'লে যাব? আমাদের কি জঙ্গলে যেতে ইচ্ছা হবে? একেই কি মুখ-ফেরা বলছি? তা নয়। অর্থ পরে বলছি।

এখানে প্রবেশ করলে সংসারে এতদিন যাহা দেখছিলাম, তার বিপরীত অনেক ব্যাপার দেখা যায়। এই প্রকাশ-মন্দিরের ব্রহ্মকে দেখলে কি রকম হয়? ঋষিরা বলেছেন, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি", হৃদয়ে ঈশ্বর ও ধর্ম-বিমুখ যত বাঁধন আছে সব ছিঁড়ে যায়, খুলে যায়। কারও মন ধনে বাঁধা, কারও মন মানে বাঁধা, কারও মন ইন্দ্রিয়-সুখে বাঁধা— নানা ভাবে নানা বিষয়ে বাঁধা ব'লে ধর্মকে পায় না; ধর্মকে আশ্রয় করতে গেলে ভিতরের ধনমানের বাঁধন বলে, "এর বেশি আর

না।” মানুষ যতক্ষণ ধনমান ইত্যাদিতে বাঁধা থাকে ততক্ষণ সংসার-রাজ্যে থাকে। প্রকাশ মন্দিরে এসে প্রথম এই সব দড়ি খুলে যায়। কলিকাতায় গঙ্গায় যখন বান ডাকে, মাঝিরা কাছি খুলে দেয় ধাক্কা সামলাবার জন্য। তেমনি ভগবানের কৃপার রাজ্যে এসে দাও, দড়ি খুলে দাও, সেই প্রেম ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

আর কি হয়? “ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ”, সব সংশয়-সন্দেহ দূর হয়। এক-একবার কিছুক্ষণের জন্য পাপের জয় দেখে সংসারীদের মনে হয়, “ও সত্যের জয় টয় কিছু নয়। একজন জালজুয়াচুরি ক’রে, একটি বিধবাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে বড়মানুষ হ’ল, তার কোনও অনিষ্ট হ’ল না। কেহ যে উপরওয়ালা আছে, পৃথিবীতে যে ধর্মের শাসন আছে, পাপীর শাস্তি যে হয়, সেই বিষয়েই সন্দেহ। ধর্মের শাসনে কি ক’রে বিশ্বাস করব, অথবা বিশ্বের মূলে যে প্রেম আছে তাই বা কি ক’রে জানব? সান ফ্রান্সিস্‌কোতে ভূমিকম্প হ’ল, দুই-তিন মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার ঘর মাটির তলে গিয়ে অসংখ্য লোকের প্রাণ গেল। দক্ষিণ সমুদ্রের তরঙ্গে একখানি জাহাজ ডুবে গেল, হাজার লোক ভেসে গেল। তারা কি অপরাধ করেছিল? কোথায় দয়াময় ঈশ্বর? সুন্দর নির্জনে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে নিরীহ সুকোমল হরিণশিশু ঘাস খাচ্ছে, কোথা হতে বাঘ এসে মুহূর্তে সেই হরিণকে আক্রমণ করল, রক্তারক্তি হয়ে গেল, হরিণকে বাঘ মেরে ফেললে— কই, দয়াময় ঈশ্বর রক্ষা করতে পারলেন না? বড় বড় পণ্ডিত বলেছেন, ‘কই, দয়া ত মিলিয়ে নেওয়া যায় না।’ দয়ার প্রমাণ কই? সংসারে দয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তোমরা ‘দয়া দয়া’ যে বল, তা কেবল একটা কথার কথা। বড় জোর মানা যায় একটা শক্তি আছে— অন্ধ সত্তা, Force— আছে, এ বল ত মানতে রাজি আছি। কিন্তু এ জগতের মূলে নিয়ন্তা হয়ে যে আবার

একজন জ্ঞানী প্রেম-সম্পন্ন পুরুষ আছেন, এ ত মানতে পারি না, কেবলি সন্দেহের কারণ দেখতে পাই।" এই ত এক মহা সন্দেহের পীড়ন।

প্রার্থনার বিষয়েও অনেকের মনে বার বার সন্দেহ হয়, "আমার প্রার্থনা শোনবার কি কেউ আছে? পাপ-প্রলোভন হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য কত কেঁদেছি, আবার পড়েছি। কই, আমার কাতর প্রার্থনা ত কেহ শোনে নাই! প্রার্থনাতে কি কিছু হয়? তিনি ত সব জানেন, তবে কেন জগতে এত অত্যাচার অবিচার?"

সর্বদাই মানব-মন এই প্রকার সংশয়ে দোলায়মান হইতেছে। এই সব সংশয়ের মীমাংসা হয়, প্রকাশ মন্দিরে এসে ধর্মের সাক্ষাৎকার লাভ হলে। একবার সেখানে প্রবেশ ক'রে পরিষ্কার ভাবে দেখলে অজ্ঞাতসারে সংশয় খ'সে পড়ে। যেমন এই বেদীর উপরে ব'সে আছি, একাগ্র মনে কথা বলতে বলতে কখন যে গায়ের কাপড়খানা খ'সে পড়ে বুঝতে পারি না, তেমনি। আমাকে নানা সংশয়ে অস্থির করেছিল, কিন্তু প্রকাশ-মন্দিরে এসে একবার স্বয়ং ধর্মের সাক্ষাৎকার পেয়ে সব সংশয় একবারে দূর হ'ল।

সংশয়চ্ছেদ কেমন, ভাঙিয়া বলি। একটি যুবাপুরুষ বন্ধুদের বলত, "কি তোমরা দাম্পত্য প্রেম বল, ও সব কেবল কল্পনা, ও আমি স্বীকার করি না, ও উপন্যাস মাত্র।" কেহ প্রেমে পড়েছে শুনলে সে হাহা ক'রে হাসত। এই ভাব নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়, হঠাৎ একটি স্ত্রীলোকের তার সঙ্গে আলাপ হ'ল। দেখা গেল, অচিরে তার পা হতে মাথা পর্যন্ত ভালবাসাতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "কি হে, বল দেখি, দাম্পত্য প্রেম আছে কি না?" তখন সে স্বীকার করল, "হাঁ হাঁ, এখন দেখেছি, বুঝেছি।" এই রকম ধর্মরাজ্যেও। মানুষ যখন দেখে, তখনি সংশয়-ভঞ্জন হয়। এক বালিকা অপত্যস্নেহ কাকে

বলে জানত না, রামায়ণে কৌশল্যার শোক প'ড়ে মনে মনে ভাবত, বোধ হয় অপত্যস্নেহ এই রকম। কিন্তু যখন তার নিজের ছেলে হ'ল, তখন সন্তানের হাসিমুখ দেখে আর তাকে রামায়ণ প'ড়ে বুঝতে যেতে হ'ল না, তার টাটকা, জীয়ন্ত স্নেহ তার সংশয়-ভঞ্জন করল। বিশ্বাসও তেমনি। ধর্মকে তাজা দেখা চাই, টাটকা দেখা চাই। প্রকাশ-মন্দিরে গেলে দেখা যায়, টাটকা তাজা জীবন্ত ধর্ম— যে দেখে সে বলে, "আমি হলপানা বলতে পারি, আকাশে পাথর ছুঁড়লে তা যেমন মাটিতে পড়বেই পড়বে, তেমনি ধর্মের জয় হবেই হবে, এই জগৎ অন্ধ প্রকৃতির ক্রীড়াভূমি নয়, ইহা প্রেমের ক্রোড়ে অবস্থিত; এবং প্রার্থনা বৃথা যেতে পারে না। যদি পার, বল যে, আর সব মিথ্যা, কিন্তু ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ হবেই হবে; আমি দেখেছি, সাক্ষী দিচ্ছি।"

এক সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে প্রায় দেখা করতে যেতেন। তিনি বলেছিলেন, "দেবেন্দ্র, আমার কাছে মাঝে মাঝে এস, আমি দেনা উদ্ধারের পথ ক'রে দেব।" যুবক দেবেন্দ্রনাথ সপ্তাহে দুই তিন দিন তাঁর কাছে যেতেন। একদিন প্রসন্নকুমার ঠাকুর বললেন, "ও দেবেন্দ্র, কি 'ঈশ্বর ঈশ্বর' কর, কিছু প্রমাণ দিতে পার?" সম্বন্ধটা দেখুন। তিনি মহর্ষির কাকা, বয়সে বড়, জমিজমা ও ঋণ সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করবার জন্যই ডেকেছেন, উঁচু কথা শোনাবার লোক নন। কিন্তু মহর্ষি তাঁর কথা শুনে স্থির ভাবে বললেন, "দেয়াল আছে ইহা আপনি প্রমাণ করতে পারেন?" প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর বললেন, "কি ছেলেমানুষি কর! দেয়ালের কথার আবার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে দেখছি।" তখন মহর্ষি গম্ভীর ভাবে উত্তর করলেন, "আমিও যে ঈশ্বরকে দেখছি।" তিনি ত অবাক্। ধর্মটা দেখবার, আস্বাদন করবার জিনিস। ডেভিড বলেছেন, "Oh,

taste and see the Lord is Good"— তোমরা আস্বাদন ক'রে দেখ, তিনি দয়ালু; আত্মার রসনা দিয়ে চেখে দেখ। প্রকাশ-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে দেখতে হয়, তা হলেই "ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"।

আর কি হয়? "তরতি শোকং, তরতি পাপ্মানং"। শোক কি না বাহির হতে যে দুঃখ আসে, পাপ কি না অন্তর হতে যে দুঃখ আসে। এই সব দুঃখ হতে উদ্ধার হওয়ার উপায় প্রকাশ-মন্দিরে প্রবেশ করা। সেখানে গিয়ে মানুষ শান্তি পায়। জীবন্ত ধর্মের মন্দিরে এই প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়। শান্তি না পেলে কখনই মন তৃপ্ত হয় না। যদি একটি বাড়ির দরজায় লোকে ঢাক বাজায় এবং বলে, "কেমন জায়গা দেখে যাও, এমন কখনও দেখ নাই। যে যা চায়, সে তা পায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না", আর বাড়িতে প্রবেশ ক'রে যদি লোকে দেখে যে, কেহ কিছু বলে না, কিছু খেতে দেয় না— এ যদি হয়, তবে ওই ঢাকের শব্দে কতদিন মানুষকে তৃপ্ত রাখতে পারে? তেমনি ব্রাহ্মগণ কতদিন শুধু কথাতে লোককে সন্তুষ্ট রাখবেন? "এখানে এস, ত্রাণ পাবে, প্রাণ পাবে"— কতদিন এ-সব কথায় মানুষ তৃপ্ত হবে, যদি লোকে দেখতে না পায় যে এখানে এসে ক্ষুধা মেটে?

বাস্তবিক, এখানে এসে কি পাপযাতনা সব দূর হয়? যাঁরা একবার তাঁকে দেখেছেন তাঁরা বলেছেন, "ধন্যোঽস্মি।" মহর্ষি এই প্রকাশ-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে শুনলেন, "কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা।" যাঁরা এসেছেন তাঁরা এই বলেছেন। বুদ্ধ বলেছেন, "তোমরা এস, এই দেখ, আমার ধর্ম আকাশের মত, ছায়ায় ব'সে জুড়িয়ে যাও।" যীশু বলেছেন, "Come unto me, all ye that labour and are heavy-laden, I shall give you rest— পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত কে আছ, এস, শান্তি পাবে।" এঁরা শান্তি পেয়েছিলেন,

তাই লোককে ডেকে বলেছিলেন, “এই দেখ, শাস্তি কেমন।” মহর্ষির কাছে যখন গিয়েছি, তিনি আনন্দে ভরপূর। আমরা নিরাশ হয়েছি তাঁর জীবন সম্বন্ধে; মৃত্যুর পূর্বে তিনি চক্ষু মুদে প'ড়ে আছেন, জ্ঞান নাই, যেই শুনলেন আমি এসেছি, অমনি ব'লে উঠলেন, “অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ময় ধামে তোমাদিগকে ঈশ্বর উত্তীর্ণ করুন।” এই শাস্তি জগতে পাওয়া যায় না। ঋষিরা বলেছেন, “যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি”— তোমরা ক্ষুদ্রাভিলাষে আবদ্ধ থেক না, সুখ পাবে না; ধনজন সব সুখেরই জন্য অথচ মানুষ তাতে সুখ পায় না, এখানে এসেই তৃপ্তি পায়।

প্রকাশ-মন্দিরে আর কি পাই? যতদিন জগতে থাকি ততদিন এই উপদেশ পাই, যে আপনাকে রাখে সেই থাকে, যে আপনাকে বাঁচিয়ে চলে সেই বাঁচে, যে আপনাকে রাখতে জানে না, সেই কষ্ট পায়। বিজ্ঞান বলে, Survival of the fittest— যার জীবনরক্ষার আয়োজন আছে সেই রক্ষা পায়। প্রকাশ-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে কিন্তু আর-এক ব্যাপার দেখতে পাই। সেখানে যে আপনাকে যত হারায় সে আপনাকে তত পায়। আপাততঃ মনে হতে পারে ইহা কবিত্ব, কিন্তু তা নয়। সেই যে দাম্পত্য প্রেমের কথা বলেছি, সেই প্রেমেও এই কথা সত্য যে, যে আপনাকে যত হারায় সে আপনাকে তত পায়। দাম্পত্য প্রেম কেন, স্বদেশপ্রেমের কথা বলি, কারণ এখন উহা খুব প্রবল, স্বদেশপ্রেমে যে আপনাকে যতটা দেয় সে কি ততটা আপনাকে পায় না, তাহার প্রেম কি তত ফোটে না? এইটুকু দেব, এতটা সইব, যে প্রেম এমন কথা বলে সে প্রেমে কিছু হয় না। প্রেমে সীমা নাই, যে যত দেবে সেই তত পাবে। প্রকাশ-মন্দিরেও ঠিক উল্টা কথা। সংসার বলে, আপনাকে বাঁচাও; ধর্মরাজ্য বলে, আপনাকে হারাও।

সেখানে আর কি দেখা যায়? সংসার-রাজ্যে দেখা যায়, সংসারে সুখভোগ আগে, তার পর ধর্ম। সংসার একবারে ধর্মের বিরোধী নয়, সংসারের সুখভোগ আগে রক্ষা ক'রে তার পর ধর্ম যতটা পার, কর। এ-ই বিষয়ীর উপদেশ। ধর্মরাজ্যের নিয়ম ঠিক ইহার বিপরীত—এখানে আগে সর্বান্তঃকরণে ধর্ম চাও, পরে সব পাবে। যীশু বলেছেন, "Seek ye first the Kingdom of God and His Righteousness, and all these things shall be added unto thee." বিষয় ত থাকবেই, আগে ধর্ম অন্বেষণ কর। এ কেমন উল্টা কথা! সংসার বলে, প্রার্থনা কর, জপ তপ উপাসনা কর। মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করা— ছেলে চাই, মামলা জেতা চাই— "তোমার সাহায্যে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক তোমার দ্বারা" এই বিষয়ীর প্রার্থনা। আর প্রকাশ-মন্দিরে এসে তাজা ধর্ম পেলে প্রার্থনা হয়, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আমার দ্বারা"। এ কেমন উল্টা কথা!

প্রকাশ-মন্দিরে প্রবেশ করলে আর-এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। সংসারের আত্মীয়তা বন্ধুতা ততদূর, যতদূর পর্যন্ত রক্তের সম্বন্ধ আছে অথবা যেখানে স্বার্থ আছে। আজ আমি বড়লোক, আজ আমার বন্ধু কত! কাল আমি দরিদ্র, ধনজন সব গেল, আর কেহ আসে না, তারা এখন কোথায়? আজ তারা অন্য লোককে খুঁজিতেছে। প্রকাশ মন্দিরে যে প্রবেশ করে, সে দেখে সব নূতন ব্যাপার। কে আমি, কোথায় জন্মেছিলাম, আজ আমার পাশে কত নরনারী—এঁরা ত রক্তের টানে আমার কাছে আসেন নাই। এঁরা কাছে এলে যেন সাত রাজার ধন পাই। এ বন্ধুতার মূল কোথায়? ধর্মরাজ্যের বন্ধুতা নূতন ব্যাপার। সত্যি ক'রে বল দেখি, যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, মহর্ষি প্রভৃতিকে

কি বন্ধু ব'লে মনে হয় না? কেন এঁরা আপনার হয়ে গিয়েছেন? প্রকাশ-মন্দিরের প্রজা ব'লে।

মহাত্মা বুদ্ধ ধর্মপ্রচারে বহির্গত হয়ে পিতার রাজ্য রাজনগরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, নগরের পাশে উপবনে বাস করতেন এবং রাজপথে ভিক্ষা করতেন। রাজারা যদি খাওয়ার আয়োজন করত ভালই, নচেৎ তিনি স্বয়ং ভিক্ষায় যেতেন। মহারাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধের খাওয়ার আয়োজন করতে ভুলে গেলেন, সেইজন্য বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হস্তে রাজপথে ভিক্ষা করতে বাহির হলেন। শুদ্ধোদন তাই শুনে ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে এসে বললেন, "ভিক্ষা হতে নিবৃত্ত হও, তুমি আমার মাথা হেঁট ক'রো না, এই রাজবংশে তোমার জন্ম, এ বংশকে লজ্জিত ক'রো না।" বুদ্ধ তাই শুনে বললেন, "না মহারাজ, আমি রাজবংশের মাথা হেঁট করি নাই। আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, সে বংশের সকলে ভিক্ষার দ্বারাই জীবন ধারণ করেছেন।" তার অর্থ, তিনি সাধু হয়ে যে ধর্মবংশে জন্মেছেন, নবজন্ম লাভ করেছেন, সেই বংশের কথা। এই প্রকাশ-মন্দিরে নূতন বংশে নূতন জন্ম হয়, সব নূতন হয়। এ দিকে মুখ ফিরালে মানুষ নূতন জীবন পায়। এখানে নূতন পথ, নূতন লোক, নূতন কথা। ঈশ্বর-চরণে এই নবজীবন পাওয়া যায়, ধর্মরাজ্য এই নবজীবনের রাজ্য।

এই নবজীবন লাভের জন্য এই উৎসব। মেলায় এসে সেই শ্রেষ্ঠ ঘরখানা না দেখে গেলে যেমন মেলায় আসা বৃথা, তেমনি যদি কোনও বাণী না শুনতে পাও, একটি আলোক না দেখতে পাও, তবে তোমাদের উৎসবে আসা ধিক্। চুলোয় যাক বাড়ি-ঘর, টাকা কড়ি, চুলোয় যাক্— আজ নবজীবন পেতে হবে। যে নবজীবন পেয়েছে সে আমার ভাই, আর সব ক্ষুদ্র, তুচ্ছ। তবে প্রবেশ

কর, প্রকাশ-মন্দিরে প্রবেশ কর। এখানে প্রবেশ করতে কি ভয় করে? কোনও ভয় নাই। রেলওয়ে পিকপকেট-এর মত ঈশ্বর তোমার সব কেড়ে নেবেন না। ঈশ্বরের দরজায় যেতে কি ভয় হয় যে, ঈশ্বর আমার ধনদৌলত সব কেড়ে নেবেন? না না, তিনি কিছুই কেড়ে নেবেন না, ঐ পরশমণি ছুঁইয়ে লোহার সংসার সোনার ক'রে দেবেন। তোমরা পতিপত্নী, তোমাদের দাম্পত্য প্রেম পরশপাথর ছুঁইয়ে সোনা ক'রে মিশিয়ে দেবেন— নব উৎসাহ, নব আনন্দ দিয়ে দিবেন। তবে সকলে প্রকাশ-মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করুন।

১৩১৩

প্রেমের ধর্ম

আমি আজ প্রেমের কথা বলতে এসেছি, আশার কথা বলতে এসেছি। যখন রোগশয্যায় মৃতপ্রায় হয়ে প'ড়ে ছিলাম, তখন প্রাণে যেন বাণী শুনলাম, "তুমি ওঠ, ব্রাহ্মদিগকে আশার কথা শোনাতে হবে।" তাই আমি আজ তাঁর প্রেমের কথা বলতে এসেছি। আজ প্রেমের আনন্দ ভোগ করব, প্রেমের আলোকে অন্ধকার দূর করব, তাঁর প্রেম প্রাণে রাখব। প্রেমের মত এমন কোমল, এমন মিষ্ট, এমন সুশীতল জিনিস আর কি আছে? তাঁর প্রেম আমার প্রাণে রাখব, রেখে প্রাণ জুড়াব, জুড়ায়ে দুই হাত তুলে ধন্যবাদ করতে করতে ঘরে চ'লে যাব।

আমি কি তাঁর প্রেমের কথা বলতে পারব? প্রেম! প্রেম! এই কথা আমরা চিরদিন শুনে আসছি, ব'লে আসছি; কিন্তু সেই প্রেমের শক্তি যে কত আমরা তা ভেবে দেখি না। যাঁরা কাউকে অকপটে ভালবেসেছেন তাঁরা জানেন, প্রেমের শক্তি কত। প্রেম আশা দেয়, প্রেম শক্তি দেয়, প্রেম আনন্দ দেয়। প্রেম হৃদয়ে এক পবিত্র নিঃস্বার্থ কোমল ভাব আনয়ন করে, আপনার শক্তি দিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করে। প্রেমে কি না করেছে, কি না করছে! দেখুন, আমাদের দেশে স্বদেশপ্রেম ছিল না। চল্লিশ বৎসর স্বদেশপ্রেম জাগাবার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি, আশানুরূপ ফল হয় নাই। এখন স্বদেশপ্রেম জেগেছে, দেখুন, আজ স্বদেশপ্রেমের জন্য লোকে কত কষ্ট স্বীকার করছে।

প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে। একটা পুরাতন দৃষ্টান্ত দিব? এক সময়ে সুইজারল্যাণ্ড দেশের কোনও গ্রামে একটি ছোট শিশুকে ঈগল পক্ষীতে নিয়ে গেল। নিয়ে একেবারে এক পাহাড়ের উপর গিয়ে আপনার বাসায় বসল। গাঁয়ে রটনা হ'ল, অমুকের ছেলে নিয়ে ঐ ঈগল

পাখি পাহাড়ে গিয়ে বসেছে। সে পাহাড়ে কখনও মানুষ ওঠে নাই, ওঠবার রাস্তাও কেহ জানিত না। কি সর্বনাশ! দেখতে দেখতে সেই পাহাড়ের তলে পুরুষ-নারী বালক-বালিকা জমা হ'ল। এত যে দৌড়াদৌড়ি, হৈ-হাই, কিন্তু ঈগল ওড়েও না, ছেলেটিকে ছেড়েও দেয় না। সকলে পরামর্শ করতে লাগল, কি উপায়ে পাহাড়ে উঠা যায়। একজন গজাল আনল, হাতুড়ি দিয়ে লোহা বসিয়ে উঠবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। আর-একজন বলল, "ঘুরে দেখ কোথাও রাস্তা আছে কি না।" এই রকম যখন হৈ হৈ রৈ রৈ হচ্ছিল, তখন হঠাৎ দেখা গেল, একখানি হাত পিছন থেকে এসে ঈগলের গলা টিপে ধরল। সেখানি স্ত্রীলোকের হাত। "এ কার হাত, এ কার হাত?" এই রব উঠে গেল। হাতখানি ঈগলের গলা ধরতেই ঈগল উড়ে গেল। সেই হাত এসে ছেলেটিকে কোলে নিল। তখন সকলে দেখল, তার মা। "ওরে ওর মা, ওরে ওর মা!" কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য! পথ কিরূপে পাইল? সকলেই বলতে লাগল, "বাপ রে, মাতৃ-স্নেহের অসাধ্য কর্ম নাই, অসম্ভবকে সম্ভব করল।" দেখুন প্রেমের কেমন শক্তি! প্রেম আলোক দিল। যেখানে পথ ছিল না, সেখানে প্রেম পথ দেখিয়ে দিল। আবার ভাবি, সেখানে উঠবার শক্তি স্ত্রীলোকটি কোথায় পেল? প্রেম সে শক্তিও দিল। এইরূপে চিরদিন প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

আমার নিজের জীবনের একটি ঘটনার কথা বলি। এ কথা পূর্বে এখানে বলেছি কি না তা মনে নাই। বালককালে পাখি পুষতে বড় ভালবাসতাম। একদিন একটি ছোট পাখির বাচ্চা চুরি ক'রে নিয়ে এলাম। এনে মহা চিন্তায় পড়লাম। কখন খাওয়াব, ক'বার খাওয়াব, কি ক'রে রাখব, এই ভাবনা। তখন আমার বয়স সাত-আট বৎসর হবে। পাড়ার বয়ঃপ্রাপ্ত বালকদের উপদেশ নিতে গেলাম। আমার

মা বললেন, "ওরে, অত ভাবিস্ নি। খাঁচায় ক'রে চালের একধারে ঝুলিয়ে রেখে দে, ওর মা এসে ওকে খাওয়াবে।" আমি বললাম, "তাও কি কখনও হয়? ওর মা বনের ভিতরে কত দূরে আছে, সে কি টিপ্ টিপ্ ডাক শুনতে পাবে?" মা বললেন, "রাখ্ না, দেখবি এখন।" তাই রাখলাম। ওমা! ক্ষণেক পরে দেখি, আধার মুখে ক'রে তার মা এসে তাকে খাওয়াচ্ছে। আমি দেখে চিৎকার ক'রে উঠলাম, "ওরে মা! ওই দেখ, ওর মা ওর টিপ্‌টিপ্ শব্দ শুনতে পেলে?" মা বললেন, "তুই বড় হলে বুঝবি।" এখন চিন্তা করি আর মনে ভাবি, প্রেম সকল ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে।

এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক অনেক শোনা যায়। একটি পুরাতন দৃষ্টান্ত দেই। হাটের মধ্যে ছোট ছেলে হারিয়ে এক স্ত্রীলোক পাগলের মত ঘুরছে। এত হাঁকাহাঁকি হচ্ছে, তাতে তার কান নাই। বাজারের মধ্যে কোথায় 'মা মা' ব'লে কচি কণ্ঠের ধ্বনি উঠছে, তাই সে শুনছে। প্রেমের কি আশ্চর্য ক্ষমতা!

প্রেম হৃদয়ের কিছু নিয়ে যায়, কিছু দেয়। নিয়ে যায় ভয়, ভাবনা, দুঃখ। কি দেয়? প্রথম দেয় আশা। যে যাহাকে যথার্থ ভাবে, অকপট ভাবে ভালবাসে, সে তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রেম ব'লে দেয়, কার উপর নির্ভর করা যায়। তুমি এসে বললে, "আমি আপনাকে এমন ভালবাসি, তেমন ভালবাসি। আপনার জন্য প্রাণ দিতে পারি।" আমার মন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘুরিয়ে বলছে, "না।" আমার মন সেদিকে ঝুঁকছে না। আর যে ছেলেটা বেশি কথা কয় না, নিশ্চয় জানি, আমার পীড়া হলে ও আমার জন্য মরবে। প্রেম লোক চেনে। চারিজন লোক একত্র হয়ে শিশুর কাছে যাও, শিশু বুঝতে পারবে কে তাকে ভালবাসে, অমনি সে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রেম চোখ-কানকে সজাগ করে। প্রেম

চেনে, প্রেম আশা দেয়, প্রেম নির্ভর করে। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে আশা আছে, নির্ভর আছে। বিদেশে ছিলাম, সন্তানেরা ভাবনা-চিন্তা করছিল; যেই বাবা বাড়ি এলেন, অমনি সন্তানের ভয়-ভাবনা চ'লে গেল, আশা এল। বাবা এসেছেন, আর ভাবনা কি? প্রেমে নিরাশ হতে দেয় না। এই এক কথা।

দ্বিতীয় কথা, প্রেম যখন আসে, তখন অপূর্ব আনন্দ নিয়ে আসে। প্রেম প্রেমিককে দেখতে চায়, প্রেমিকের কথা শুনতে চায়, প্রেমিকের সঙ্গে থাকতে চায়। যাকে ভালবাসি, তার কাছে বসতে আনন্দ, তার মুখ দেখতে আনন্দ, তার বিষয় চিন্তা করতেও আনন্দ। আমি যাঁকে ভালবাসি, শ্রদ্ধাভক্তি করি, তাঁর কথা স্মরণ হলেও আনন্দ পাই। আমি একটি লোকের সঙ্গে থাকতাম। তিনি একবার পীড়িত হয়েছিলেন— মরণাপন্ন অবস্থা। সেই পীড়ার মধ্যে তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এসে উপস্থিত। যেই এসে নীচে থেকে 'অমুক' ব'লে ডেকেছেন, অমনি আর রোগীকে কে শয্যায় ধ'রে রাখে? "ওই যে অমুক এসেছে" ব'লে রোগী বিছানায় উঠে বসল। রোগ চ'লে গেল, আনন্দে মন প্লাবিত হ'ল। সেই মুহূর্ত হতে রোগীর অবস্থা ভাল দেখা গেল।

আমরা একটি স্ত্রীলোককে চিনতাম। লোকে তাকে স্বার্থপর ব'লে জানত। আপনি খাব আপনি পরব, এই তার ভাবনা ছিল। যাকে দেখে না, কোনও সাহায্য করে না, বাড়ির কাজে মন নাই, এই রকম ভাব। সে মেয়ে দাম্পত্য প্রেমে পড়ল, ভালবাসার ফাঁদে পড়ল। তার পর বিবাহ হ'ল, সন্তান হ'ল। একদিন এই স্ত্রীলোকের পীড়া হ'ল. বাঁচে কি না সন্দেহ। এমন সময় বাড়িতে আগুন লাগল। আগুন দেখে মেয়েটি উঠে কোমর বেঁধে ছেলে কোলে নিল, জিনিসপত্র রক্ষা করতে লাগল, পতির প্রিয় বস্তুসকল রক্ষা করতে অগ্রসর হ'ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা

খাটছে, ব্যারামের কথা মনেই নাই। এ শক্তি কোথা হতে এল? প্রেম তাহাকে এই শক্তি দিল।

এখন সকলে ভেবে দেখুন, যে ধর্ম আমরা গ্রহণ করেছি, সেটি প্রেমের ধর্ম। মহর্ষির চরণে ব'সে আমরা শিখেছি, "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাহার প্রিয় কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

জিজ্ঞাসা করি, আপনারা আত্মপরীক্ষা ক'রে আজ কি দেখেছেন? আত্মপরীক্ষা ক'রে আজ পুরাতনকে বিদায় দিন, নূতনকে গ্রহণ করুন। চৌরঙ্গীর দোকানগুলিতে অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, লেখা রয়েছে, "Sale on, Sale on, Sale on." সেই সময় ওরা স্টক মেলায়, ক্ষতিলাভ গণনা করে, পুরাতনকে বিদায় দেয়, নূতনকে আনে। আপনারা মনে করুন, যেন এই মাঘোৎসবও তাই। পুরাতনকে বর্জন ক'রে আজ নূতন গ্রহণ করতে হবে।

আজ ভাই বল ত, ঈশ্বর-প্রীতি তোমার হৃদয়ে বাস ক'রে তোমাকে আশা দিচ্ছে কি না, আনন্দ দিচ্ছে কি না, বল দিচ্ছে কি না? আমরা কি সংসার-সংগ্রামে চারিদিকের অবস্থা দেখে নিরাশ হই, না আশা পেয়ে থাকি? কি মনে হয়? এই যে মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে পাপের হাতে প'ড়ে ক্লেশ পায়, তার কারণ ঈশ্বর-প্রেমে যে আশা, সে আশা তার নাই। পাপ-প্রলোভন আসবার আগেই সে ম'রে থাকে। তুমি যদি মনের মধ্যে নিজেই ম'রে থাক, তবে তোমাকে কে বাঁচায়? তুমি আশা রাখ না, কেননা তুমি অবিশ্বাসী; তুমি জীবনে ঈশ্বরকে দেখ না। তুমি ভাব, আপন জোরে উঠবে। তুমি কৃতী পুরুষ অথবা তুমি বলশালিনী নারী, তুমি ভাব, নিজের জোরে দাঁড়াবে। স্বাবলম্বন ও স্বীয় উদ্যম ভাল; কিন্তু প্রেমময়ের উপরে যে স্বাবলম্বনের ভিত্তি, তাহাই প্রকৃত স্বাবলম্বন,

তাহাতে আশা, আনন্দ ও বল আছে। ভগবানের প্রেমের স্রোত নিশিদিন প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্রোত আমাদের প্রত্যেককে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। যে ভাল হতে চায়, তার জন্য সেই প্রেম স্রোত প্রবাহিত রয়েছে, ব্রহ্মাণ্ড তার সহায়, মানব-সমাজ তার অনুকূল, তার জয় অনিবার্য। যে মন্দ হতে চায়, তার জন্যই সংগ্রাম, সকলে তার প্রতিকূল— তার নিজের প্রকৃতি তার প্রতিকূল, মানব সমাজ তার প্রতিকূল। কি এক আশ্চর্য শক্তি পশ্চাতে থেকে মানবকে অনিবার্য রূপে সত্য, ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতার দিকে প্রেরণ করছে। দুষ্টকে দমন, শিষ্টকে পালন করছে। আমি বলি, তাহা সেই প্রেমময়ের প্রবাহিত প্রেম। তবে আমরা আশা পাব না কেন? সত্যে যদি বিশ্বাস থাকে, সাধুতায় যদি বিশ্বাস থাকে, পুণ্যের জয় হয় এ কথায় যদি বিশ্বাস থাকে, তবে আশা পাব না কেন? আমরা তেমন জলন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁহাকে ধরতে পারি না, তাই আশা পাই না।

আমরা মন্দিরে আসি, বসি, ডাকিতে আরম্ভ করি; দেখিলে মনে হয়, যেন দূর থেকে, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর নেমে মনে প্রবেশ করবেন। দূর হতে যাঁকে ডেকে আনতে হয়, স্বর্গ হতে যাঁকে নামতে হয়, সে ঈশ্বর ঈশ্বর নয়। ঈশ্বর কি বাইরের জিনিস? তিনি যে আত্মাতেই রয়েছেন, তিনি যে অন্তরের মধ্য হতে প্রেমের প্রেরণা দিচ্ছেন, আমরা সকলে তাঁতেই নিমগ্ন রয়েছি। তাঁকে বাহিরে দেখলে আশা আসবে না। এরূপ বিশ্বাসে জগৎ-জয় হবে না। যুদ্ধের সময় যদি টিনের তলোয়ার ২০০০ খানা লও আর আসল তলোয়ার ২০০ খানা লও, তা হলে যেমন বলা যায়, টিনের তলোয়ার লোককে দেখাবার পক্ষে ভাল কিন্তু যুদ্ধের কাজের পক্ষে ভাল নয়, ত্বরায় তাহার অসারতা ধরা পড়ে, তেমনি মৌখিক বিশ্বাস দেখতে ও শুনতে ভাল হলেও জীবন-সংগ্রামে কর্মের

নয়। যাহাদের ঈশ্বরে প্রকৃত নির্ভর নাই, তাহাদের বিশ্বাস যেন টিনের তলোয়ার। জগতে বিশ্বাসী অপূর্ব শক্তি লাভ করে, যে শক্তিতে পৃথিবী পরাজিত হয়।

প্রকৃত অকপট বিশ্বাস ও প্রেমের এক অপূর্ব 'মোহিনী শক্তি আছে, যাহা দেখে জগৎ মুগ্ধ হয়। মহাত্মা চৈতন্য হরিনাম করতেন, আর সকলে তাঁর পদচুম্বন করত। কেন? কি নূতন কথা তিনি শুনায়েছেন? তিনি নূতন কথা শুনান নাই, নূতন প্রাণে অকপট ভক্তির সঙ্গে প্রেমের কথা শুনাইয়াছেন, তাই লোকে মুগ্ধ হইয়াছে। মহাত্মা যীশুর কথা শুনা যায় যে, তাঁহার কথা লোকে বলিত, "He speaks as man never spake before"—ইহার মুখে যে কথা শুনি, এমন মানুষের মুখে কখনও শুনি নাই। অথচ তিনি যে কথা বলেছেন তা অনেকদিন পূর্বে অনেক ভক্ত বলেছেন, তাঁর নূতনত্ব ছিল অকপট প্রেমভক্তিতে। অকপট প্রেমভক্তির অভাবে তোমার আমার কথা খৈ-এর মত উড়ে যায়, আর এই ভক্তদের উপদেশ জগৎ মণিমুক্তার ন্যায় সঞ্চার ক'রে রেখেছে। আমরা হতভাগ্য, অবিশ্বাসী, অপ্রেমিক, মুখে 'প্রেম প্রেম' বলি। শুধু বলিলে প্রেম হয় না।

আবার বলি, প্রেমিকের হৃদয়ে আশা থাকে, আনন্দ থাকে, বল থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে এমন কখনও যাই নাই, যখন তাঁহাকে প্রেমে মগ্ন ও সদানন্দ দেখি নাই। তাই বলি, প্রেম নিরাশকে আশান্বিত করে, অসুখীকে সুখী করে, জীবনের তিক্ততা দূর করে, কর্কশতাকে কোমল করে।

তার পর শক্তির কথা। ঈশ্বর-প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা হৃদয়-মনে শক্তি লাভ করিতেছি কি না, ইহা দেখিবার বিষয়। যদি প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি থাকে, তবে তাহা হইতে আশা, আনন্দ, শক্তি পাবই পাব।

এই যে ব্রাহ্মবিধান, ইহা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে প্রীতি-স্থাপনের জন্য আহ্বান মাত্র। দেখেছি, যেখানে ঈশ্বর-প্রীতি আছে, সেখানে আনন্দ, আশা এবং শক্তি আছে। দেখেছি, ধর্মের বলে পরিবার স্বর্গধামে পরিণত হয়েছে। এমন যদি হয়ে থাকে, তবে আমাদের প্রচারের অধিকার এসেছে। ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি এই ব্রাহ্ম-ধর্মকে স্বীয় স্বীয় গৃহ-পরিবারে রেখে দেখেছেন যে, ইহা তাঁহাদের গৃহ-পরিবারকে পবিত্র করে, জীবন-সংগ্রামে আশা, আনন্দ ও বল বিস্তার করে? সামাজিক জীবনে রেখে কি দেখেছেন যে, ইহা তাঁহাদের সামাজিক জীবনকে উন্নত করে? যদি দেখে থাকেন, তবেই ইহা প্রচার করিবার অধিকার পেয়েছেন। যদি কোনও ঔষধ সেবন ক'রে উপকার দেখতে পাওয়া না যায়, তবে কি তার বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত? তাই বলি, ওগো ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! দেখ, প্রেমাস্পদকে প্রাণে রেখে শক্তি পেয়েছ কি না, প্রাণ পবিত্র হয়েছে কি না, পাপ চ'লে গিয়েছে কি না। যদি তা হয়ে থাকে, তবে প্রচার কর। যদি না হয়ে থাকে, তবে আর মানবকে কি দেবে? দেখ, নিরাশ জন আশা পেয়েছে কি না, দুর্বল শক্তি পেয়েছে কি না, পাপের জ্বালা দূর হয়েছে কি না?

কেবল ব্যক্তিগত জীবনে যে ঈশ্বরের নামে মহা কাজ হয়, তা নয়, জাতীয় জীবনেও হয়। আমাদের দেশের পক্ষে এই ধর্মবিধান জীবনের নূতন রাস্তা প্রকাশ করেছে। দিব্য চক্ষে দেখুন, ভারত নবজীবন পেয়ে উত্থিত হচ্ছে। তার রাস্তা এইখানে। আর সকল কথা বাহিরের কথা। আজ তুমি রাজনীতির মহা আন্দোলন করছ, কাল হয়ত ভাইয়ের গলা টিপে ধরবে। আজ স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে স্বার্থত্যাগ করছ, কাল হয়ত তহবিল ভাঙবে। আজ এক রকম কথা বলছ, কাল হয়ত আর-এক রকম কথা বলবে। অবশ্য বর্তমান আন্দোলনের নিন্দা

করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আজ যে দেশে নব অভ্যুত্থান হয়েছে, ইহাতে যে বিধাতার হাত নাই, এ কথা বলছি না। বহুদিন পরে বিধাতার কৃপায় ভারত আবার উঠবে, জাগাবে, দাঁড়াবে— আজ তার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু মহত্বের ভিত্তি হালকা জায়গায় দাঁড় করালে হবে না। ভরাট-করা পুকুরের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করলে অল্প দিনেই তাহা ধূলিসাৎ হবে। জাতীয় মহত্ত্বের ভিত্তি জাতীয় চরিত্রের গভীর স্থানে স্থাপন করতে হবে, নতুবা তাহা দাঁড়াবে না। ভগবান্ পূর্বেই জাতীয় চরিত্র গঠনের পন্থা ক'রে দিয়েছেন। দেখ, তার সমুদায় উপাদান এই ধর্মবিধানের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।

প্রথমে ভাব যে, প্রেম সম্ভব হতে গেলে দুইটি জিনিস চাই। প্রথম, আত্মার স্বাধীনতা। আত্মার স্বাধীনতা ভিন্ন প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি হতে পারে না। মহর্ষি বলতেন, ক্রীতদাসের সঙ্গে প্রীতি-বন্ধন সম্ভব নয়। প্রেম স্বাধীনতা চায়। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করব, স্বাধীন ভাবে সাধন করব, তবে ভগবদ্‌ভক্তি হৃদয়ে স্থান পাবে। যত নিগড়— গুরুর নিগড়, শাস্ত্রের নিগড়, দেশাচারের নিগড়— সমস্ত ভগ্ন ক'রে আত্মাকে স্বাধীন ক'রে একবারে ঈশ্বরের চরণে ফেলে দিতে হবে, তবে প্রেমের অধিকার জন্মিবে। এই নবধর্ম প্রেমের ধর্ম, সুতরাং ইহা স্বাধীনতার ধর্ম। ইহার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার ভাব জাতীয় চরিত্রে স্থানপ্রাপ্ত হবে। আত্মার স্বাধীনতাই সর্ববিধ স্বাধীনতার ভিত্তি।

স্বাধীনতা ছাড়া প্রেমের আর-একটি সহায় আছে। সেটি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা ঈশ্বর-ভক্তির পোষক। এইজন্য ঈশ্বর সাধুদিগের উদয় করেছেন, শাস্ত্রগ্রন্থ সব প্রকাশ করেছেন। এ-সকল বৃথা হয় নাই। হৃদয়ের মধ্যে ধর্মভাব উদিত হলে তা প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে। ঈশ্বর

সাধুমহাজন দ্বারা, প্রেমিকের দ্বারা, ভক্তের দ্বারা তাহা প্রকাশ করেছেন। উপনিষদে ঋষিদিগের উক্তি পাঠ কর। কি গভীর তত্ত্ব, কি সুন্দর ভাষা! এই ঋষিরা বৃথা জন্মেন নাই। আমাদের দেশে অন্যান্য সাধুপুরুষেরাও বৃথা জন্মেন নাই। কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম— আমাদের দেশের, পঞ্জাবের, দাক্ষিণাত্যের এই সকল মহাপুরুষের জীবন কি বৃথা? ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে এ কথা কখনই বলব না।

দ্বিতীয় কথা, শ্রদ্ধা প্রেম ও ভক্তির পোষক, সহায়, বর্ধক। এই প্রেম আধ্যাত্মিক, ইহা বাহিরে থাকে না। বাহিরে নানা আড়ম্বর আছে। কৃপণ যেমন ধনের ব্যবহার ভুলে ধনকেই লক্ষ্য করে, তেমনি অনেকে ধর্ম ভুলে ধর্মের বাহ্যাবরণকেই সার ক'রে থাকে। প্রকৃত প্রেমের আবির্ভাবে ধর্মের এই বাহ্যাবরণকে আর ধর্ম ব'লে জ্ঞান হয় না। যেখানে অকপট প্রেম, সেখানে বাহিরের নিয়ম থাকতে পারে, কিন্তু নিয়মই ধর্ম নয়। স্বামীর কাছে আসতে হলে স্ত্রীকে কি petition-এ sign ক'রে আসতে হয়? কোনও মহারাজার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে হলে বাহিরে ব'সে অপেক্ষা করতে হয়, প্রাইভেট সেক্রেটারিকে খবর দিতে হয়, তার পর হয়ত দেখা পাওয়া যায়। প্রেমে কি তাই থাকে? ভগবানের কি প্রাইভেট সেক্রেটারি আছে? প্রেম বাহিরের কায়দা জানে না। প্রেমিক প্রেমাস্পদের কাছে সোজা চ'লে আসে।

তৃতীয় কথা, ধর্ম ও নীতির ঘনিষ্ঠ যোগ। তুমি ভাবের ধর্ম, আনন্দের ধর্ম প্রচার করতে চাও? তুমি বিপথগামী হবে, যদি তোমার ধর্মে নীতির যোগ না থাকে। ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান যাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জীবনের প্রত্যেক কর্তব্য

ঈশ্বরাদেশে ধর্মসাধনের অঙ্গ ব'লে করতেন। তিনি জীবনের সমুদয় কর্তব্য পালন করতেন, অথচ সর্বদা ব্রহ্মপ্রেমে বিভোর হয়ে থাকতেন। তিনি যেমন উপাসনা করেছেন, ধর্মসাধন করেছেন, তেমনি ঋণশোধ করেছেন, সন্তান-রক্ষা করেছেন, বিষয়-সম্পত্তি দেখেছেন। ঈশ্বরে প্রীতি হবে, অথচ প্রীতির ধার ধারবে না, ঋণ ক'রে শোধ দিবে না, প্রতিশ্রুত হয়ে তাহা রাখবে না, চিন্তা বাক্য ও কার্যে সংযত থাকবে না, এ হতে পারে না। আমাদের দেশের এক প্রকার ধর্ম আছে, তাহা ভাবুকতার ধর্ম। এই ধর্মের সেবকগণ ভাবে উন্মত্ত হন, গড়াগড়ি দেন, দেখতে দেখতে সপ্তম স্বর্গে ওঠেন, কিন্তু নীতির প্রতি দৃষ্টি থাকে না। ব্রাহ্মধর্ম এরূপ ধর্ম নহে। ইহার ভিতরে প্রেরক ঈশ্বর-প্রীতি, বাহিরে প্রকাশ মানব-সমাজে নীতি। আমি ভাবুকতা চাই বটে, কিন্তু ভাবুকতাকেই ধর্ম মনে করি না। ধর্ম আধ্যাত্মিক, নীতির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ব্রাহ্মধর্ম মানবের ধর্মবুদ্ধিতে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে উপদেশ দেন, সুতরাং ইহা নীতিপ্রধান। এদেশের পক্ষে এই নীতিপ্রধান ধর্মের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

চতুর্থ কথা, যে হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি আছে, সেই হৃদয়ের অপর ঈশ্বর-প্রেমিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান। প্রেম সার্বভৌমিক। আপনাদের মধ্যেই দৃষ্টান্ত দেখুন। এখনি যদি হঠাৎ মহম্মদ এখানে আসেন, তবে কি তাঁর দাড়ি আলখেল্লা দেখে ব্রাহ্মগণ তাঁকে পর ভাববেন? যদি যীশু এসে উপস্থিত হন, তবে কি কেউ বলবেন, "তুমি জুডিয়া দেশের লোক, তুমি আমাদের কেউ নও"? প্রেমের ধর্ম এ প্রকার নয়। সে ধর্ম উদার, সার্বভৌমিক, বিশ্বজনীন। বিধাতার আদেশ এই, জগতের জাতি-সকল সমগ্র জগতের উৎপন্ন দ্রব্য ভাগ ক'রে নেবে। চীন দেশে চা জন্মে, তাই ব'লে কেবল চীনেরাই কি চা খাবে, আর কেউ খাবে না?

আমাদের দেশে পাট হয়, তাই ব'লে পাট কি কেবল আমাদেরই ? ঈশ্বর বলেন, ধনধান্য যা কিছু আছে সকলে বণ্টন করিয়া খাও। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য কি সকলের জন্য নয় ? বিজ্ঞানের সত্য গ্রহণে প্রাচ্য প্রতীচ্যের প্রভেদ নাই। ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধেও সেইরূপ আপনার পর নাই। আমাদের ধর্ম প্রেমের ধর্ম। উহা কি কেবল ভারতেরই জন্য ? সে ক্ষুদ্রতার ও সে অনুদারতার দিন চ'লে গেছে। গ্রীক ও বার্বেরিয়ান, জিউ ও জেণ্টাইল, হিন্দু ও ম্লেচ্ছ, এ-সকল বিভাগ এখন চ'লে যাচ্ছে। এখন মানবের কল্যাণকর যাহা কিছু তাহা সকলের জন্য। এখন উদার ধর্মভাবের দিন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বুঝেছিলেন যে, ভারতে এমন এক দিন আসবে, যেদিন হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান একত্র হয়ে এক ঈশ্বরের মহাপূজা করবে। এই মহৎ ভাবেই তিনি ব্রাহ্মধর্মের বীজ বপন করেছিলেন। সেই বীজ অঙ্কুর প্রসব করেছে, অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে।

ইহা প্রেমের ধর্ম, সুতরাং গঠন ইহার স্বভাব। প্রেমের স্বভাব গঠন করা, দুইকে এক করা। এইরূপে প্রেম সাধকমণ্ডলী গঠন করে। জ্ঞানের কাজ বিশ্লেষণ, প্রেমের কাজ সংশ্লেষণ। জ্ঞান জলকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে, কয়টা গ্যাস আছে। জ্ঞান ভাঙে, খণ্ড খণ্ড করে, বিশ্লেষণ করে। তাতেও কাজ হয়। প্রেম সংগঠন করে, বাঁধে, একত্র করে। প্রেমের ধর্ম তাই সামাজিক ধর্ম।

অতএব পঞ্চম কথা এই যে, আমাদের ধর্মবিধান সামাজিক ধর্ম-বিধান। সমাজের উন্নতি করা, সমাজকে উচ্চ করা, সমাজের ভাল করা ইহার কাজ। আমাদের দেশের প্রাচীন কালের ব্রহ্মজ্ঞান এবং এখনকার ব্রাহ্মধর্মে কিছু প্রভেদ আছে। ব্রহ্মজ্ঞানবাদীরা সংসারকে মায়া ও অবিদ্যা ব'লে মনে করেছেন, মানব-সমাজকে ভাঙবার চেষ্টা করেছেন, সন্ন্যাসের ধর্ম প্রচার করেছেন। কিন্তু আমাদের ধর্ম সমাজবিমুখ নয়,

ইহা সমাজমুখীন ধর্ম। প্রাতঃসূর্যকিরণে, প্রভাতবায়ুহিল্লোলে, বনরাজীর শ্যামকান্তিতে আমরা সচরাচর ভগবান্‌কে দেখি। কিন্তু নরনারীর মুখে কি ভগবান্ নাই? ঐ যে পুরুষ ও নারী বিমল দাম্পত্য প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে, ওখানে কি ঈশ্বরকে দেখব না? ঘুঘু কুটো মুখে ক'রে উড়ে যায়, বাসা বাঁধে, বাচ্ছা প্রসব করে। এই বাসা বাঁধার মধ্যে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখি। কিন্তু নবদম্পতি প্রেমে আত্মবিস্মৃত হয়ে যেখানে গৃহধর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছেন, সেখানে কি ভগবানের লীলা নাই? সৃষ্টির প্রধান মানুষ, তার কার্যকলাপের মধ্যে কি ঈশ্বর কাজ করিতেছেন না? ঐ যে বন্ধু ব্যাকুল চিত্তে অনাহারে অনিদ্রায় বন্ধুর রোগশয্যা-পার্শ্বে ব'সে আছেন, তার মধ্যে কি ভগবান্ নাই? তাই বলি, আমাদের ধর্ম সামাজিক ধর্ম। জনসমাজকে উন্নত করিবার চেষ্টাতে ও মানবের সেবাতে ইহার সাধন। এটি এ দেশের পক্ষে কত বড় কথা ও নূতন কথা।

লোকে বলে, ব্রাহ্মদের ঈশ্বর হাওয়া, হাওয়া— ধরা ছোঁয়া যায় না, এমন ঈশ্বরে কি ভক্তি হয়? আমি এ কথা স্বীকার করি না। তিনি অনন্ত ও মহান্ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি বিধাতা রূপে প্রকৃতি-রাজ্যে, জীবজগতে ও মানব-ইতিবৃত্তে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ, তাঁর কি বিধাতৃত্ব, কি নৈকট্য, কি মাধুর্য! যিনি বাহিরে বিধাতা, তিনি অন্তরে পরিত্রাতা। যে পতিত, যে অনুতপ্ত, যে লজ্জাতে অধোবদন, সেই পাপীর দাড়িতে হাত দিয়া বলিতেছেন, "আমি তোমাকে তুলব।" তিনি না বাঁচালে, তিনি না আলিঙ্গন করলে পাপীর আর কি আছে? দেখ, তিনি তোমার প্রাণে স্বয়ং উদয় হয়েছেন। তোমার জন্য সমুদায় ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, তোমার জন্য জগৎ সুন্দর ক'রে রেখেছেন, নবীন সূর্য কেমন মধুরতামাখা,

মলয়-হিল্লোল কেমন স্নিগ্ধ, নরনারীর মুখ কেমন পবিত্র। এস, একবার আজ সকলে মিলে প্রেমময়ের নাম করি, প্রেমের কথা কই, প্রেমের উপর নির্ভর করি। তাঁর জয় হোক, পাপীর পরিত্রাণ হোক, হৃদয়ে নব শক্তি আবির্ভূত হোক। তিনি আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুন, আমরা উদ্ধার হয়ে যাই। ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের প্রত্যেকের পরিত্রাণ এবং সমগ্র ভাবে দেশের পুনরুত্থান হউক।

১৩১৪

ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধর্ম

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ।
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

এই আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ময় পুরুষ যিনি সবই জানেন, এবং এই মানবাত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ যিনি সবই জানিতেছেন, কেবল তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"— মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা ॥
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥

সাধক আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হন। তিনি বন্ধন হইতে এবং পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

সেই পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সন্দেহ দূর হয় এবং কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। তার কোনও প্রকার বন্ধনই থাকে না।

এই বচনগুলি উপনিষদে পাওয়া যায়।

মানুষ যখন অন্নজল উদরস্থ করে তখন প্রকৃতি আপনা হইতেই তাহার দেহে পরিবর্তন আনয়ন করে। অন্নজল উদরে গেল, অথচ দেহের কোনও পরিবর্তন ঘটিল না, দেহ তাই থাকিল, ইহা কি কখনও সম্ভব? না, এ হতে পারে না। অন্নজল উদরে গেলে কাজ করবেই, দেহের পুষ্টিসাধন হবেই হবে। মাংসপেশী বলবান্ হবে, অস্থি দৃঢ় হবে,

দেহে রক্ত পরিষ্কার হবে। এই সব পরিবর্তনের দ্বারা অন্নজল গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যাবে। যদি কেহ বলে, "আমি অন্ন গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার ক্ষুধা যায় নাই, দেহে শক্তি হয় নাই, মাংসপেশী দৃঢ় হয় নাই", তা হলে তাকে বলি, "মিথ্যাবাদী, হয় তুমি অন্নজল গ্রহণ কর নাই, নতুবা তোমার পরিপাক হয় নাই তোমার রোগের জন্য।" নতুবা পরিবর্তন অনিবার্য। জীবন্ত বীজ রোপণ করিল, ভাল সময়ে বৃষ্টিপাত হইল, এ যদি হয়, তবে বীজের পরিবর্তন হবেই হবে; প্রথমে অঙ্কুর এবং পরে বৃক্ষ দেখা যাবেই যাবে। যদি বল, "ভাল মাটিতে বীজ বপন করিলাম, বৃষ্টি পড়িল, তবুও তাহার কোনও পরিবর্তন হইল না", তাহা হইলে বলি, বীজ জীবন্ত নয়, নতুবা পরিবর্তন হবেই হবে।

একটা হাঁড়ি চাল ও জল দিয়ে আগুনের উপর বসাও, এক ঘণ্টা পরে তার কোনও পরিবর্তন হবে না, এ কি সম্ভব? যদি চাল বলে, "আমি এক ঘণ্টা আগুনের উপর ব'সে ছিলাম, তবুও যেমন ছিলাম তেমনি আছি", তবে বলি, "তুমি মিথ্যাবাদী। চাল, তুমি আগুনের উপর বস নাই, আর কিছুর উপর বসেছিলে।" আগুনের উপর চাল ও জল চড়ালে, জীবন্ত বীজ মাটিতে পুঁতলে, অন্ন হবে না, গাছ হবে না, অন্নজল দেহে যাবে অথচ দেহের বল হবে না, এ সম্ভব নয়।

এই পূর্বে যেমন বললাম, তেমনি মানুষ ঈশ্বরকে জেনেছে, পেয়েছে, অথচ বদলায় নাই, ইহা সম্ভব নয়। আগুনের উপর চাল এবং জল বসিয়ে রেখেছি অথচ ভাত হয় নাই, এ যেমন মিথ্যা কথা, তেমনি ঈশ্বরকে ডেকেছি অথচ জীবনে কোনও পরিবর্তন হয় নাই, ইহাও মিথ্যা কথা। ঈশ্বরকে জানিবে এবং যথার্থ ভাবে তাঁর অর্চনা করিবে। যথার্থ ভাবে, এ কথা বলছি এইজন্য যে, প্রচলিত অনেক অর্চনা মৌখিক।

দার্জিলিঙে গেলে সকলে দেখবেন, বৌদ্ধেরা চাকা ঘুরিয়ে নামজপ করে। এক দিকে চাকা ঘুরছে, তারা হয়ত তখন ঝগড়া করছে অথবা গল্প করছে, হাত চাকা ঘুরাচ্ছে। বৌদ্ধ মন্দিরে স্ত্রীলোক থাকে, তারা অপরের হয়ে নামজপের চাকা ঘুরায়— যে তাকে পয়সা দিচ্ছে সে হয়ত তখন বাজার করছে— চাকা ঘুরাচ্ছে সেই স্ত্রীলোক, পয়সা হচ্ছে তার, ধর্ম হচ্ছে সেই বাজারের লোকের। এরূপ আরও অনেক ধর্মের সাধন আছে। সম্পূর্ণ বাহিরের সাধন আত্মাকে স্পর্শ করে না। কত যে স্তবস্তুতি আছে, যা হৃদয় স্পর্শ করে না। কত ধর্মসাধন রয়েছে, যাহাতে ওষ্ঠ এবং অধরকে নামজপের জন্য এবং হৃদয় ও আত্মাকে সংসারের সুখের জন্য রাখা হয়। মুখের স্তবস্তুতি ধর্ম নয়, মৌখিক পূজার কোনও দাম নাই। এরূপ অর্চনার কথা বলছি না। অকপট নির্মল মনে একাগ্র হৃদয়ে তাঁর কাছে যে প্রার্থনা, তাহাই সত্য অর্চনা। মানুষ এইরূপ খাঁটি অর্চনা করিবে অথচ বদলাইবে না, এ সম্ভব নয়।

অন্নজল দেহে যায় অথচ দেহ পুষ্ট হয় না, বীজ মৃত্তিকায় থাকে অথচ অঙ্কুরিত হয় না, জল ও চাল আগুনের উপর থাকে অথচ ভাত হয় না, এ যেমন অসম্ভব, ঈশ্বরের সহিত প্রেম-যোগ স্থাপন হয় অথচ জীবন বদলায় না, ইহাও তেমনি অসম্ভব।

এ বিষয়ে ঋষিদের উক্তি ও সাক্ষ্য আবার পাঠ করি। "স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা"— সাধক মোদনীয় আনন্দনীয় পরমেশ্বরকে পাইয়া অনির্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়। আর "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং"— এমন শক্তি পায় যে তাহার সাহায্যে শোক ও পাপ হতে উত্তীর্ণ হতে পারে। শোক এবং পাপ এ দুটি পৃথক বস্তু; যাহা কিছু বাহিরের বিপদ-আপদ তাহাই শোক, এবং যাহা কিছু দুঃখের কারণ ভিতরে আছে তাহা পাপ। এই উভয়বিধ দুঃখ হতে

উঠবার শক্তি পায়। শোক এবং পাপ যে থাকে না, তা নয়, তা থাকে, তবে এমন শক্তি পায় যাহার সাহায্যে শোকতাপ হতে উত্তীর্ণ হতে পারে। 'তরতি' কি ? না, যেমন ভেলায় প্রশস্ত নদী পার হয়। প্রকাণ্ড নদী থাকে কিন্তু ভেলায় চ'ড়ে সকলেই তা পার হতে পারে, তেমনি শোকদুঃখ থাকে কিন্তু যে ঈশ্বরের সহিত প্রেম-যোগে যুক্ত হয় সে এমন শক্তির ভেলা পায় তাহার সাহায্যে উত্তীর্ণ হতে পারে।

আর কি হয় ? না, শক্তি জাগে। "গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।" গুহা হইতেছে হৃদয়, গ্রন্থি কি ? যাহাতে হৃদয়কে ঈশ্বর-চিন্তা হতে দূরে রাখে, তাহাকে বলে হৃদয়গ্রন্থি। ধন, মান, ঐশ্বর্য, সুখ— এই হ'ল হৃদয়গ্রন্থি। সকলের গ্রন্থি এক রকম নয়। কত লোকের মনে ক্ষুদ্র চিন্তা, নীচ চিন্তা ; কোনও ক্ষুদ্র বিষয় তাদের হৃদয়কে বেঁধে রেখেছে, অনন্ত কল্যাণ ভুলিয়ে রেখেছে। এই যে গ্রন্থি-বাঁধন, এটাকে ছেঁড়ে কে ? যথার্থ প্রীতি-যোগে যে ভগবানের সহিত যুক্ত হয়, সে সেই বল পায়, যদ্দ্বারা এই গ্রন্থি ছিঁড়া যায়।

আশ্চর্য ব্রহ্মকৃপার ক্ষমতা ! জগতের সাধুদের জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মানুষ দুঃখে কষ্টে জড়িয়ে পড়ে, ভাবে, এ বুঝি আর ছেঁড়া যাবে না। ইন্দ্রিয়সুখ হতে মনকে তুলতে চায়, পারে না ; ভাবে, এ বাঁধন ছেঁড়া যাবে না। কিন্তু তারা জানে না, ব্রহ্মকৃপা কি শক্তি আনয়ন করে ; জানে না যে, ব্রহ্মকৃপা-বলে হাতি-বাঁধা দড়ি সব ছিঁড়ে যায়। স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা নীচপ্রকৃতি মানুষ, যার দু'পয়সা মা-বাপ, সামান্য স্বার্থ নিয়ে যে মরে বাঁচে, এমন হ'ল যে, সে মানুষ সব ছাড়ল।

এ ধর্ম প্রচার কে করে ? ঈশ্বরের শক্তি প্রাণে এলে সব ছিঁড়ে দেয়। মানুষ জানে না কেমন ক'রে কি হয়।

যখন গঙ্গায় বান ডাকে তখন সব মাঝিরা নৌকার দড়াদড়ি খুলে মাঝগঙ্গায় নৌকা নিয়ে যায়। বান ডাকে আর সকলে চিৎকার করে, "ওরে, খোল্, খোল্, খুলে দে দড়াদড়ি, খুলে দে, গঙ্গায় বান ডেকেছে।" সকলেই দড়াদড়ি খুলেছে, একখানা নৌকার মাঝি খুলতে পারছে না, এমন সময় এমন এক ধাক্কা এসে লাগল যে সব বাঁধন নিমেষে ছিঁড়ে গেল। একজন লোক কেবল লাভক্ষতির হিসাব বুঝত; সব বিষয়ে তার দু'টাকা যাবে কি থাকবে, তার ভাল হবে কি মন্দ হবে, এই নিয়েই ছিল, একদিন উৎসবে এল, এমন ধাক্কা লাগল যে, সব ভেসে গেল।

যেখানে এমন ধাক্কা লাগে সেখানে কেউ যাবে? যে ঘাটে সামাল সামাল বানে টেনে নিয়ে যায়, সে ঘাটে কেউ নামবে?

অনেক দিন হ'ল, স্মরণ নাই, একদিন আত্মার বান ডেকেছিল, প্রার্থনা করব ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, দেখেছিলাম অদ্ভুত শক্তি—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ", সব বাঁধন ছিঁড়ে দিল। চোখে আলোক আসে, সব সংশয় অন্ধকার কেটে যায়। কি শুভক্ষণে বসলাম, তিনি দেখা দিলেন; কি শুভক্ষণে উপাসনায় গিয়েছিলাম, সংশয়-আঁধার কোথায় চ'লে গেল। বসন্ত কালের ঘন মেঘের মত ঘন মেঘ উঠল, কিন্তু দক্ষিণে বাতাসে সে মেঘ কোথায় গেল, সব পরিষ্কার হয়ে গেল, সুনীল আকাশ দেখা দিল। আমার মন সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, কোনও মতে তার মীমাংসা হচ্ছিল না, পথ হারিয়ে ব'সে ছিলাম; কি শুভক্ষণে মুক্তিদাতার চরণে মাথা রাখলাম, সব অন্ধকার কেটে গেল, তাঁর প্রেমমুখের আলোকে পথ দেখতে পেলাম।

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি"— এর দুই অর্থ হতে পারে। এক অর্থ, পূর্ব জন্মের কর্ম সব ক্ষয় হয়। আর-এক অর্থ, ক্রিয়াকর্ম বাহিরের ধর্ম-সমুদয়

বন্ধন-স্বরূপ হয় না। প্রাণে শক্তি জাগে। যতক্ষণ তাঁতে চিত্ত না যায়, তাঁর সঙ্গে প্রীতিযোগ স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ কর্ম বন্ধন, বাহিরের কাজ খুঁটিনাটি, তাতেই মানুষ মরে বাঁচে, একটু চুল খসলে সর্বনাশ হয়। আধ্যাত্মিক ধর্মের এ রাস্তাই নয়। ধর্ম আত্মাতে তাঁর প্রেমমুখের আলোক ও স্বর্গের উত্তাপ পাওয়া।

আর কি হয়? তাঁর সাক্ষাৎকার পেলে মানুষ স্বাধীন হয়। কি রকমে? না, তখন সে ধর্ম চোখে দেখে। স্বাধীনতা বন্ধন জানে না। যখন ভগবানে প্রীতি স্থাপিত হয়, তখন প্রাণে স্বাধীনতা পাওয়া যায়। মৎস্যের পক্ষে জলে বিচরণ করা যেমন স্বাভাবিক, পক্ষীর পক্ষে আকাশে থাকা যেমন স্বাভাবিক, তার পক্ষে ধর্মে বাস করা তেমনি স্বাভাবিক। আকাশ পাখির পক্ষে এবং জল মাছের পক্ষে যেমন, তেমনি ধর্ম আত্মার স্বাধীনতার ক্ষেত্র। এরূপ ব্যক্তি ধর্মে আহার করে, ধর্মে বিশ্রাম করে, ধর্মে নিদ্রা যায়। তার বদ্ধ ভাব যায় এবং সে মুক্ত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। একটি ছোট বাড়িতে অনেকের নিমন্ত্রণ হয়েছে। একজন গেলেন, যেতেই তাঁকে একটি ঘরে বসান হ'ল। তিনি কত বই দেখছেন, কিন্তু নেড়ে চেড়ে দেখতে সংকোচ বোধ হচ্ছে; একখানা বই দেখে মনে হ'ল, "পাই ত পড়ি", কিন্তু নিয়ে পড়তে সাহস হচ্ছে না। মনে সংকোচ, পরের বাড়ি। এ ঘর ছেড়ে ও ঘরে গিয়ে বসা যায় না; পরের বাড়ি, কি ভাববে। তাঁর মনে যখন এই সব সংকোচ তখন অপর একজন এলেন, তিনি সেই বাড়ির বন্ধু, তিনি যেখানে ইচ্ছা যাচ্ছেন, বসছেন, ও ঘরে দেখতে গেলেন, যেন সব তাঁর আপনার ঘর, একবারে স্বাধীন ভাব। ইনি প্রেম থাকায় স্বাধীন, পূর্বোক্ত ব্যক্তি প্রেমের অভাবে পরাধীন। প্রেম যেখানে, স্বাধীনতা সেখানে।

যে আত্মাতে তাঁর প্রেম জেগেছে, সে আত্মা স্বাধীন। তার ধর্মসাধন, উপাসনা সব স্বাধীন। তার কাছে অভ্রান্ত শাস্ত্র এবং অভ্রান্ত গুরু নাই। ধর্মগ্রন্থ বা উপদেশে তিনি বাঁধা নন। তাঁহাতে সবই আছে—সাধুভক্তি আছে, ধর্মগ্রন্থ আছে, ধর্মালোচনা আছে—কিন্তু সবই স্বাধীন ভাবে আছে। ঋষিগণ এই বলেছেন, অতএব এটা মানতে হবে—এরূপ নয়। ভগবান্ স্বয়ং শিক্ষা দিয়েছেন, তাই মানি। এই স্বাধীনতা আধ্যাত্মিক, ইহা আত্মার আনন্দ এনে দেয়, প্রাণে শক্তি এনে দেয়, মানুষকে রিপুদমনে সমর্থ করে। তাঁতে মতি হলে এই হয়। এ কথা মনে রাখা বড় দরকার।

এ দেশের কথা মনে ক'রে মন অবসন্ন হয়। প্রজাসাধারণের অবস্থা কি হীন, নিম্নশ্রেণীর অবস্থা কি শোচনীয়! এখন দেশের উপদেষ্টা নাই। প্রাচীন উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম-প্রচার ছেড়ে বিষয় কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। এদের উপদেষ্টা নাই। যাঁরা অতি অল্পসংখ্যক আছেন, তাঁরা আত্মাকে সুপথে নিয়ে যেতে, শক্তিদান করতে অসমর্থ—সামান্য অর্থের দাস। শাস্ত্রপাঠ, কথকতা প্রভৃতি ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে, ধর্মপ্রচার হচ্ছে না।

অন্য দিকে নব ভাব, নব শক্তি, নব শিক্ষা-প্রভাবে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে। পূর্বে অন্য জাতি ব্রাহ্মণের আজ্ঞাধীন থাকত। এখন "কে বা কার, কেন মান্‌ব" শিক্ষিতদের মধ্যে এই ভাব প্রবল। প্রাচীন অবস্থা ভেঙে যাচ্ছে, আর নূতন পাপ এসে সকলকে গ্রাস করছে।

স্থানে স্থানে কলকারখানা স্থাপিত হচ্ছে, আর দলে দলে স্ত্রী পুরুষ সেখানে গিয়ে বাস করছে এবং পানাসক্তিতে ডুবছে। তার পর লক্ষ লক্ষ নিম্নশ্রেণীর লোক এখনও উচ্চ জাতির দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে,

মাথা তুলে উঠবার জো নাই। শিক্ষিতগণ ধর্মবিহীন শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে একবারে ধর্মের প্রতি উদাসীন হচ্ছে। তার অর্থ এই যে, ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা ধর্মবিহীন বায়ুর মধ্যে বাস ক'রে ধর্মবিমুখ হয়ে পড়ছে। আমাদের বাল্যকালে আমাদের পিতামাতাগণ তাঁহাদের বিশ্বাসমত আমাদিগকে ধর্মশিক্ষা দিতেন। এখনকার ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পরিবারে ধর্মের কোনও চিহ্ন নাই। পিতামাতার ধর্মে আস্থা নাই দেখে ছেলেমেয়েরাও ধর্মহীন হচ্ছে। এক দিকে ধর্মভাব যাচ্ছে, অপর দিক হতে সভ্যতার নানা পাপ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর ভিতর প্রবেশ করছে। এখন আমাদের কর্তব্য কি?

সেই শক্তিকে ইহাদের মধ্যে জাগাইতে হইবে, যাহার বলে পাপ-প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারিবে। ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে ইহাই প্রয়োজন। ইহা আধ্যাত্মিক শক্তি।

এই যেমন ধর্মের দিক হতে, তেমনি আবার সমাজের দিকে। প্রাচীন ভাব হতে মুখ ফিরাতে হবে। প্রাচীন ধর্ম সমাজবিমুখ ধর্ম ছিল— সমাজে ধর্ম হবে না, জঙ্গলে যেতে হবে। কিন্তু প্রেমের ধর্ম সমাজমুখীন। প্রেমের চক্ষে সংসারের সবই ঈশ্বরের লীলা। পক্ষী-মাতা আহার অন্বেষণ করে, মানবশিশুও মাতৃকোলে প্রতিপালিত হয়, কপোত-কপোতী প্রেমে আবদ্ধ হয়— এর মধ্যে ভগবানের প্রেমের লীলা দেখতে পাও না? পুরুষ-নারী যে দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সেবা করে তার মধ্যে তাঁর লীলা কি দেখতে পাও না? তবে তুমি অন্ধ। প্রেমের ধর্ম সমাজকে দূরে রাখে না। তাহাতে পুষ্পে, কাননে, আকাশে, প্রাণী-জগতে এবং মানব-জগতে তাঁরই লীলা দেখে। তিনি আকাশে আছেন, জলে আছেন, হিমালয় পর্বতে আছেন, আর মানুষের মুখশ্রীতে নাই? তিনি সমাজে এবং তিনি সকলের মুখে বর্তমান।

অতএব ধর্মসাধনের ক্ষেত্র নির্জন প্রাণমন্দিরে আর সমাজে। তোমার গভীর আধ্যাত্মিক জীবন দশজনের জন্য নয়? তুমি আত্মার কন্দরে প্রাণস্বরূপকে অন্বেষণ কর, ডুবুরীর মত ধ্যানে ডোব, যতক্ষণে ব্রহ্মে গিয়ে না ঠেক। কিন্তু কেবল ঐখানেই থেক না। যাও, কোথায় বিপন্ন ব্যক্তি আছে, পার ত তাকে উদ্ধার কর। দুর্ভিক্ষে কে কষ্ট পাচ্ছে, যাও, তার অন্নের সংস্থান ক'রে দাও। কোথায় কুলটা নারী নরকে ডুবছে, যাও, পার ত তার হাত ধর, মুক্তিদাতার নাম শুনাও। ঐ নিম্নশ্রেণীর লাখ লাখ লোক পদদলিত, নিষ্পেষিত, পার ত জাতিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেল, বল, "পরমেশ্বর সকলের জন্য, তোমরা উঠে দাঁড়াও।" ভারত-নারী পরাধীনতার অজ্ঞানতায় নিমগ্ন, পার ত তোল তাঁহাদিগকে।

এই বিস্তৃত সাধনক্ষেত্র রয়েছে। এ কি ত্যাগের কথা বললাম? এ-সব ত্যাগ মনে কর কেন? যা কিছু কর, খাঁটি মনে কর। যে যেটিকে মূল্যবান্ বস্তু মনে করে সে তার সেটিকে বাঁচাতে কত ব্যস্ত। পরমাত্মার সহিত যোগ এবং জীবনে সেই পরমপুরুষের ইচ্ছা পালন, ইহা যার মূল্যবান্ ব'লে বোধ হয়, সে কি এ সাধনক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে পারে? অন্নজল দেহে গেলে যেমন দেহের শক্তি এবং পুষ্টি হবেই হবে, তেমনি নিজের সব ঈশ্বর-চরণে দিলে শক্তি, আনন্দ, সেবা-প্রবৃত্তি, এসব আসবেই আসবে। দেশের প্রতি ভগবানের কৃপা হয়েছে, এ দেশ উঠবে। এখন সকলে তাঁর প্রতি প্রীতি স্থাপন করুন, সে চরণে মাথা রাখুন— শক্তি, আশা, বল সব আসবে। ভগবান্ করুন, ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে এই উচ্চ ধর্মভাব এ দেশে ব্যাপ্ত হোক।

১৩১৫

আত্মার পাকস্থলী

এক স্থানে মহা ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। সেই ভোজে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে ষোড়শোপচারে আহার করান হইয়াছিল। কি কি অন্নব্যঞ্জন, কি কি মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। মনে কর, তোমার একজন বন্ধু তাহা তোমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিয়া তুমি যদি তোমার দেহকে বল, "দেখ দেহ, কর্ণ ত তোমারই ইন্দ্রিয়, তুমি কর্ণ দ্বারা কত অন্নব্যঞ্জনের বিবরণ শুনিলে, এখন পরিতৃপ্ত হও, ইহাই তোমাকে পোষণ করিবে।" তখন দেহ সে কথা শুনিবে না। দেহ বলিবে, "অন্নব্যঞ্জনের বিবরণ শুনিলে কি হইবে? তাহাতে ক্ষুধা যায় না। যতক্ষণ অন্নব্যঞ্জন পাকস্থলীতে না যায়, পরিপাক না হয়, দেহের অঙ্গীভূত না হয়, ততক্ষণ বলাধানের কারণ হয় না।" অতএব ও শোনা কিছুই নয়।

সেইরূপ মনে কর, কোনও স্থানে কতকগুলি লোক ভোজে বসিয়াছে, তাহারা নানা মিষ্টান্ন আহার করিতেছে, তুমি চক্ষু দিয়া দেখিতেছ, তখন যদি তোমার দেহকে বল, "দেখ দেহ, চক্ষু ত তোমার, চক্ষু দ্বারা ঐ ত অন্নপান দেখিতেছ, এখন পরিতৃপ্ত হও, উহা তোমাকে বলশালী করুক।" এ কথার উত্তরে দেহ সেই কথাই বলিবে, "অন্নপান আমার পাকস্থলীতে যদি না যায়, ওরা পরিপাক হইয়া দৈহিক ধাতু রূপে যদি পরিণত না হয়, তাহা হইলে আমি বললাভ করিতে পারি না।"

বাহিরের অন্নপান সম্বন্ধে যেমন এই নিয়ম যে, তাহা পাকস্থলীতে যাওয়া চাই, পরিপাক হওয়া চাই, দৈহিক ধাতুতে পরিণত হওয়া চাই, তবে দেহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়, আধ্যাত্মিক অন্নপান সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। আধ্যাত্মিক অন্নজল আত্মার পাকস্থলীতে যাওয়া চাই, পরিপাক হওয়া চাই, তবে তদ্দ্বারা কেহ সবল হইতে পারে।

মনে কর, এক ব্যক্তি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, বেদে কি বলে, বেদান্তে কি বলে, বাইবেলে কি বলে, কোরানে কি বলে, তাহা তাঁহার তুণ্ডাগ্রে আছে, ধর্মতত্ত্বের প্রকার ও প্রণালী কি, সাধনের মার্গ কয় প্রকার ও এ বিষয়ে কে কি করিয়াছেন এবং কে কি দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ আছে। তিনি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত, ইহাতেই কি তিনি ধার্মিক হইয়াছেন ? পূর্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় তিনি কি আপনার আত্মাকে বলিতে পারেন, "হে আত্মন্, তুমি ত ধর্মতত্ত্ব এত শুনিয়াছ, এত গ্রন্থ অনুশীলন করিয়াছ, আর কি, এখন পরিতৃপ্ত হও এবং এতদ্দ্বারা পরিপুষ্ট হও" ? তবে কি তাঁহার আত্মা তাঁহার দেহের ন্যায় বলিবে না, "শুনিলে কি হয়, ঐ সকল সত্য যদি আত্মার পাকস্থলীতে না গেল, যদি আত্মার চিন্তাতে, আকাঙ্ক্ষাতে, হৃদয়ের ভাবে ও হস্তের কার্যে প্রতিষ্ঠিত না হইল, তবে শোনাই সার, এতদ্দ্বারা আত্মার কোনও উপকার দর্শে না" ?

এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া একজন সাধু বলিয়াছিলেন, "হায়! হায়! অনুতাপ কাহাকে বলে, অনুতাপের প্রকৃতি কি, অনুতাপ হৃদয়ে কি পরিবর্তন আনে, অনুতাপে আত্মাকে কিরূপ বিনীত ও নির্ভরশীল করে, এ সকল অনেক শুনিয়াছি, এ শাস্ত্রে আমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। সে জন্য আমার দুঃখ নাই। আমার দুঃখ এই যে, পাপ করিয়া আমার সমুচিত অনুতাপ হয় না।" ঠিক! ঠিক! অনুতাপের শাস্ত্র জানা এক কথা, আর পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া আর-এক কথা। তেমনি ধর্মতত্ত্ব শোনা এক কথা, আর সেই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করা এবং আত্মার পাকস্থলীতে পরিপাক করা আর-এক কথা।

এইরূপ ধর্ম ও ধার্মিকজনকে দেখিলেও ধর্ম হয় না। হায়, সাধুসঙ্গে কত লোক বসিয়াছে, সাধুদের উপদেশ কত লোক শুনিয়াছে, সাধুদের

কার্যকলাপ কত লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সকলেই যদি তদ্দ্বারা উপকৃত হইত, তাহা হইলে জগতের অবস্থা আরও কত উন্নত হইত! ধর্ম ও ধার্মিককে চক্ষে দেখিলে কি হয়? সেই কৃপা ও উপদেশ আত্মার পাকস্থলীতে না গেলে, পরিপাক না হইলে, কল্যাণ হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, তবে কি আত্মার পাকস্থলী আছে? আর, যদি থাকে, তবে সে পাকস্থলী কি? এ প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যায় যে, আত্মার পাকস্থলী আছে বই কি। এমন একটা প্রণালী আছে, যদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য-সকল পরিপাক হইয়া আত্মার রক্তমাংসে পরিণত হয়, অর্থাৎ আত্মার চিন্তাকে অধিকার করে, আকাঙ্ক্ষাকে অনুরঞ্জিত করে, হৃদয়ের ভাবকে সমুন্নত করে এবং ইচ্ছাকে দৃঢ় করে।

আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিদিন এই পরিপাক-ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন বিজ্ঞানানুরাগী মহাপণ্ডিতের উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি এক বিজ্ঞানালয়ে সামান্য পরিচারকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিরা যে পরীক্ষাদি করিতেন তাহার সাহায্য করা তাঁহার কাজ ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানপ্রক্রিয়া-সকল দেখিতে দেখিতে ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থাদি পড়িতে পড়িতে তাঁহার হৃদয়ে এমনি বিজ্ঞানানুরাগের সঞ্চার হইল যে, বিজ্ঞান তাঁহার ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ করিল, তিনি সেই আলোচনাতে আত্মসমর্পণ করিলেন, তাহার তত্ত্ব-সকল নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন— ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল, এমন কি তিনি অশন-বসন প্রভৃতি বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মনের বায়ু পর্যন্ত যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি সেই ভাবে শয়ন করেন, সেই ভাবে উত্থান করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

ইহাকেই বলে পরিপাক, ইহাকেই বলে আত্মার পোষণ। কিন্তু এখানে আমরা আত্মার পাকস্থলী রূপে কোন্ বিশেষ শক্তিকে দেখিতেছি? তাহা সেই প্রাচীন, প্রাচীন, সর্বজন-পরিজ্ঞাত পদার্থ— প্রেম। ঐ ব্যক্তির জ্ঞানানুরাগ যদি উদ্দীপ্ত না হইত, হৃদয়ে বিজ্ঞানের প্রতি প্রেম যদি না জাগিত, তাহা হইলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব-সকল তাঁহার চিন্তা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা প্রভৃতিকে অধিকার করিতে পারিত না। এইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে, যে তত্ত্ব বা সত্যকে তুমি প্রীতি কর না, তাহা তোমার আত্মাকে অধিকার করিতে পারে না।

এই মহা সত্যটিকে ঈশ্বর বিষয়ে ও ধর্মের তত্ত্ব বিষয়ে প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে, ঈশ্বর ত আছেন, তাঁর স্বরূপ-সকল ত আছে, মানবাত্মাতে তাঁর প্রকাশ ও কার্য ত আছে, কিন্তু যদি তাঁহাতে প্রীতিস্থাপন না কর, তুমি যদি তাঁহার বিষয়ে শুনিয়াই বা তাঁহার ভক্তদিগকে দেখিয়াই পরিতৃপ্ত থাক, তাহা হইলে তিনি তোমার পক্ষে থাকিয়াও নাই। তুমি অন্নব্যঞ্জনের বিবরণ শুনিলে অথবা অন্নব্যঞ্জন দেখিলে, কিন্তু তাহা তোমার কুক্ষিগত হইল না। অতএব মোট কথা এই জানিয়া রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পরিপাক করা চাই।

এখন কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, "কিরূপে বুঝিব যে ঈশ্বরকে বা ধর্মতত্ত্বকে পরিপাক করিতেছি?" এরূপ প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা করি, দেহের পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি কি কখনও ভ্রমে পড়েন? তাহার প্রমাণ ও পরিচয় কি তাঁহার দেহের মধ্যেই পাওয়া যায় না? স্বাস্থ্যই কি সে অন্নজলের প্রমাণস্বরূপ নয়, আর স্বাস্থ্য কি আপনি আপনার পরিচয় দেয় না?

ভাবিয়া দেখ, যে শরীরে স্বাস্থ্য আছে তাহার প্রমাণস্বরূপ সে

শরীরে সর্বদাই কতকগুলি কার্য চলিতেছে। প্রথম কার্য, সেখানে মৃত্যুর কিঙ্কর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-সকলের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। বর্তমান কালের বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছে যে, আমাদের দেহ সর্বদা জীবন ও মৃত্যুর অনুকূল পদার্থ-সকলের মধ্যে বাস করিতেছে। ইহাদিগকে জার্ম্ বা মৌলিক অণু বলা যাইতে পারে। মৌলিক অণু-সকল আমরা ইন্দ্রিয়-সকলের দ্বারা নিরন্তর দেহ-মধ্যে গ্রহণ করিতেছি। যতক্ষণ দেহে স্বাস্থ্য আছে, ততক্ষণ দেহের আভ্যন্তরীণ শক্তি-সকল বা জীবনানুকূল অণু-সকল সেই মরণানুকূল অণুর সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাভব করিতেছে। এই পরাভবই স্বাস্থ্যের লক্ষণ ও স্বাস্থ্যের কারণ। আমরা দেহ হইতে এক বিন্দু রক্ত লইয়া অণুবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলেই দেখিতে পাইব যে, জীবনমৃত্যুর এই সংগ্রাম ঐ এক বিন্দু রক্তের মধ্যে নিরন্তর চলিতেছে। অতএব স্বাস্থ্যের এক লক্ষণ এই সংগ্রাম।

স্বাস্থ্যের দ্বিতীয় লক্ষণ, যেখানে স্বাস্থ্য সেইখানেই ভোগের শক্তি। যতক্ষণ তোমার স্বাস্থ্য আছে, ততক্ষণ তোমার জন্য জগতের ধন ধান্য, শোভা সৌন্দর্য, সুস্বর সুরস, সকলি আছে। স্বাস্থ্য হারাও, এ-সকল থাকিয়াও আর তোমার পক্ষে থাকিবে না। বরং যাহা এক সময় আনন্দ দিয়াছিল, তাহা বিরক্তির কারণ হইবে। সুমিষ্ট সংগীত হইতেছে, তোমার মনে হইবে, “ভ্যাঃ, থামলে বাঁচি।” রসাল খাদ্য আসিবে, তোমার মুখে তুলিতে ইচ্ছা হইবে না। অপর দিকে দেখ, স্বাস্থ্যে প্রফুল্ল বালকটি আপনার ভোগশক্তি ও রসগ্রাহিতাকে যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না— সে হাসিতেছে, নৃত্য করিতেছে, ছুটিতেছে, কুকুরটির গলা জড়াইতেছে, ফুলটি লইয়া শুঁকিতেছে, অপরকে শুঁকাইতেছে— তাহার আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে, অপরের মনকেও প্লাবিত করিতেছে। অতএব, যেখানে স্বাস্থ্য সেইখানেই ভোগের প্রবৃত্তি ও ভোগের শক্তি।

তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যের আর-একটি লক্ষণ এই যে, ইহাতে কার্যে শক্তি দেয়। সুস্থ ও সবল লোকের পক্ষে নিষ্কর্মা থাকা বড় কষ্টকর। এরূপ লোক শ্রমসহিষ্ণু ও শ্রম করিতে ভালবাসে, কার্যের অবসর অন্বেষণ করে এবং কার্য পাইলে সুখী হয়। যাহারা অসুস্থ তাহারা শ্রম-কাতর, অল্প শ্রমেই শয্যাশায়ী হয় এবং বিশ্রাম অন্বেষণ করে। সুস্থ ব্যক্তিরা আপনাদের শক্তিকে যেন ধরিয়া রাখিতে পারে না, সেই শক্তি নানা প্রকারে প্রয়োগ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করে।

স্বাস্থ্যের পূর্বোক্ত তিন প্রকার লক্ষণ আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের প্রতি প্রয়োগ করিলে কি দেখিতে পাই?

প্রথম, যে আত্মা সুস্থ তাহার পাপের সহিত চির-সংগ্রাম বিদ্যমান। মানব সমাজবদ্ধ জীব, মানবের চারিদিকে নানা প্রকার প্রলোভন আছে, সুতরাং মানবকে চিরদিন সংগ্রামের মধ্যেই বাস করিতে হয়। আমরা মানব-জীবনের এরূপ অবস্থা কল্পনা করিতেই পারি না, যাহাতে প্রলোভন নাই, সংগ্রাম নাই। যতক্ষণ মানবাত্মা সুস্থ, ততক্ষণ ঐ সকল প্রলোভনকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাতেই মানুষ মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভ করিতেছে। আর যখন ঐ সকল প্রলোভনের নিকট পরাজিত হইয়া নিজ উন্নতি ও পবিত্রতা হারাইতেছে, তখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, সে আত্মা অসুস্থ।

তৎপরে যে আত্মা সুস্থ, তার সমুদয় পবিত্র ও কমনীয় বিষয় -সম্ভোগের শক্তি অধিক। যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু হৃদয়মনের তৃপ্তিবিধায়ক, যাহা কিছু জ্ঞানকে উন্নত করে, হৃদয়কে প্রশস্ত করে, বিবেককে উজ্জ্বল করে, হৃদয় সুস্থ ও সুখী করে, সে-সমুদয় সে আত্মার অতি স্পৃহণীয়। মৎস্য যেমন জলে ক্রীড়া করিতে ভালবাসে, সেরূপ আত্মা সেইরূপ সমুদয় উন্নত, মহৎ, পবিত্র বিষয়ের শ্রবণ, মনন, আচরণে সুখী হয়।

তৃতীয়ত, সমুদয় সুস্থ আত্মা সদনুষ্ঠানে স্বভাবত প্রবৃত্ত। দুঃখীর দুঃখ হরণ, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, পাপীর উদ্ধার, শোকার্তের সান্ত্বনা প্রভৃতি সর্বপ্রকার শুভানুষ্ঠানে সে আত্মার স্বাভাবিক আনন্দ।

এক্ষণে উৎসবক্ষেত্রে সমবেত ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে একটি বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক আত্মার যেমন একটা সুস্থ অবস্থা আছে, সমষ্টিগত ভাবে ধর্মমণ্ডলীরও একটা সুস্থ অবস্থা আছে। এখানে সমবেত ব্রহ্মোপাসকগণ কি বলিতে পারেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের উপাস্য পরব্রহ্মকে আত্মার পাকস্থলীতে গ্রহণ করিয়া পরিপাক করিয়াছেন, অথবা যে-সকল ধর্মতত্ত্ব তাঁহারা প্রতিনিয়ত শ্রবণ ও কীর্তন করিতেছেন সে-সকল পরিপাক দ্বারা আত্মার অঙ্গীভূত করিয়াছেন? তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, ধর্মভাব তাঁহাদের চিন্তাকে অধিকার করিয়াছে, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়কে নবীভূত করিয়াছে, তাঁহাদের ইচ্ছাকে প্রেরণা করিতেছে? ধর্ম যদি হৃদয়কে ও জীবনকে অধিকার না করে, তবে তাহার আলোচনা করিয়া ফল কি, তাহার শ্রবণে ও দর্শনে উপকার কি?

ধর্ম তাঁহাদের জীবনকে অধিকার করিতেছে কি না চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই তাঁহারা কয়েকটি প্রশ্নের দ্বারা তাহার প্রকৃত উত্তর নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রথম, তাঁহাদের হৃদয়স্থিত ধর্ম কি তাঁহাদিগকে পাপ ও দুর্নীতির সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি দিতেছে? জনসমাজে আমরা চারিদিকে নানা প্রকার পাপ-প্রবৃত্তির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি। ব্যক্তিগত জীবনে অসত্য অন্যায় বা অপবিত্রতাতে লিপ্ত হইবার প্রলোভন ত আছেই, নিতান্ত সতর্ক থাকিয়াও আমরা অনেক সময়ে

তাহা অতিক্রম করিতে পারি না। তৎপরে অনেক সংস্পর্শজ সামাজিক পাপ ও দুর্নীতি লোকের অজ্ঞাতসারে সমাজ-মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে মানুষ সামাজিক রীতি -বশত সেগুলিকে তত দূষণীয় মনে করে না, যথা, সুরাপান, বারাঙ্গনাভিনীত রঙ্গালয়ে গমন, বারবনিতার উৎসাহদান, জুয়াখেলা প্রভৃতি। বর্তমান সময়ে সভ্যতার নামে ও সভ্য জাতিদের দৃষ্টান্তের দোষে অনেক নূতন নূতন পাপ জনসমাজকে অধিকার করিতেছে। [ব্রাহ্ম-] ব্রাহ্মিকাগণ আজ এই প্রশ্নের দ্বারা আত্মপরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন— তাঁহাদের ধর্মজীবন কি তাঁহাদিগকে এই সকল ব্যক্তিগত ও সামাজিক পাপের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত রাখিতেছে? এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ যদি আপনার প্রতিবাদের বাণীকে খর্ব করেন, তবে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত ধর্ম-জীবন হারাইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ যতদিন আধ্যাত্মিক ভাবে জীবিত ও সুস্থ, ততদিন সর্ববিধ সামাজিক পাপের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চলিবে। পাপের প্রশ্রয়ের দ্বারা যেন শান্তির প্রয়াসী কখনও হন না। সে শান্তি নয়, তাহা মৃত্যুর নামান্তর মাত্র।

দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মসমাজ যতদিন আধ্যাত্মিক ভাবে দীক্ষিত থাকিবে, ততদিন যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু হৃদয়মনের উন্নতিবিধায়ক তাহা সম্ভোগ করিবার শক্তি থাকিবে। ততদিন দেখিব, যেখানে জ্ঞানালোচনা হইতেছে, যেখানে সাহিত্যচর্চা আছে, যেখানে শিল্পাদির শিক্ষা আছে, যেখানে জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান আছে, সেইখানেই ব্রাহ্মদিগের যোগ; তাঁহারা আনন্দের সহিত সর্ববিধ সদালোচনাতে যোগ দিতেছেন, প্রাণ ভরিয়া সমুদয় সৎ বিষয় ভোগ করিতেছেন।

তৃতীয়ত, ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিক ভাবে যতই সুস্থ হইবে, ততই

কার্যশক্তি বাড়িবে। হায়! এই হতভাগ্য, দুর্দশাপন্ন ও চির-দারিদ্র্যে নিমগ্ন দেশে কি কার্যের অভাব আছে? ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্ষেত্র কি সুদূরপ্রসারিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! আর্তের সেবা, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, সমাজের পদদলিত অধঃকৃত জাতি-সকলের উদ্ধার, নারী-গণের শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা দান প্রভৃতি যে বিভাগেই দৃষ্টিপাত করি-না কেন, বহু জনের বহু কালের কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্ম ত সে ধর্ম অবলম্বন করেন নাই যে ধর্মে বলে, "যে ডোবে ডুবুক, তুমি আপনার গা বাঁচাইয়া একান্তে ধর্মসাধন কর।" ব্রাহ্ম সেই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন যে ধর্মের এই উপদেশ, "ঈশ্বর দেহমনে যে শক্তি দিয়াছেন তাহা তাঁহার ও মানবের সেবার জন্য ব্যবহার কর।" ব্রাহ্ম জগতের দুঃখের প্রতি কিরূপে উদাসীন হইতে পারেন? যদি উদাসীন হন, তবে তাঁহার ঈশ্বর-প্রেম প্রেমই নহে, তাঁহার ধর্ম ধর্মই নহে। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি ঈশ্বরের আদেশবাণী আসিতেছে, "তোমরা আলস্য জড়তা ছাড়িয়া বদ্ধপরিকর হও, মানবের সেবাই আমার সেবা।" এই বাণীর অধীন হইয়া কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে সেই ধর্মজীবন দিন, যাহা এই ফল প্রসব করে।

১৩১৬

উপাসনা

ঋষিরা বলিয়াছেন—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ।

যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

শ্রবণ কর, যে তেজোময় অমৃতময় সর্বজ্ঞ পুরুষ আকাশে বিরাজিত, যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ মানবাত্মাতে বর্তমান থাকিয়া সব জানিতেছেন, তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পার, অমৃতত্ব লাভের আর অন্য পথ নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

একমাত্র সেই পরব্রহ্মের উপাসনাতেই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

ঋষিরা যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, মহর্ষিও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন। এ দুই উপদেশের একই অভিপ্রায়। ধর্মসাধনের এই উপায় ও উপদেশ অবলম্বন ও পালন করিতে গিয়া আমরা সমর্থ হইতেছি না। এ পথ অবলম্বন করা, এই উপদেশ পালন করা বড় কঠিন বোধ করিতেছি। কিন্তু এত কঠিন কেন মনে করিতেছি? এই পথের কাঠিন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালায় একটা কথা প্রচলিত আছে, "বাঁশবনে ডোম কানা।" ডোম বাঁশ দিয়ে চুপড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করবে ব'লে বাঁশবনে গেল। একটা বাঁশ দেখে ভাবল, "বাঃ, এটা ত চমৎকার!" এমন সময় আর-একটা বাঁশে চোখ পড়ল, তখন মন সেই দিকে গেল; আবার একটা বাঁশ দেখে মনে হ'ল, "না, এটা তত ভাল নয়, ওটা বেশ বাঁশ।" আবার

সে দিকে গেল। এমনি ক'রে সে একবার এ দিক একবার ও দিক ক'রে বেড়াতে লাগল। বাঁশবনে গিয়ে ডোম কানা হয়েছে। সে বাঁশ চায়, বাঁশও রয়েছে, কিন্তু সে বাঁশ পাচ্ছে না।

বর্তমান সময়ে আমাদের অবস্থা এইরূপ হয়েছে। দিন দিন বিজ্ঞানের উন্নতিতে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোক চারিদিকে বিস্তৃত হচ্ছে, চারিদিকে দেখবার শোনবার শিখবার বিষয় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, কত চিন্তার বিষয় বৃষ্টিধারার মত বর্ষণ হচ্ছে— এ ব্যাপারের মধ্যে প'ড়ে মানুষ "বাঁশবনে ডোম কানা" হওয়ার সম্ভাবনা। কোনও বস্তুর অভাব নাই, অথচ মানুষের অভাব পূর্ণ হয় না।

শরীর-রক্ষার জন্য কত খাদ্য, কত বস্ত্র, কত সুখের বিষয় প্রতিদিন চারিদিক দিয়ে বর্ষিত হচ্ছে। কেউ যদি ভাল খেতে চায়, তবে তার সম্মুখে কত জিনিস প্রস্তুত রয়েছে, কিন্তু যদি সে কেবল সুন্দর সুন্দর খাদ্য দেখে বেড়ায়, তার কি চাই তা ঠিক ক'রে বেছে না নেয়, তা হলে কি তার ক্ষুধা যায়? ভাবতে হয়, "আমার জন্য কি প্রয়োজন", দেখতে হয় যে, "আমি কি খেয়ে পরিপাক করতে পারব", তবে নিজের আবশ্যক-মত, দেহের প্রয়োজনমত খাদ্য পছন্দ ক'রে নিতে হবে। এ না পারলে "বাঁশবনে ডোম কানা" হলে।

তেমনি জ্ঞানের রাজ্যে। যদি জ্ঞানের বিষয়ে লক্ষ্য না স্থির থাকে, তবে বৃথা পরিশ্রমে সময় যাবে। প্রত্যহ নূতন নূতন জ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কার হচ্ছে; বর্ষার বারিধারার মত কত 'লজি' দিন দিন আবিষ্কার হচ্ছে; নূতন তত্ত্ব, নূতন মত, নূতন পথ, নিত্য নূতন নূতন ভাব, কত ভাষায় কত বিষয়ের পুস্তক ও সংবাদপত্র সৃষ্টি হচ্ছে। সকালে শয্যাত্যাগ ক'রে উঠলেই সম্মুখে সব হাজির। এই অবস্থায় জ্ঞান-আহরণ বিষয়ে যদি একাগ্রদৃষ্টি না থাকে, কোনও একটি বিষয়ে প্রবল

আকাঙ্ক্ষা ও স্থির লক্ষ্য না থাকে, তবে তুমি "বাঁশবনে ডোম কানা" হবে, "Jack of all trades, master of none" যাকে বলে তাই হবে। অমনি বেশ দেখায়, দশটা বিষয় জানে, সব বিষয়েই কিছু না কিছু বলতে পারে, নানা বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছে; কিন্তু কোনও বিষয়ে জ্ঞানে গভীরতা লাভ হয় নাই, হালকা বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও ভাব উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যার দৃষ্টি কোনও লক্ষ্যে আবদ্ধ নাই, যার মন লক্ষ্যে দৃঢ় হয় নাই, সে পথ দেখতে পায় না, সে জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

ধন উপার্জনের কত পথ খোলা রয়েছে, কত ব্যবসায়-বাণিজ্য। কেহ যদি একটিতে হাত দিয়ে দু'দিন পরে আর-একটি ধরে, আবার কিছুদিন পরে সেটা ভাল লাগছে না ব'লে আর-একটা ধরে, আবার সেটা সকলে ভাল বলছে না ব'লে অপর একটা ব্যবসায়ে হাত দেয়, তার কি ধনলাভ হয়? তার ব্যবসায়ে হাত দেওয়া ভুল। সব দেখে শুনে বুঝে একটা স্থির ক'রে নাও, তার পর তাতে দৃঢ় হয়ে বস। তবে তোমার অর্থলাভ হবে।

তুমি যদি দশজনের দশ কথায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়, একটা পথ দৃঢ় রূপে অবলম্বন করতে না পার, তবে বহু দিনের বহু পরিশ্রমে তোমার কিছুই হবে না। ভ্রমরের প্রতি চাও, দেখ, সে পাঁচ ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু যেই কোনও ফুলে মধু পেল, অমনি ব'সে গেল, আর অন্য দিকে দৃষ্টি নাই, তাতে একবার মগ্ন হয়ে গেল। তেমনি তুমি যদি দেখ শোন, তোমার পথটা চিনে নাও, লক্ষ্য চেন, তার পর তাহাতে দৃঢ় হও।

অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি বিষয় তোমার লক্ষ্য থাকা চাই, সেইটাই তোমার প্রধান বিষয়। তুমি যদি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হতে চাও, তাই হও। উদ্ভিদ্-তত্ত্বই তোমার প্রধান বিষয়; কিন্তু তাই ব'লে কি তুমি শারীরবিজ্ঞান বা ইতিহাস পড়বে না? তা নয়। আর সব

অপ্রধান এবং একটি প্রধান থাকবে। নতুবা রোজ রোজ কত জ্ঞানের বিষয়, কত নূতন তত্ত্ব, কত নূতন বই প্রকাশিত হচ্ছে; লক্ষ্য যদি স্থির না থাকে তবে তোমাকে "বাঁশবনে ডোম কানা" হয়ে ঘুরতে হবে, জ্ঞানে গভীরতা লাভ হবে না।

ধর্ম সম্বন্ধেও তেমনি। কি বিচিত্র অগণ্য মতামত সকলের সম্মুখে উপস্থিত। কত বিচিত্র ধর্মমত, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র সকলের হাতের কাছে, চোখের সম্মুখে উপস্থিত। কত ধর্মসম্প্রদায়, কত ধর্মানুষ্ঠান সকলের সম্মুখে বর্তমান। খ্রীষ্টীয় ধর্মেই দুই শতের অধিক সম্প্রদায় আছে। ভারতে হিন্দুধর্মের যে কত শত সম্প্রদায় আছে তা জানি না। বর্তমান সময়ে নূতন নূতন চিন্তার দ্বার খুলে গিয়েছে। নব নব ধর্মভাব ও চিন্তা নানা দিক দিয়ে মানব-মনে এসে আঘাত করছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন ধর্ম- শাস্ত্র ও মত নিয়ে গ্রহণ করাবার জন্য সকলের দ্বারে উপস্থিত। এ সময়ে যে সত্যের উপর চোখ না রাখতে পারে, সত্যে নির্ভর এবং সত্যে সুদৃঢ় না থাকতে পারে, সে "বাঁশবনে ডোম কানা" হয়।

ধর্ম চিনেছ! হিন্দু, বৌদ্ধ, থিওসফিস্ট, আর্যসমাজ প্রভৃতি তোমার সমক্ষে স্ব স্ব ধর্মমত নিয়ে উপস্থিত। যে চেখে ও দেখে বেড়াবে ধর্ম তার জন্য নয়। ধর্ম দেখতে হয়, পথ খুঁজতে হয়, সত্য ব'লে যা বোঝা যায় তাতে সুদৃঢ় থাকতে হয়, ঐখানে "বাঁশবনে ডোম কানা" হলে চলে না।

মানুষের জীবনে একটা লক্ষ্য এবং আর সব উপলক্ষ্য রাখতে হয়। ধর্মপথে যদি দাঁড়াবে, তবে দৃঢ় ভাবে তাকে ধরা চাই, আর অন্য রাস্তা নাই। ভগবান্ জড়রাজ্যে সর্বত্র ব্যক্ত হয়ে রয়েছেন, তাঁর শক্তি সৌরজগতে সমস্ত বিশ্বে ব্যক্ত হয়ে রয়েছে, তাঁর শক্তি ও জ্ঞান -লীলা মানবাত্মাতে ও মানব-সমাজের বিবর্তনে, সকলে এই কথাই প্রকাশ

করছে— তাঁর শক্তি জড় ও চেতনে বিদ্যমান। তাঁকে একটা গাছ অথবা পরিমিত বস্তু ব'লে মনে ক'রো না, তিনিই সর্বত্র বিদ্যমান, তিনি জড়ে এবং তিনিই চেতনে, তিনি 'আত্মনি', আত্মাতেও তিনি। যখন কোন কোনও দেশ বন্যাতে প্লাবিত হয় তখন সর্বত্র জল দেখা যায়, মাঠে গ্রামে প্রান্তরে জনপদে, তোমার প্রাঙ্গণে— ইহাতে কি আর সন্দেহ আছে? তেমনি যে চৈতন্যময় পুরুষ জড়জগতে তিনিই মানবাত্মাতে রয়েছেন, তাঁকে ক্ষুদ্র ক'রো না।

এইই রাস্তা। মানবকে ক্ষুদ্র ক'রে রেখে, নিজের স্বার্থ-চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ রেখে তাঁকে বুঝবার সম্ভাবনা নাই। এই জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেবল জ্ঞানলাভ ক'রেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার উপাসনাতে জীবন ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি এই বলেছেন, "তিনি সর্বসুখদাতা, সব কল্যাণ-দাতা, এই জ্ঞানেই তোমরা সন্তুষ্ট থেক না। একস্যৈব তস্যোপাসনয়া ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ কল্যাণম্ভবতি— একমাত্র তাঁহারই উপাসনা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ হয়। তোমরা উপাসনাতে প্রতিষ্ঠিত হও। তদ্দ্বারা উভয়বিধ কল্যাণ হয়।" ঐহিক কল্যাণ কাকে বলে? দেহ সুস্থ, চিত্ত সুখী, নীতির কার্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হচ্ছে, মানবে প্রীতি আছে, নরহিতৈষণা আছে— তা হলেই ঐহিক কল্যাণ হয়, তাঁহার উপাসনায় এ সবই সম্ভব হয়। পারত্রিক কল্যাণও এতে। কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা তা হয় না। উপাসনা করতে হবে।

উপাসনা কি? শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা তাঁতে চিত্ত সমাধান ক'রে বিশুদ্ধ প্রীতির যোগে তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়া। "তস্মিন্ প্রীতি-স্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ"— তাঁর সহিত প্রীতির যোগ এবং তাঁর প্রিয়

কার্য সাধন করা, ইহাই উপাসনা। তাঁকে আত্মাতে দেখে পরম সম্পদ রূপে প্রাণের দ্বারা আলিঙ্গন করা, তাঁকে আত্মার পরমাত্মা, পরমাশ্রয় ব'লে সেই চরণে মাথা রাখা, তাঁকে পরম ধন ব'লে হৃদয়ে রাখা, প্রাণের মধ্যে তাঁকে পেয়ে তাঁর স্তুতি বন্দনা প্রার্থনা করা, এই উপাসনা।

এই উপাসনাতে যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ হয় তাতে একটুও সন্দেহ নাই। মানব-চিত্ত মানব-মন সর্বদা নানা ঘটনায় আবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বদা অপবিত্রতার সংস্পর্শে আসছে, দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ছে, বিপদে ক্লেশে মগ্ন হচ্ছে, জীবনের উন্নত ভাব রক্ষা করতে পারছে না। যাতে মানব- মন ও চিত্তকে পবিত্র ও সুস্থ রাখে, যাতে হৃদয়কে উন্নত উদার ও মহৎ রাখে, তাতে জীবনের কল্যাণ হয় না? ঈশ্বর-উপাসনার মত মানব-মনকে উন্নত, সুস্থ ও পবিত্র রাখবার আর কি উপায় আছে?

আত্মার কল্যাণের জন্যে উপাসনা চাই। মানব-প্রকৃতি কেবলমাত্র সংসারের খাওয়া-পরা আমোদ-প্রমোদ নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারে না। অপর প্রাণীদের সহিত মানবের এইখানে পার্থক্য। ভৃঙ্গ উড়ে বেড়াচ্ছে, উড়ে উডে এ ফুল ও ফুল ক'রে বেড়াচ্ছে, যেই মধু পেলে অমনি ব'সে গেল, আর গুন্‌গুন্ করা নাই, কোনও দিকে দৃষ্টি নাই, একবারে ডুবে গেল, সে আর কিছু জানে না। ভৃঙ্গ মধু পান করতে করতে কি ভাবে যে, তার সেই মধুপানের পশ্চাতে আর কি কিছু আছে? আর কি কিছু জানবার, বুঝবার আছে? সে তা ভাবে না। ঐ যে বাঘ আহারের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চঞ্চল অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে, ও মাংসখণ্ড পেলেই তৃপ্ত ও ঠাণ্ডা হ'ল। সে কি সেই মাংস খেতে খেতে ভাবে, তার জীবনের অভাব পূর্ণ কি হ'ল? এই কি শেষ? এই আহারের পেছনে আর কি কিছু আছে? তার সে ভাবনা নাই। অপর

প্রাণীরা এই জগতের বর্তমান সুখেই তৃপ্ত, কিন্তু মানব-প্রকৃতি তাতেই তৃপ্ত হয় না। এক দিকে মানুষ সুখভোগ করছে, আর-এক দিকে ভাবছে, "তাই ত, এই কি এ জীবনের শেষ? আর কি কিছু নাই?" এক দিকে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছে, অপর দিকে ভাবছে, "দূর ছাই! এ কি হল!" এক দিকে মানুষ আমোদে লিপ্ত, অপর দিকে কিসের জন্য চোখের জল ফেলছে। এক মন নানা সুখের আয়োজন করছে, আর-এক মন তাকে চাবুক মারছে। সুখের মধ্যে ডুবে থেকেও মানুষ সুখ পাচ্ছে না, তৃপ্তি পাচ্ছে না। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার!

কত ধনীর সন্তান সুখে ভোগে মগ্ন হয়ে জগতে বেড়াচ্ছিলেন, যেমন লালাবাবু, কি শুনলেন একদিন একটি কথা, অমনি তাঁর মন বলল, "ও কি কথা শুনলাম!" এক ধোপার মেয়ে তার বাবাকে বলছিল, "দিন তো গিয়া, বাস্‌না জ্বালায় দেও।" ও কি কথা শুনলেন, সে কি, "দিন ত গেল, বাসনা ত জ্বালাতে হবে"! এ কি রকম মানুষের মন? এক দিকে ভোগাসক্তি, আর-এক দিকে "ছিঃ! ছিঃ!"

এই দ্বিবিধ প্রকৃতি দিয়ে তিনি আমাদিগকে ভোগে স্থির ও তৃপ্ত থাকতে দেন নাই, সুখ ও আরামের মধ্যে থেকেও অতৃপ্ত করেছেন। এই প্রকৃতি দিয়ে, এতটা অতৃপ্তি, ব্যগ্রতা এবং উদ্‌বেগ দিয়ে, অশান্তি দিয়ে, যদি নিজেকে না দিতেন তা হলে আমাদের অবস্থা কি শোচনীয় হ'ত! কিন্তু তিনি তা করেন নাই। তিনি তাঁকে দিয়ে রেখেছেন। আপনাকে দেবেন ব'লেই এইরূপ প্রকৃতি আমাদের মধ্যে দিয়েছেন। এই অতৃপ্তি দিয়েছেন এইজন্য যে, আমরা এই জগতের বিষয়-সকলের মধ্যে থেকেও এর উপরে উঠতে পারি।

পাখিরা নীড়ের মধ্যে বাস ক'রেও ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, অনন্ত আকাশের উন্মুক্ত বায়ুতে বিহার ক'রে পরমানন্দ লাভ করে। এই

পৃথিবীর অধিবাসী হয়েও পাখিরা উর্ধ্বে উঠতে পারে, এবং উপরে উঠে নবোদিত-সূর্যালোকে উন্মুক্ত বায়ুতে দুই পাখা বিস্তার ক'রে বিমলানন্দ লাভ করতে পারে; তাহাতেই তার পাখি-জন্ম সার্থক। ওরে পাখি, তোকে হিংসা করি, তুই এই মলিন ও দূষিত বায়ু ও কোলাহল হতে ইচ্ছামত অনন্ত আকাশে উড়ে যেতে পারিস।

মানবও ইচ্ছা করলে ঐ পাখির মত এই পৃথিবীর ভোগসুখ রোগশোকের মধ্যে বাস ক'রেও নবোদিত-সূর্যালোকের ন্যায় ব্রহ্মের আলোক যে চিদাকাশে প্রকাশিত হয় সেই চিদাকাশে যেতে পারে। উপাসনা সেই আকাশ, যেখানে বিধাতার প্রেমমুখের আলোক অরুণকিরণের ন্যায় মানবাত্মাকে স্পর্শ করে ও আনন্দিত করে। যদি ধর্ম সত্য হয়, ধর্ম যদি কল্পনার বিষয় না হয়, যদি ধর্ম পুরোহিতদিগের রচিত মানবকে ভ্রান্ত করিবার মন্ত্র না হয়, যদি ধর্ম সেই পরমপুরুষের সঙ্গে যোগের পথ হয়, তাহা হইলে উপাসনার মত পরম ধন আর নাই, যাহাতে আত্মা সেই প্রেমময় পুরুষের প্রেমমুখের জ্যোতিতে সেই নিত্য নব আলোকে বিহার করিয়া পরমানন্দ লাভ করে। সেইজন্য ঋষিরা উপদেশ দিয়েছেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও সেই উপদেশ দিয়েছেন, কেবল মুখের কথায় নয়, স্বীয় জীবনে দেখিয়েছেন, তাঁতে আমরা দেখেছি যে, ব্রহ্মের সহিত যোগসাধনই প্রকৃত উপাসনা। এই উপাসনার পথ প্রদর্শনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁর নিকট অত্যন্ত ঋণী। এই উপাসনা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা। তাঁহার শ্রবণ মনন কীর্তন নিদিধ্যাসনই উপাসনা। ঈশ্বর-চরণে কায়মনোবাক্যে প'ড়ে থাকলে তিনি তাঁর প্রেমমুখ দেখাবেন।

কি ক'রে এ উপাসনা করব? এ তত্ত্ব মুখস্থ ক'রে রাখবার বিষয় নয়। যেমন সংগীতে যদি কাউকে বলি, "একটা ছায়ানট গাও ত", সে

যদি কেবল মুখে "সা রে গা মা" ক'রে স্বরলিপিটা শুনিয়ে দেয়, বলে, "এই হ'ল ছায়ানট", তাতে কি শোনান হয়? তা হয় না। কণ্ঠে সংগীত না আনা পর্যন্ত গান শোনান হয় না। তেমনি উপাসনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করলে, বক্তৃতা করলে উপাসনা হয় না; উপাসনা ক'রে তার ফল জীবনে দেখাতে হবে। যে উপাসনার তত্ত্বসমূহ সাধন করে নাই, ভগবৎ-তত্ত্ব-সকল হজম করে নাই, পরিপাক করে নাই, তার পক্ষে উপাসনা ঐ গানের পরিবর্তে স্বরলিপি শুনান।

উপাসনা সাধনের বিষয়— সাধন করা চাই, হজম করা চাই, পরিত্রাণের অন্য পথ নেই। এ কবিত্ব নয়, ভাবোচ্ছ্বাস নয়, এ অতি সত্য কথা। ঋষিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করেছেন। ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান, তাঁহার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন মহিমা-কীর্তন ব্যতীত আত্মার উন্নতির অন্য উপায় নাই, অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভের অন্য কোনও পথ নাই। "বাঁশবনে ডোম কানা"-র মত ঘুরে বেড়ালে হয় না।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এই ধর্মসাধন আরও কঠিন। অপর সকল সম্প্রদায়ের লোক একজন সাধুর অনুকরণ করে অথবা একখানা বই বা শাস্ত্র অবলম্বন করে। এইরূপ একজন সাধু অথবা একটি শাস্ত্র অবলম্বন ক'রে ধর্মসাধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ব্রাহ্মেরা জগতের সকল সাধু এবং সকল শাস্ত্র গ্রহণ করেছেন; এঁরা যদি ধর্মসাধনের একটি পথ না ধরেন, উপাসনাতে দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত না হন, তবে এঁরা জগতে যে মহাবাণী শোনাবার ভার নিয়েছেন, তা শোনাতে পারবেন না।

ধর্ম ছেলেখেলা করবার জিনিস নয়— পুকুরে ছেলেরা যেমন খোলা নিয়ে ঝিলিমিলি খেলে, তেমনি কথা নিয়ে ঝিলিমিলি খেলবার জিনিস নয়। ধর্ম কি এবং তার সাধন করলে কি হয়, তা নিজের জীবনে পরিষ্কার ক'রে দেখাতে হবে। যিনি জগতের পরিত্রাতা, বিধাতা, যিনি আত্মার

প্রাণ, তাঁতে সুদৃঢ় হতে হবে, তাঁর কৃপাতে বিশ্বাস ও নির্ভর রেখে উপাসনায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে হবে; তোমার নিজের জীবনে, গৃহে, পরিবারে উপাসনাকে দৃঢ় রূপে স্থাপন করতে হবে। উপাসনার ন্যায় পবিত্র ব্যাপার বৃথা যেতে পারে না। সাধুগণ জীবনের দ্বারা দেখিয়েছেন যে, তাঁহার শ্রবণ মনন কীর্তন মানব-জীবনে অত্যাশ্চর্য আনন্দ ও পরিবর্তন আনয়ন করে। এ বৃথা যেতে পারে না। তাঁরা আরও কিছু বলেছেন। এ উপাসনা কেমন? যেমন মাছের পক্ষে জল, পাখির পক্ষে উন্মুক্ত আকাশ। যে মাছকে কলসীর মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখেছ তাকে যদি সাগরে ছেড়ে দাও, তার যেমন আনন্দ হয়; যে পাখিকে খাঁচায় আবদ্ধ রেখেছ তাকে যদি আকাশে উড়িয়ে দাও, তার যেমন আনন্দ হয়, নবজীবন লাভ হয়; যে বহুদিন কারাগারে বাস করেছে সে তার মা'র কাছে গেলে তার যেমন আনন্দ হয়, উপাসনায় মানবাত্মার ঠিক তেমনি আনন্দ ও নবজীবন লাভ হয়।

মুখের কথা বললে হয় না। মুখের কথায় কি হয়? সামাজিক বন্ধুত্বের মিলনে যে আনন্দ, তা কথায় প্রকাশ পায় না। অনেক সময় কথায় প্রেম ও আনন্দ মাটি হয়ে যায়। মিলনে যে কথা হয় সে কথাটা বন্ধুতা নয়। উপাসনা তেমনি শব্দ নয়। শব্দ না ক'রেও উপাসনা হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটিও শব্দ উচ্চারণ না ক'রে আত্মা পরমাত্মার শান্তিময় ক্রোড়ে নিমগ্ন থাকতে পারে, অনির্বচনীয় আনন্দ-সুধা-সাগরে মগ্ন থাকতে পারে। মহর্ষি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ভাবে অতিবাহিত করেছেন। সন্ধ্যার সময় জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়িয়েছেন, প্রভাতে দেখা গিয়েছে তিনি সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। সেই পরমপুরুষের বিশুদ্ধ আবির্ভাবের মধ্যে নিজেকে অবস্থিত দেখে তাঁতে সর্বস্ব অর্পণ ক'রে পরমানন্দ লাভ করতেন, সব একেবারে ভুলে

যেতেন। একেই বলে উপাসনা, প্রেমময়ের সহিত প্রেমে মিলিত হওয়া, দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

আমরা কি এই পথ দৃঢ় রূপে ধরেছি ? ব্রাহ্মদের গৃহে গৃহে পরিবারে পরিবারে এই উপাসনাকে দৃঢ় রূপে অবলম্বন করা উচিত।

আজ মহোৎসবের মহাপূজা। যাঁরা এখানে এসেছেন, যাঁরা তাঁর দয়াতে এত লাভ করেছেন, তাঁর দয়াতে সাধুভক্ত ব্যাকুলাত্মার সহিত সম্মিলিত হয়েছেন, আজ তাঁরা সকলে সেই পদে ভাল ক'রে পড়ুন, তাঁকে বিপন্নের ধন, নিরাশ্রয়ের আশা ব'লে ধরুন।

এই মুক্তিদাতা পরমপুরুষ জগতের পরিত্রাতার উপাসনায় মানব পরিত্রাণ পায়। তিনি সুখে দুঃখে মানবের আশ্রয় ও গতি। আজ সকলে তাঁর উপাসনাকে দৃঢ় রূপে অবলম্বন করুন, ঘরে ঘরে তাঁর অর্চনা বন্দনা প্রতিষ্ঠিত করুন, তাঁর সেবকসেবিকা হয়ে তাঁর উপাসনাকে দৃঢ় রূপে ধরুন এবং জীবনে সাধন ক'রে দেখান যে, মানবের পরিত্রাণ ও সদ্গতির জন্য এই উপাসনা এসেছে, এই ধর্মবীজের মধ্যে জীবন্ত শক্তি আছে।

বড় বড় দ্বীপের ইতিবৃত্ত অত্যন্ত বিস্ময়জনক। কোনও পাখির মুখ হতে সমুদ্রের মধ্যে একটা বীজ পড়েছিল, সেটা বালুকার মধ্যে প'ড়ে এক স্থানে গিয়ে ঠেকেছিল। সেখানে আর কিছু ছিল না। বালুকারাশি শেষে সঞ্চিত হয়ে উঁচু হয়ে উঠেছিল। সেই বীজ হতে অঙ্কুর হয়ে বৃক্ষ উৎপন্ন হ'ল, কালক্রমে সেই দ্বীপ জঙ্গলে আচ্ছন্ন হ'ল। একটি জীবন্ত বীজ হতে একটি দ্বীপ জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে থাকে।

ধর্মসাধন ঐ দ্বীপের মধ্যে বন হওয়ার মত। তোমার ভিতরে যদি জীবন্ত বীজ থাকে, তুমি যদি ব্রহ্মোপাসনায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে থাক, তবে তুমি যেখানেই থাক-না কেন, তুমি নবজীবন পাবে।

ভগবান্‌ করুন, আমরা জীবন্ত ভাবে দৃঢ় ভাবে স্থিরলক্ষ্য হয়ে তাঁহার উপাসনা অবলম্বন করি, এবং তাহা জীবনে এবং গৃহে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করি।

১৩১৭

আসল ও নকল ধর্ম

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

প্রাচীন ঋষিগণ বলেছেন, পরমাত্মা পরমপুরুষকে চক্ষুর দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; কারণ, তাঁর রূপ নাই, রূপ থাকলে দেখা যেত। "নাপি বাচা", বাক্যের দ্বারাও তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না। "নান্যৈর্দেবৈঃ", অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। "তপসা কর্মণা বা", তপস্যা এবং যাগযজ্ঞ করলেই যে তাঁহাকে পাবে, তাও বলা যায় না। তবে কি হবে, কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়? "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ", বিমল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যাহার অন্তঃকরণের বৃত্তি পর্যন্ত পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়েছে, সে যদি ধ্যানপরায়ণ হয়ে স্বীয় আত্মাতে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, তবে তাঁহাকে পায়।

আর-একটি বাক্যে ঋষিগণ বলেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।

এই পরমাত্মাকে "প্রবচন" অর্থাৎ শাস্ত্র পাঠ ক'রে, খুব ভাল ভাল বচনের দ্বারা পাবে না। অনেক ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবেচনা করে যে, শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেই হ'ল, তা হলেই তাঁকে পাবে—এ মহা ভ্রান্তি, বাক্যবলে তাঁহাকে পাবে না। "মেধা" কি না শাস্ত্রে প্রখর বুদ্ধি; খুব তন্ন তন্ন ক'রে শাস্ত্র বুঝতে পার, তা হলেই যে তাঁকে পাবে, তাও না। অনেক "শ্রুত"

অর্থাৎ বিবিধ শাস্ত্র তোমার দখলে থাকলেই যে তাঁকে পাবে, তাও নয়। তবে কে পাবে? "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। এক অর্থ— যাকে ইনি বরণ করেন, সেই লাভ করে, অর্থাৎ তিনি যাকে কৃপা করেন, যাকে দয়া ক'রে দেখা দেন, যার কাছে নিজেকে ব্যক্ত করেন, আত্মপ্রকাশ করেন, সেই দেখতে পায়। তুমি মাথা খুঁড়ে ম'লেও হবে না, তুমি মাথা নীচু ক'রে পঁচিশ বছর গাছে ঝুললেও হবে না। পবিত্রতা, সরলতা, তাঁকে লাভের জন্য ব্যাকুলতা যদি থাকে, তবে পাবে। অন্য অর্থ— যিনি বরণ করেন। যেমন বিবাহে বরণ করা— লাখ লাখ পুরুষ লাখ লাখ স্ত্রীলোককে দেখেছে, তার মধ্যে একজন পুরুষ একটি স্ত্রীলোককে আপনার ব'লে বেছে নিলে, একে বলে বরণ করা। একজন আর-একজনকে সকলের মধ্যে "আমার" ব'লে ধরে, সকলের মধ্যে "এই আমার এক" এই ব'লে একজনকে গ্রহণ করে, একেই বলে বরণ। তিনি বরণ করেন এবং সাধক তাঁকে বরণ করে। তিনি এই আত্মার তনুকে "স্বাম্", আপনার ক'রে নেন। বড় চমৎকার কথা। তিনি তোমাকে ধরতে, শিক্ষা দিতে, খাটাতে প্রস্তুত, তুমি ধরা দাও দেখি। তুমি তোমার টিকিটি তাঁর হাতে দিতে চাও না, পাছে ছিঁড়ে নেন! এই ভয়ে আপনাকে বাঁচিয়ে চল, তিনি ধরবেন কেমন ক'রে? যে ধরা দেয়, তাকে তিনি ধরেন।

মন্. ডি. কনওয়ে-লিখিত Sacred Anthology-নামক গ্রন্থে "অষ্টপদ"-শীর্ষক একটি গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ আছে। তাহা হইতে কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি—

"Amid Shastras, prayers and penances I roamed, but found not many jewels. Daily and nightly ablutions have left mind's impurity. Among all men he is the

chief whose pride the society of the good has effaced. He who knows his own lowness is higher than all. God removes all stain from him whose mind is clear of ill. He who has uprooted evil from his heart, sees his whole nature renewed. Of all places, that is the best where God dwells in the mind."

অর্থাৎ— আমি শাস্ত্র অর্চনা বন্দনা উপবাস বৈরাগ্য নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু কোথাও রত্ন পেলাম না। দিনে ও রাত্রে স্নান করলাম, কিন্তু জীবনের অপবিত্রতা গেল না। মানবের মধ্যে সেই ব্যক্তি প্রধান, যার অহংকার সাধুসহবাসে চূর্ণ হয়েছে। যে নিজেকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল ব'লে জানে সেই বড়। জগদীশ্বর তার সকল কলঙ্ক মোচন করেন, যার মনে মন্দ ভাব নাই। যে তাহার পাপবাসনা উৎপাটন করেছে তার প্রকৃতি নূতন হয়েছে। সকল স্থানের মধ্যে সেই স্থান শ্রেষ্ঠ যেখানে জগদীশ্বর মানবাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত।

সকল বস্তুরই একটা নকল ও একটা আসল আছে, এই নকল আর আসলে অনেক প্রভেদ আছে। এ অতি পুরাতন। নকল দেখে জ্বালাতন হয়েছি। এখন চাই আসল।

আগে নকল কি, তা বলি। মানুষ নকলের আবরণে প'ড়ে আসলটা পায় না। আসল বন্ধুতা কেমন মিষ্টি! তার বর্ণনা পড়লেও হৃদয় আনন্দিত হয়। জগতে নকল বন্ধুতা অনেক, আসল কম। নকল বন্ধুতা ও আসল বন্ধুতায় প্রভেদ দেখাচ্ছি—

একজন ভদ্রলোক অপর একজন ভদ্রলোকের বাড়ি এলেন। তিনি তখন কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে দেখেই বললেন, "এ কি! আজ কার মুখ দেখে উঠেছি! কোন্ দিকে সূর্য উদয় হয়েছে

যে, আজ এখানে তোমার পদার্পণ হ'ল!" তিনি বললেন, "কাজে বড় ব্যস্ত থাকি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি নাই। একটি কাজে তোমার কাছে এসেছি।" এই ব'লে কথাবার্তার পর তিনি উঠলেন। তাই দেখে গৃহকর্তা বললেন, "সে কি! উঠবে কি! কিছু খেয়ে যাবে, না খেয়ে যাওয়া হবে না।" "না ভাই, আমি খেয়ে এসেছি, এখন চললাম," এই ব'লে তিনি চ'লে গেলেন। তখন সেই বাবু বললেন, "বাঁচলাম! লোকটাকে ত দু'চোখে দেখতে পারি না— বদ্‌লোক।"

তাই শুনে সকলে বলতে লাগল, "সে কি মশায়! এই বললেন, কোন্ দিকে সূর্য উঠেছে, খেতে বললেন, এখন এমন বলছেন?" তিনি হেসে বললেন, "আরে, তা বোঝ না? ভদ্রতা রাখতে হয়, নইলে সংসারে চলবে কেন? ভারী বদ্‌লোক!" এই নকল বন্ধুতা।

আসল বন্ধুতাও দেখেছি এবং তা দেখেছি ব'লে মানব-জীবন মূল্যবান্ বোধ করি। আসল বন্ধু দেখেছি, আসল বন্ধু পেয়েছি।

একজন ভদ্রলোক সমস্ত দিন আফিসে কাজ ক'রে রাত্রি ১০।১১টার সময় বাড়ি এসেছেন, ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে এসেছেন; যেই বাড়ির ভিতর এসেছেন, অমনি তাঁর পত্নী বললেন, "ওগো, তোমার বন্ধুর স্ত্রী বুঝি আর বাঁচেন না।" শুনেই অস্থির হয়ে বললেন, "বল কি! শীগ্‌গির কিছু খেতে দাও।" এই ব'লে তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে, রাত্রি ১২টার সময় তাঁর বন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "ভাই, আর বাঁচাতে পারলে না?" বন্ধু বললেন, "ভাই, তুমি সমস্ত দিন শ্রম করেছ, তুমি ঘরে যাও।" তিনি বললেন, "ও কথা ব'লো না, আমি চ'লে যেতে পারব না। রাত্রি জেগে, খেটে খেটে, তোমার শরীর ভেঙে গিয়েছে, তুমি একটু শোও। আমি কাছে থেকে ঔষধ খাওয়াব।" এই ব'লে বন্ধুর স্ত্রীর রুগ্‌ণ দেহের কাছে দাঁড়াবামাত্র তার মুখ প্রফুল্ল হয়ে

উঠল। তিনি রাত্রি জেগে ব'সে ঔষধ খাওয়াতে লাগলেন। সকালে যখন মেয়েটি মারা গেল, তখন সে তার বন্ধুকে রাখবে কি, তাকে কে রাখে তার ঠিক নাই।

এমনি, শোকও নকল ও আসল আছে। পঞ্জাবে কেউ ম'রে গেলে আত্মীয় স্ত্রীলোকেরা দল বেঁধে দিনের মধ্যে একবার ক'রে কাঁদতে আসে। খেয়ে দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে যাচ্ছে, একে তাকে ডাকছে, "ও ভাই, আমি কেঁদে আসি।" এইরূপে সেজে গুজে দল বেঁধে এসে "ওরে আমার অমুক এমন ছিল, তেমন ছিল" এই রকম ক'রে এক ঘণ্টা কেঁদে, আপন আপন বাড়িতে চললেন। এই হ'ল নকল শোক। এদের মধ্যে শোক যে প্রধানত কাহার তা বোঝা দুষ্কর, কিন্তু যে স্ত্রীর পতিবিয়োগ হয়েছে, তাকে আর দেখিয়ে দিতে হয় না, সে উঠতে পারছে না, তাকে ধ'রে দাঁড় করান যাচ্ছে না।

এইরূপ, সুখও নকল ও আসল আছে। একজন বড়মানুষের ছেলে, ধনজন দাসদাসী কিছুরই অভাব নাই, তিনটা বিবাহ করেছে। তার প্রত্যেক স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনেরা সর্বদা চেষ্টা করছে, কি ক'রে তার কাছ থেকে কিছু আদায় ক'রে নেবে; দাসদাসীরা সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে, কি ক'রে দু'পয়সা চুরি করবে; বন্ধুগণ সর্বদা চেষ্টা করছে, কি ক'রে কিছু হাতিয়ে নেবে। সে জগতে একজনকেও বিশ্বাস করতে পারে না— শান্তিতে খেতে পারে না, সর্বদা ভয়, কোনও খাদ্যদ্রব্যে যদি কেউ বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকে। এই ব্যক্তির বাহিরে দেখতে কোনও সুখের আয়োজনের অভাব নাই, কিন্তু সুখ কি বস্তু তা সে জানে না। একেই বলে নকল সুখ।

আর একজন লোক আছে। স্বামী-স্ত্রী একটি ছোট বাড়িতে বাস করে। তাদের যে সামান্য আয় তাতে ভাল অবস্থায় থাকা যায় না;

কিন্তু তাদের ঋণ নাই। অবস্থামত মোটামুটি আছে; কিন্তু উভয়ে চকাচকীর মত পরস্পরের প্রেমে বাঁধা, সন্তানেরা ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তাদের জীবন জ্ঞান-ধর্মে উন্নত। সে বাড়ির চাকরেরা এত প্রভুভক্ত যে তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে; চাকর ছাড়ান অসম্ভব। তাদের কোনও দরকার হলে পাড়া-প্রতিবাসী দশজন এসে হাজির হয়। বলুন, আসল সুখ কোন্ জায়গায়?

তেমনি নকল ধর্মও অনেক আছে, বেশ দেখতে শুনতে। কি হিন্দুধর্ম কি মুসলমান ধর্ম, সকল ধর্মেরই নকল হয়, দেখতে শুনতে বেশ ভাল।

হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণ বাদ যাচ্ছে না। গঙ্গাস্নান, দানধ্যান, সব আছে। কিন্তু গৃহস্বামী বিধবার জমি কেড়ে নিচ্ছেন, মোকদ্দমা উপস্থিত হলে জাল করছেন, এর চেয়েও জঘন্য কাজ আছে, তা করছেন। বাহিরে ধর্মের আড়ম্বর আছে, ভিতরে কিছুই নাই, নকল ধর্ম।

লোকে দেখছে, অমুক প্রতি সপ্তাহে উপাসনার জায়গায় যাচ্ছে। অনেক বিষয়, অনেক কাজ একবার অভ্যাস হয়ে গেলে মনের বাহিরে গিয়ে পড়ে। স্কুলে পড়বার সময় আমার গা দোলান অভ্যাস ছিল, প্রথম প্রথম মনে হ'ত আমি দুলছি, শেষে আর বুঝতেই পারতাম না। শিশু যখন প্রথম চলে, তাকে প্রতি পদে সামলে চলতে হয়, সে প্রতি পদে মনে করে, "এই আমি চলছি", কিন্তু চলা অভ্যাস হয়ে গেলে কলিকাতা সহর ঘুরে এলেও তাতে মন দিতে হয় না, মনে থাকে না। তেমনি ধর্মও অভ্যাসবশত ক'রে যাচ্ছি; একজন রোজ মন্ত্র আওড়াচ্ছে, মালা জপ করছে, শেষে মালা জপ ক'রে আঙুল নাড়ছে, কিন্তু মন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনও বিষয়ে অভ্যাসপ্রাপ্ত হলে মন আর তাতে থাকে না। মন না থাকলে ধর্মকর্ম সবই নকল হয়।

আসল ধর্ম ভগবানে অকপট ভক্তি। খাঁটি বিশ্বাস বর্ণনা করি কি ক'রে? কোনও অকপট বিষয় কি কেউ বর্ণনা করতে পারেন? কাকে বলে অকপট প্রেম, তা বর্ণনা করা যায় না, অনুভব করা যায়।

নানা ভাবে যদি ভক্তির গুণানুকীর্তন করি, কবির ভাষায় যদি তাহা সুন্দর ক'রে বর্ণনা করি, তবে কি আমার অকপট ভক্তি হবে? এত সস্তায় কবে কার ভক্তিলাভ হয়েছে? তা হয় না। যেমন আসল প্রেম আপন বন্ধুতা ভাষার উপর নির্ভর করে না, "তোমাকে আমি এত ভালবাসি, না দেখলে থাকতে পারি না" প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োজন হয় না। যেখানে অকপট প্রেম আছে সেখানে একজন "ভাই" ব'লে অপরের গলা ধরল। ও কি 'ভাই' বলা, ও কি গলা ধরা! একজনের দুঃখ দেখে আর-একজন পাথরের মত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। এ বন্ধুতা কে বর্ণনা করতে পারে? কোনও অকপট বিষয় কেহ বর্ণনা করতে পারে না। একজন শাস্ত্রীয় বচন যথেষ্ট জানে, খুব শাস্ত্রপাঠ করেছে, জ্ঞানী ব'লে গণ্যমান্য হয়েছে, তার এ না থাকতে পারে, আবার একজন নগণ্য ব্যক্তিরও থাকতে পারে। এ বড় শক্ত ব্যাপার। কে যে ভক্তি পেয়েছে তাহা বলতে পারা যাবে না, কিন্তু কয়েকটা লক্ষণ বলা যেতে পারে।

অকপট ভক্তির প্রথম লক্ষণ এই, মানুষ সর্বোপরি, সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে ভগবান্‌কেই চাচ্ছে, তার পর আর সব। জীবনের সর্বপ্রধান বিষয় রূপে ভগবানের সহিত আত্মার প্রেমযোগ থাকে, ইহাই প্রধান লক্ষণ। এটা সর্বপ্রধান রূপে থাকা চাই। সংসার ছেড়ে জঙ্গলে যেতে হবে না, সন্ন্যাসী হতে হবে না, এই সংসারই ত সেবার ক্ষেত্র, এখানে ভাল খাওয়া-পরা সকলই থাকবে, কিন্তু জীবনের সর্বপ্রধান বিষয় রূপে ভগবানের সহিত স্বীয় আত্মার প্রেমযোগ আছে— এটা চাই।

দ্বিতীয় লক্ষণ, এই ভগবদ্‌ভক্তি সাধকের জীবনের সর্বত্র, সর্ব বিষয়ে, সকল কার্যে, সকল ব্যাপারে প্রবেশ করবে। এই নিয়ম সর্বত্র দেখা যায়। অন্নজল গ্রহণ করলে, বল হ'ল। এই শক্তি কেবল এক স্থানে আবদ্ধ থাকে না, এই একই শক্তি চক্ষুতে জ্যোতি, বাহুতে বল বিধান করে। চোখে শক্তি যাবে, বাহুতে যাবে না, তা হয় না। এক শক্তি মাংসপেশীতে সঞ্চিত হয়ে সর্বত্র কার্য করে, পায়ে চলবার শক্তি, মস্তিষ্কে চিন্তাশক্তি, বাহুতে ভারবহন-শক্তি রূপে কার্য করে। কিন্তু তার উৎপত্তি-স্থান পাকস্থলী। তেমনি যতক্ষণ ভগবদ্‌ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাস সাধকের অস্থিমজ্জাগত না হয়, তার প্রবৃত্তির মূল পর্যন্ত প্রবেশ না করে, ততক্ষণ সে ভক্তি পায় নাই। বেদীতে ব'সে "ঈশ্বর এমন, ভক্তি তেমন" ক'রে সুন্দর বর্ণনা কর, তার পর বেদী হতে নেমেই নানাপ্রকার নীচতা, অপরকে ঠকানর প্রবৃত্তি। দূর হোক্ এমন ব্রাহ্মসমাজের বেদী! দূর হোক্ এমন ক'রে ঈশ্বরের নাম করা! যখন অন্তরে ভক্তির সঞ্চার হবে তখন ইহা মানুষের চিন্তাতে ও আকাঙ্ক্ষাতে প্রবেশ করবে। ভক্তি পাপে ঘৃণা এনে দেবে। কথা দিয়ে রাখতে না পারলে প্রবঞ্চনা হয়, এতে লজ্জা হবে। এই এক লক্ষণ।

তৃতীয় লক্ষণ, অভিনিবেশ ; মন তাঁতে একবারে আচ্ছন্ন, তন্ময়, ঐ একই দিকে, আর কোনও দিকে মন নাই। ধর্মের জন্য কে কি স্বার্থ-ত্যাগ করছে তা তার মনেই হবে না। দেখেছি এমন মানুষ, জ্ঞানের আলোচনায়, বিজ্ঞানের আলোচনায় মানুষ সবক্ষণ অভিনিবিষ্ট হয়েছে, কি আশ্চর্য দৃশ্য হয়েছে! পড়েছিলাম বোধ হয় স্মাইল্‌স্-এর 'সেল্‌ফ্-হেল্‌প্' গ্রন্থে ফ্রান্সে চীনে-মাটির পেয়ালা প্রভৃতি তৈরির কথা। চীনে-মাটির জিনিস প্রথমে চীন দেশ হতে অন্য দেশে যেত ; যিনি ফ্রান্সে চীনে-মাটির বাসন -নির্মাণ-প্রণালী আবিষ্কার করলেন তাঁর নাম প্যালিসী। তিনি

গরিব মানুষ ছিলেন। তাঁর মাথায় একটা চিন্তা এল, তিনি সেই চিন্তায় তন্ময়, তাঁর ধ্যানে জ্ঞানে সেই চিন্তা প্রবেশ করল। তিনি ক্রমাগত ভাবেন, আর নানা রকম ক'রে আগুনে মাটি পোড়ান এবং গলান। পূর্বে মাটির বাসন তৈরি ক'রে যা সামান্য উপার্জন করতেন তাও বন্ধ হয়ে গেল, পোষাক জোটে না, এক প্যাণ্ট সম্বল হ'ল। তিনি কাজকর্ম ত্যাগ করলেন, সকলকেই বললেন, "দেখতে দাও, আমি পারি কি না।" প্যাণ্ট ছিঁড়ে গেল, স্ত্রীকে বললেন, "তুমি আমার পায়েই সেলাই ক'রে দাও।" শেষে কাঠ কিনবারও পয়সা নাই; কেউ কর্জ দেয় না। আর কিছুক্ষণ পরেই একটা ফল বুঝা যাবে। কাঠ কোথায়? আর কিছু না পেয়ে দুম্‌দাম্‌ ক'রে টেবিল চেয়ার ভেঙে আগুনে দিতে লাগলেন। স্ত্রী বারণ করতে গেলেন। বললেন, "চুপ, চুপ।" স্ত্রী কেঁদে পাড়ার লোককে বলেলন, "ওগো, তোমরা দেখ, আমার স্বামী বুঝি পাগল হয়েছেন! সব জিনিসপত্র ভাঙছেন আর আগুনে দিচ্ছেন।" সকলে ব্যাপার দেখে বললেন, "ওঃ! এতটা অভিনিবেশ! ও নিশ্চয় কিছু বুঝেছে।" কিছুক্ষণ পরেই দেখি তিনি আনন্দে নৃত্য করতে করতে বেরিয়েছেন। কি অভিনিবেশ!

মহাপণ্ডিত আর্কিমিডিসের কথা সকলেই জানেন, কি মহা চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। স্নান করতে করতে "ইউরেকা! ইউরেকা! পেয়েছি! পেয়েছি!" বলতে বলতে নগ্ন দেহে রাজপথে বহির্গত হলেন। সকলেই তাঁকে পণ্ডিত ব'লে জানত, ভক্তি করত, সেই অবস্থা দেখে বুঝল চিত্তের কি অভিনিবেশ।

ধর্মে কি এতদূর নেশা লাগতে পারে? পেরেছে। লালাবাবু ধোবার মুখে কি দুটো কথা শুনলেন তাতে কি নেশা ধ'রে গেল। দিবাবসানে ধোবা তার কন্যাকে বলল, "দিন তো গিয়া, বাস্‌না জ্বালায়

দেও।" তিনি রাস্তা হতে শুনে বললেন, "এ কি কথা!" কলিকাতার ধনিশ্রেষ্ঠ তিনি, কে কি কথা বললে, আর তিনি কি শুনলেন; সব ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়ে ফকির হলেন।

এই অভিনিবেশ যখন মানুষ দেখে, তখন চমক লেগে যায়। মানুষ যখন টেবিল চেয়ার ভাঙে তা দেখে সকলে বলে, "ও বাবা! এ উড়িয়ে দেবার বস্তু নয়।"

যাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ জেগেছে তাঁহাদিগকেও এই অভিনিবেশের নেশায় ধরেছিল, সব ছাড়াল, দারিদ্র্যে নিয়ে গেল। তবে লোকে দেখল যে, এতে কিছু আছে।

এই রকম মানুষের সংখ্যা বাড়ছে না। যদি বাড়ে, তবে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে বাধা দেয় কে? এক দল নরনারী এতে ব্যাকুল হয়ে এসে পড়ুক, আপনাকে অর্পণ করুক, স্বার্থনাশ ক'রে প্রচারব্রত গ্রহণ করুক, দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলুক, দেখ ব্রাহ্মধর্মের শক্তি বাড়ে কি না। খাবে দাবে ঘুমোবে, আরাম করবে, আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচার হবে! স্বার্থত্যাগশীল প্রচারকের দরকার হয়েছে। সকলের দ্বারা সব কাজ হয় না। সকলকে এ কথা বলছি না। ভগবানের বাণী শুনাবে, কোথাও একটু আঁচড় লাগবে না, তা হবে না। প্রকৃত ভক্তিতে অভিনিবেশ আনয়ন করে। ব্রাহ্মসমাজে যা কিছু কাজ হয়েছে, ঐ অভিনিবেশের দ্বারা। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন কার্য হতে অবসর গ্রহণ করলেন, তখন যদি তিনি স্বীয় ধনবৃদ্ধির দিকে মন দিতেন তবে কলিকাতার মধ্যে ধনীর শ্রেষ্ঠ হতে পারতেন। তাঁকে কি নেশায় ধরল, তিনি স্বীয় ব্যয়ে গ্রন্থ মুদ্রিত ক'রে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। যখন সর্বস্বান্ত দরিদ্র হয়ে ইংলণ্ডে গেলেন, সেখানেও সেই এক ধ্যান এক জ্ঞান। বড় বড় লোক মহাসভায় তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াচ্ছেন,

আমোদ করছেন, রাজা তারই মধ্যে এক কোণে একজনকে ধ'রে একেশ্বরবাদ ভজাচ্ছেন। এই এক বিষয় তাঁর ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ ক'রে তাঁকে তন্ময় করেছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মনে করলে মানে সম্ভ্রমে কলিকাতার ধনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে পারতেন। কিন্তু কি ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞানের নেশায় ধরল, তিনি ধনসম্পদের সম্ভ্রমের দিকে না চেয়ে তাতেই মগ্ন হলেন, তাহারই প্রচার করলেন।

তৎপর আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। তাঁতে কি অভিনিবেশ দেখেছি, তার বর্ণনা হয় না। তাঁর সঙ্গে যে-সকল সাধুপুরুষ গিয়েছেন, তাঁদের কি অভিনিবেশ, তার কি বর্ণনা হয়! এতেই শক্তি জেগেছিল।

আজ একান্ত অন্তরে প্রার্থনা কর, তিনি দয়া ক'রে সেই অভিনিবেশ আনয়ন করুন, যাহার সাহায্যে বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবা লাভ করি, আপনাকে দিকে তাঁর নাম প্রচার ক'রে ধন্য হই। আজ প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা এই সংকল্প পেয়ে অগ্রসর হই যে, ব্রাহ্মসমাজকে এমন থাকতে দিব না। মরিয়া হয়ে থাকি; যদি থাকি তবে তাঁরই থাকি, ব্রাহ্ম-সমাজের থাকি। আজ সকলে তাঁর কৃপাতে প্রকৃত ভক্তি প্রাপ্ত হই। আমাদের ধর্ম ভক্তির ধর্ম বলব অথচ শক্তি পাব না, ঈশ্বরের নাম করব, বল পাব না, এ কেমন কথা!

১৩১৮

ধর্মের প্রয়োগ

উদার আধ্যাত্মিক বিশ্বজনীন ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও ঘোষণা করা ব্রাহ্মসমাজের একটা কাজ। পূর্বে বলেছি, যতই ধর্ম বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, মানুষ যতই বিচারে প্রবৃত্ত হচ্ছে, ততই দেখছে, ধর্মের একটা উদার, আধ্যাত্মিক, বিশ্বজনীন ভূমি রয়েছে। সকলে অনুভব করছে যে, সত্যের অভিব্যক্তি সকল কালে সকল দেশে হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজ এই সার্বজনীন উদার ভূমির উপর, সত্যের উপর দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু ইহা ব্যাখ্যা ও ঘোষণা করা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় কার্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কাজ, উদার আধ্যাত্মিক সার্বজনীন ধর্মের তত্ত্বকে মানব-জীবনে পরিণত করা। ধর্মতত্ত্ব প্রণয়ন বা ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কাজ নয়। ধর্মকে ভিতরে নিয়ে আসা, জীবনে সাধন করার জন্যই ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয়। ধর্মতত্ত্ব কেবল জানলে হয় না, তার প্রয়োগ চাই। তাড়িতের বিজ্ঞান যিনি পাঠ করেছেন তিনি জানেন, তাড়িতে কি কি শক্তি আছে। তাড়িৎ আলো দেয়, তাপ দেয়, প্রেরণাশক্তি দেয়। তিনি বেশ ক'রে তা বুঝেছেন। কিন্তু তাকে আকাশ থেকে ধ'রে নিয়ে তার দিয়ে চালনা করা, পাখা চালান, ট্রামগাড়ি চালান, আলো ও তাপ উৎপন্ন করা আর-এক কাজ। ইহা প্রয়োগ। রেলওয়ে হচ্ছে, কোম্পানি জায়গা মেপেছেন, গাড়ি ইঞ্জিন এনেছেন, তা হলেই কি রেল হ'ল? স্টীম চাই, শক্তি চাই, প্রেরণা চাই। শক্তি দাও, স্টীম দাও, তবে রেল চলবে। সেরূপ ধর্মসাধন করতে হলে আধ্যাত্মিক প্রেরণাশক্তি চাই, প্রবল প্রেরণাশক্তি চাই। তা না হলে জ্ঞান বৃথা হয়ে যাবে। প্রেরণা চাই, শক্তি চাই, ধর্মকে মানব-জীবনে আনতে হলে শক্তি চাই।

ধর্মের প্রয়োগ

অধ্যাত্মযোগ ধর্মসাধনের অঙ্গ। ঋষিরা বলেছেন— শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হয়ে আত্মায় পরমাত্মা দেখার নাম অধ্যাত্মযোগ।

শান্ত হতে হবে। শোনা গিয়েছে যে, জার্মেনি ও ফ্রান্সে যখন যুদ্ধ হ'ল ফ্রান্স হেরে গেল। জার্মেন সেনাপতি ভন মলকি যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। যখন ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে, দেখা গেল, তিনি বন্ধুর কাছ থেকে চুরুট খেতে খেতে যুদ্ধের মধ্যে এলেন। ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছে, হাজার হাজার লোক ম'রে যাচ্ছে, তিনি শান্ত হয়ে ভাবছেন, সৈন্যদিগকে কোন্ দিকে নিয়ে যাই। যাঁরাই নিজেদের শান্ত রাখতে পেরেছেন তাঁরাই কাজ করেছেন। ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে, নেপোলিয়ন কুড়ি মিনিট ঘুমুলেন। যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ সেনার সেনাপতি, তিনি কি ক'রে ঘুমুতেন ? জেনারেল গর্ডন কখনও অস্ত্র নিতেন না, ছড়ি নিয়ে যুদ্ধে যেতেন। জন ওয়েস্‌লি যখন পাঁচ বৎসরের ছেলে, আগুন লেগে তাঁদের ঘর পুড়ে গেল। বাবা মা নেমে এলেন। তখন তাঁরা জানেন না যে, জন আসে নি। সিঁড়িতে আগুন লেগেছে, জানালায় জনের মুখ দেখা যাচ্ছে। একজন ভিজে কম্বল জড়িয়ে "ভয় নাই" ব'লে এগুলো, কিন্তু তখন সিঁড়ি ভেঙে গেছে। জনের আর বুঝি উদ্ধার হ'ল না! এমন সময় দেখা গেল কয়েকজন এক পাশে ধীর ভাবে কি পরামর্শ করছে। কোথা হতে টেবিল চেয়ার এনে টেবিলের উপর টেবিল, তার পর চেয়ার রেখে জানালায় উঠে ছেলের হাত ধরল, জন ওয়েস্‌লি বাঁচলেন। এই উত্তেজনার মধ্যে একভাব যে রক্ষা করে সেই শান্ত। কৃতকার্য হবার পক্ষে, ধর্মসাধনের পক্ষে এই শান্তভাব রক্ষা করা যে কি প্রয়োজন, তা কি ব'লে দিতে হবে ?

দান্ত হতে হবে। প্রবৃত্তি রোধ করা চাই। ইন্দ্রিয়-সকল ঘোড়ার মত উচ্ছৃঙ্খল হতে চায়, ঘন লাগাম দিয়ে টেনে আনতে পারে যে, সে

মানুষ। দান্ত না হলে অধ্যাত্মযোগ হবে না। তার পর উপরত হতে হবে, ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়ের পশ্চাতে যে মন রয়েছে তাকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিয়ে যাওয়া চাই। তিতিক্ষু হতে হবে, সহ্য করবার শক্তি চাই। সমাহিত হতে হবে। অর্থাৎ এক বিষয়ে চিত্তের সমাধান চাই। আর কি শক্তি চাই? নীতির দিকেও শক্তি চাই, সংযম চাই; মনের উপর কত শক্তি প্রয়োগ করলে তবে মন সংযত হয়, কর্তব্যজ্ঞানের উপর দাঁড়াতে পারে। মন সংযত না হলে নীতি হয় না। একজন "সুরাপান করব না" ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছে। কিন্তু প্রলোভন সামলাতে পারল না। ঐ যা! প্রতিজ্ঞার বাঁধন ছিড়ে গেল! আপনাকে ঠিক রাখতে হলে নৈতিক শক্তি চাই। এইরূপ, ধর্মজীবনের যে দিক দিয়ে দেখি—শক্তি চাই, শক্তি চাই, শক্তি চাই।

শক্তি চাই ব'লে গেলে ত শক্তি আসবে না। শক্তি আসে কিরূপে? মানব-প্রাণে যে শক্তি আছে তার প্রধান উৎস প্রেম। কত লোক ধনের জন্য পাগল, "ধন ধন" ক'রে প্রাণ পর্যন্ত সংশয়াপন্ন করছে; কেননা তার ধনের প্রতি প্রেম হয়েছে। কোনও ভদ্রলোক সারাদিন আফিসে খেটে ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বললেন, "দেখ, শীঘ্র কিছু খেতে দাও। আমার বন্ধু পীড়িত, এখনি যেতে হবে। রাত জাগার লোক নাই, আমাকে রাত্রে সেখানে থাকতে হবে।" স্ত্রী বললেন, "তুমি ভাল ক'রে কথা বলতে পারছ না, ক্লান্ত হয়েছ, একটু বিশ্রাম কর।" স্বামী বললেন, "তা ব'লে কি হয়, আমি বাড়িতে থাকতে পারছি না।" এই ব'লে চ'লে গেলেন। সারারাত বন্ধুর রোগশয্যাপার্শ্বে কাটল। ক্লান্তির মধ্যে রাত জাগবার শক্তি কে দিল? প্রেম।

এক মেয়ে ছিল। লোকে বলত, মেয়েটা ভারী বিলাসী, সুখপ্রিয়। মা খেটে খেটে মরে, মেয়ে আনন্দে বেড়াচ্ছে, ফুলটির মত নিশ্বাস লাগলে

ঝ'রে যায়, জ্যোৎস্নায় গায়ে ফোস্কা পড়ে। কিন্তু মেয়েটা যখন প্রেমে পড়ল, বিবাহ হ'ল, তার কাজের অন্ত নাই। সকল বিষয় দেখতে হয়, সন্তানপালন করতে হয়, সংসারের কত কাজে মন দিতে হয়। কোথায় তখন তার আলস্য, সুখপ্রিয়তা, বিলাস! এ ত সে মেয়ে নয়! বলুন ত কে শক্তি দিলে? সে উৎস কোথায় যাহাতে পরিবার-শৃঙ্খলা রাখবার শক্তি আসছে? সে শক্তি প্রেম। প্রেমই শক্তি দিচ্ছে।

এইরূপ শোনা গিয়েছে যে, ইটালি দেশে যখন অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়, এক পণ্ডিত সেই পাহাড়ে বাস করেছেন এবং ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। দেশের লোক বলতে লাগল, "নেমে আসুন! নেমে আসুন!" তিনি বললেন, "বিরক্ত ক'রো না।" ঐ যা, ইটালির সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অগ্ন্যুৎপাতে মারা গেল! পণ্ডিত কেন প্রাণ দিলেন? জ্ঞানানুরাগ। তিনি জ্ঞানকে ভালবাসেন। ম্যাট্‌সিনি কারারুদ্ধ হলেন, চোরের ন্যায় দেশে দেশে ভেসে বেড়াতে লাগলেন। কেন? স্বদেশের প্রতি প্রীতি, প্রেম হয়েছিল।

প্রেমে উৎসাহ, স্বার্থনাশের শক্তি, বল দেয়; প্রেমেই শক্তির উৎস। ভগবানের প্রতি প্রেম অর্পিত না হলে শক্তি আসে না। সংক্ষেপে, ভক্তিতেই শক্তি। ভক্তিই শক্তি। ভক্তি হলেই শক্তি আসে।

প্রশ্ন এই যে, নিরাকার ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষ, তাঁর প্রতি ভক্তি হওয়া কি সম্ভব? পৃথিবীতে যত ধর্মসম্প্রদায় আছে সকলেই অবতারবাদ স্বীকার ক'রে বলছে, "না, না, না, হয় না। নিরাকার পুরুষে ভক্তি হওয়া সম্ভব নয়।" তাই অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় অবতার গ্রহণ করেছে। এ বড় শক্ত কথা।

১৮৬০ বা ৬১ সালে ব্রাহ্মসমাজ যখন অবতারবাদ ত্যাগ ক'রে স্বাধীন ভাব প্রচার করতে লাগলেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান লালবিহারী দে

সংবাদপত্রে লিখলেন, ব্রাহ্মসমাজের মুক্তির শাস্ত্র "চিন্তা করি" এই ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র— আমি চিন্তা করি, সে চিন্তা করে, তুমি চিন্তা কর। যদি অবতারবাদ স্বীকার না করা যায় তা হলে ইহা ব্যতীত আর কি হবে? এক অর্থে বলা যায় যে, যাঁহাদের জীবনে ভগবানের শক্তি বিকাশলাভ করে তাঁরাই অবতার। মানুষ মাত্রেই অবতার হতে পারে। কিন্তু ভগবান্ মনুষ্যাকার ধারণ করেন, এ কি ছোট কথা! সমুদ্র দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। নল দিয়ে নীচে বাতাস লওয়া হচ্ছে। একজন যদি বলে, "আহা! এইই অসীম অনন্ত বায়ুমণ্ডল", তা হলে লোকে কি তাকে ভ্রান্ত বলে না? তেমনি একটা মানুষে যা দেখেছে, তার জন্য তাকে ভগবান্ বলবে? ছি! ছি! অবতার ছাড়া কি প্রেরণা আসে না? ঋষিরা কি প্রেরণা পান নাই? ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন ধর্মজীবন হয় না, ঠিক কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বুদ্ধ কোন্ অবতার ধরেছিলেন? তবে তাঁর ভাব এল কি ক'রে? হায়! হায়! যদি তেমন ব্যাকুলতা থাকত, যদি তেমন ক'রে জীবনের সুখ তুচ্ছ করতাম, যদি তেমন ক'রে প্রাণ হাহাকার করত, আমরাও অবতার হতাম। হে মানুষ, ব্যাকুল অন্তরে ভগবান্‌কে চাও, তোমাতে তাঁর শক্তি আসবে।

পূজার পূর্বে দেখি যে, কারিকর বেশ ক'রে মূর্তি গড়ছে। কই, সে ত করজোড়ে প্রতিমার সামনে দাঁড়াচ্ছে না। যখন চোখ আঁকছে, সাজ পরাচ্ছে, কই, তখনও করজোড়ে দাঁড়াচ্ছে না। কিন্তু যখন "অত্র তিষ্ঠ" প্রভৃতি ব'লে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হ'ল, তখন ভক্তিভরে গদগদকণ্ঠ। তখন দেবী এসেছেন। যখন দেবী বিদায় হ'ল তখন বুকে বাঁশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাসের সঙ্গেই ভক্তির আবির্ভাব। বিশ্বাসের অভাবে ভক্তির অভাব। ভক্তি কি আকার চায়? বন্ধুকে দেখতে ইচ্ছা করে কেন? বন্ধুর সুন্দর দেহের জন্য? না, না, ভালবাসা আছে ব'লে। প্রেম প্রেম

দেখতে চায়। প্রেমের intuitive sense আছে। কে কারে ভালবাসে ব'লে দিতে পাঁচ মিনিট লাগে না। একজন বলল, "আপনাকে ভারী ভালবাসি।" মন বলছে, না না, ও শুধু মিষ্টি কথা মাত্র। বন্ধু মিষ্টি কথা বলছে না, তবু বুকে নিতে ইচ্ছা। প্রেমের স্বাভাবিক জ্ঞান আছে। প্রেম প্রেমকে ধরে। প্রেম অদৃশ্য বস্তু নিয়ে থাকে। জ্ঞানে প্রেম, সত্যে প্রেম থাকে। প্রেম যদি না থাকে, তবে ভক্তি হবে না। প্রেম সীমা সহ্য করে না। তা হলে প্রেমের রাগ হয়। জ্ঞানও অসীমতার দিকে ছুটছে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে যা পড়েছি, ত্রিশ বৎসর পূর্বে জ্ঞানের যা সীমা ছিল, এখন আর তা নাই। জ্ঞানের বিষয়ে এই পর্যন্ত শেষ, ইহা বলা যায় না। অসীমতার দিকে জ্ঞানের গতি। সীমা দিলেই মন বলে, না। ভক্তি অসীমের মধ্যে বাস করে।

ঐ খাঁচার মধ্যে যে পাখি বাস করে, ওর কি চঞ্চলতা, কি অশান্তি! ও নড়তে পাচ্ছে না। ছেড়ে দাও। অসীম আকাশ ওর জন্য রয়েছে। খাঁচার মধ্যে যে অসুখী ছিল সে পাখা বিস্তার ক'রে গান করতে করতে অসীম আকাশে উড়ে যাচ্ছে। যশোরে যে মাছ ধরেছিল কলসীর ভিতর তাকে পুরে রেখেছে। ছেড়ে দাও। সে সরোবরের জলে ছুটোছুটি করছে, উৎসাহ এসেছে। মানব যেজন্য জন্মেছিল তা হ'ল না। তার আবাসস্থল ছোট, প্রবৃত্তি ছোট হয়েছে। ছেড়ে দাও পরমাত্মার চিন্তাতে। দেখ, তার জ্ঞান, প্রেম ছুটল অসীমের দিকে।

মানুষ হ'ল ঈশ্বরগ্রস্ত আত্মা। মানব-জন্মের সার্থকতা, গৌরব পরমাত্মার চিন্তায়, ভক্তিতে— এ কথা অতীব সত্য। এই ভক্তি এবং আমাদের দেশের ভক্তিতে প্রভেদ আছে। আমাদের ভক্তির ছিল জ্ঞানের সঙ্গে বিবাদ, কর্মের সঙ্গে বিবাদ; মানবের সেবা, জনহিতকর কার্যের সঙ্গে বিবাদ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যে ভক্তি তার জ্ঞানের সঙ্গে বিবাদ

নাই। এ ভক্তি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ে। যতই আত্মতত্ত্ব বিস্তার হবে, ততই ভক্তি বাড়বে। প্রাচীন কালের ভক্তিতে মানুষ প্রধান রূপে ভাবুকতা বজায় রাখবার জন্য চেষ্টা করত। ভাবকে অতি প্রিয় জ্ঞান করি। ব্রাহ্মেরা ভগবানের নামে উন্মত্ত হয়ে নাচেন, দেখতে চাই। কিন্তু তাঁর প্রিয় কার্যও ভক্তি বাড়াবে। শিল্প সাহিত্য প্রভৃতিও ভক্তির অনুকূল, ভক্তি সমগ্র মানব-জীবনকে গ্রাস করবে। ভক্ত মানব শিশু দেখে বলবেন, "আয় বাছা, একবার বুকে আয়!" এই ব'লে শিশুকে বুকে জড়াচ্ছেন। ভক্ত মানুষ প্রকৃতির শোভা দেখে বলবেন, "উঠ, উঠ, দেখ।" ভক্ত যখন সুমধুর সংগীত শুনলেন, তখন তাঁর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, "আঃ, কি শুনলাম!" এরূপ ভক্তির সঙ্গে কারুর বিবাদ নাই। এ ভক্তি জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্তব্যে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, মানবে প্রেম এনে দেয়।

এই ভক্তি মানব-জীবনে আনা ব্রাহ্মসমাজের কার্য। যদি না পারলেন, তা হলে মনের কথা বলি, ব্রাহ্মসমাজ দাঁড়াতে পারছে না। কি বিরাট্ আদর্শ চক্ষের সামনে রয়েছে। আর আমরা কি আছি! ব্যাকুলতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাব।

হে মানব, এই ভক্তি ধর। ভারতবর্ষ, ও ভারতবর্ষ, তা হলে তুমি কি ঘুমিয়ে থাকতে পার? ভক্তি অবতীর্ণ হলে চরিত্র কি মধুময় হয় না, পরসেবায় কি শক্তি প্রকাশ পায় না? আজ সকলে এই ভক্তি চান। ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাগণ, ভাইবোন, আজ করজোড়ে ভিক্ষা করি, নবভক্তিতে প্রাণ দাও। এই ভক্তি পাবার জন্য সাধুর চরণে বস, সদ্‌গ্রন্থ পড়, প্রার্থনা কর। ঐ পণ্ডিত যেরূপ গাছতলায় প'ড়ে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেছিল, "প্রাণ রাখতে হয় রাখ, একবার দেখা দাও।" সেইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা কর। নবভক্তি, নবভক্তি আসুক। ব্রাহ্মসমাজ নিশান হস্তে দাঁড়াক। ধর্মব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হও।

১৩২০

ধর্ম প্রাণে পাওয়া

ঋষিরা বলেছেন, যখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখন মানুষ অমৃত লাভ করে, মুক্তি পায়। এখন স্বভাবত প্রশ্ন হতে পারে, গ্রন্থি কি ও কিরূপে ভেদ করা যায়? "স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা। তরতি শোকং তরতি পাপং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতঃ ভবতি।" যেই ঈশ্বর লাভ করে সে 'তরতি শোকং', শোকতাপের অতীত হয়, 'তরতি পাপং', পাপ হতে মুক্ত হয়, হৃদয়ের গ্রন্থি-সকল ছিন্ন হয়।

আত্মাকে কি ক'রে মুক্ত অবস্থায় রাখা যায় তাহা ধর্মাচরণের উদ্দেশ্য। মন সংসারে থাকবে অথচ মজবে না, নানা বিষয় ভাববে অথচ মগ্ন হবে না, এ কি সম্ভব? এই ভারতে কত ইংরাজ বাস করেন। প্রতিদিন তাঁরা বিষয়কর্মে কত ছুটাছুটি করেন। ভারতবর্ষে তাঁরা আবদ্ধ রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের ভালবাসার বস্তু আর-এক দেশে। শেষ জীবনে স্বদেশে কিসে সুখে কাটাবেন তারই ব্যবস্থার জন্য এ দেশে বাস করছেন। এখানে তাঁদের শরীর, মন আর-এক দেশে। আচ্ছা, এই সব ইংরাজ যদি ভারতে বাস ক'রে ভারতকে ভুলে থাকতে পারেন, তা হলে তুমি আমি এ জগতে সেইরূপ ভাবে কেন থাকতে পারব না? কাজ করছি, ভাবব তাঁহারই কাজ করছি, তাঁকে ভালবাসি। এইরূপ বাস করা কঠিন নয়।

সাধুরা কঠিন বলে ভয়ানক দুষ্কর তপস্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মনকে ছিঁড়ে নিতে হবে। ও মানুষ, সংসারকে পা দিয়ে চাপ। আরও বলেন, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ?" স্ত্রী কি? তোমার ছেলে কি? তুমি কোথা থেকে এসেছ? দাও সব মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দাও, সংসার পরিত্যাগ কর। এ রাস্তা নয়।

তবে কোন্ শক্তির গুণে মনকে বাহিরের বিষয় থেকে তাঁর দিকে নিয়ে যাব? ট্রামে যাবে; তোমার মন রয়েছে, ট্রাম ধরতে হবে। গায়ের কাপড় লুটাচ্ছে, তাতে দৃষ্টি নাই, লোকে শব্দ করছে, তা শুনছ না; চোখ রয়েছে কেবল ট্রামের দিকে। ওগো, প্রধান চোখ যদি ধর্মে থাকে তা হলে কোনও বন্ধন থাকবে না।

কথা হচ্ছে, কি ক'রে মন নানা বিষয়ের মধ্যে থেকেও ভগবানে অর্পিত হবে? সে শক্তি কোথা থেকে আসবে? ভারী কঠিন কথা। কথা এই যে, ধর্ম কি জানা থাকলে শুধু হয় না। এর জন্য তপস্যা করতে হয়, সংগ্রাম করতে হয়। ধর্মশাস্ত্র হতে যদি দুটো বচন শুনতে পারি তা হলে ধর্ম হ'ল না। ধর্ম বোঝা আর পাওয়া এক কথা নয়। কেবল জানলে হয় না, পাওয়া চাই। বিজ্ঞানের বই প'ড়ে এবং ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও পি. সি. রায়ের বক্তৃতা শুনে তাড়িৎ এই রকম, তাড়িৎ ঐ রকম, জানলে তাড়িৎ ব্যবহার করা হয় না। জানা এক, আর আকাশ থেকে ধ'রে পাখা চালান আর-এক কথা। তাড়িতে এই হয়, ঐ হয়, জানলে হয় না, কাজে যদি লাগাতে না পারি মাথামুণ্ড বিজ্ঞান পড়ায় কি লাভ? ধর্মের এই পথ, ঋষিরা কি ক'রে ধর্মসাধন করেছেন, জানলেই ধর্ম জানা হ'ল, পাওয়া হ'ল না। যা শাস্ত্রে আছে, উক্তিতে আছে, তোমার আমার জীবনে নিয়ে ব্যবহার করা, চরিত্রে কার্যে লাগানই ধর্ম।

ব্রাহ্মসমাজ এই মহা উদ্দেশ্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। এক সচ্চিদানন্দ, চিন্ময়, নিরাকার, নির্বিকার পরমাত্মা, যাঁর তত্ত্ব সাধুর উক্তিতে ও জীবনে প্রকাশিত, তাহা মানবাত্মাতে শক্তি রূপে স্থাপন ও জীবন গঠন করবার জন্যেই ব্রাহ্মসমাজ। উপনিষৎ, বাইবেল, কোরান থেকে যদি পাঁচটা বচন তুলে দি, তা হলে কি ব্রাহ্মধর্ম পেয়েছি? তা

নয়। প্রাণে কি পেয়েছি? তুমি কি সচ্চিদানন্দ অনাদি ঈশ্বরকে প্রাণের কাছে পেয়েছ? যদি বলা যায় "পেয়েছি", তা হলে ঠিক জানা হয়েছে।

শক্তি এলে প্রকাশ হবেই হবে। মনের শক্তি বাহিরের পরিবর্তনে প্রকাশ পায়। তাড়িৎ তার দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তার প্রমাণ পাখা ঘুর্ ঘুর্ ক'রে ঘুরছে। ও মানুষ, যে পথে চলছিলে তাতে কি পরিবর্তন আসছে? হাঁ, যদি এসে থাকে, পথ বদলে যাবে। যার মুখ উত্তর দিকে ছিল, মিথ্যে প্রবঞ্চনা উদ্দেশ্য সিদ্ধি-সাধনে নিযুক্ত ছিল, ও মা, সে দক্ষিণ দিকে ফিরে দাঁড়াল! শক্তি এলেই পরিচয় পাওয়া যায়। নবদ্বীপে এক অন্ধ ছিল, চৈতন্য তাকে কি শোনালেন, সে চোখ চেয়ে দেখলে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক রাস্তায় প'ড়ে ছিল, যীশু ছুঁয়ে বললেন, "ওঠ।" সে উঠে বেড়াতে লাগল। এ-সব অলংকার; ইহার অর্থ এই যে, মানুষ শক্তিহীন নিস্তেজ হয়ে প'ড়ে ছিল, সে যে উঠতে পারে সে বিশ্বাস করত না, কি শুভ সম্মিলন হ'ল, ভগবানের নাম শুনল, শক্তি এল, সে ছেঁড়া মাদুর ঝেড়ে উঠল। ব্রাহ্মগণ, জীবনে কি ইহা দেখ নাই? বৃদ্ধ বয়সে কেউ কি সাক্ষী দেবে, শুনবে? কি শুনলাম সাধুদের মুখে! মহর্ষি, ব্রহ্মানন্দের নিকট কি শুনলাম যে ছেঁড়া মাদুর ঝেড়ে দাঁড়ালাম! হাইকোর্টের উকিল হব, আইন পড়ছিলাম। কি বাণী শুনলাম, ওকালতি উপাধি ছেড়ে ফিরে দাঁড়াল। ভগবানের নামে জীবনে শক্তি আসে। ভক্তির সঙ্গে শক্তি আসবেই আসবে। আর যে কাঁদছিল, ছটফট করছিল, মনে প্রশ্ন হচ্ছিল, "কেমন ক'রে উঠব?" তার নিরাশার মধ্যে আশা এসে পড়ল।

তার পর দুর্বলতার স্থানে বল আসে। কি আশ্চর্য! আমার পিতা বড় তেজস্বী ছিলেন। পিতার কথা অগ্রাহ্য করতে পারতাম না। আর যখন উপবীত ত্যাগ ক'রে জাত ভেঙে এলুম, বিবেচনা কর কি

ব্যাপার! বল আসে, ভয়কে ভয় ব'লে মনে করে না। "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারই ডাক।" প্রেমের ধর্ম শক্তি এনে দেবে। পাপ পরিহার ক'রে মানুষ পুণ্যকে আশ্রয় করবে, অন্যায়ের সহিত লড়াই ক'রে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করবে।

তার পর প্রেমের ধর্ম নরসেবার জন্য শক্তি দেবে। যে মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কি শুভক্ষণে ভগবানের প্রেমবাণী শুনল, আত্মাতে বল পেল, পরসেবার প্রবৃত্তি এল। যে মানুষ স্বার্থে ডুবে ছিল, ভগবানের কাজে লেগে গেল। এক আশ্চর্য বিচিত্র অদ্ভুত উপায়ে আত্মার আধ্যাত্মিক বল এনে দিল, শক্তি ফুটে উঠল।

মানুষ দেখেছে যে, আত্মার প্রেমের গতি অসীমতার দিকে। সংকীর্ণ হয়ে, সীমার মধ্যে সে থাকতে চায় না। বড়ই দুঃখের কথা যে, মানুষ এক-একজন মহাপুরুষকে ধ'রে ধর্মের আদর্শ খাড়া করেছে। তাতে ধর্ম সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কলসীতে বায়ু আছে, তা ব'লে কলসীর বায়ু যেমন সমস্ত বায়ুমণ্ডল নয়, মহাপুরুষের জীবনও সেরূপ ভগবান্‌কে সমগ্র ভাবে প্রকাশ করতে পারে না। মাছ কলসীতে বদ্ধ ছিল, তাকে নদীতে ছেড়ে দিলে, সে মুক্ত হয়ে আনন্দে ডানা নাড়তে নাড়তে চ'লে গেল; তার মৎস্য-জন্ম সার্থক হ'ল। পাখির ডানা বাঁধা ছিল, খাঁচার পাখিকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, সে দুই পক্ষ বিস্তার ক'রে অনন্ত অসীম আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল। তেমনি মানুষ ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত ছিল, ব্রাহ্মসমাজ তাকে অসীমতার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিলে, মানবাত্মা প্রেমানন্দে অসীম অনন্ত দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত হ'ল। জিজ্ঞাসা করি, মহাত্মা বুদ্ধ কোন্ সাধুর চরণে আবদ্ধ হয়েছিলেন? যীশু, মহম্মদ কোন্ সাধুতে বদ্ধ ছিলেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উক্তি পাঠ ক'রে দেখুন। কোন্ সাধুর

উক্তিতে তিনি আবদ্ধ ছিলেন? ব্রাহ্মসমাজ ধর্মের এই বদ্ধভাব, সংকীর্ণতা লোপ করেছেন; মানবাত্মাকে স্বাধীন, মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। চ'লে যাক্ যা কিছু ক্ষুদ্র, যা কিছু অসৎ; আসুক সৎ যাহাতে অনুরাগ, পবিত্রতা, শুদ্ধভাব। সাধুভক্তি ও স্বাধীনতা, অধ্যাত্মযোগ ও ভক্তির বিকাশ মিলিয়ে ব্রাহ্মসমাজে এক নবযুগের অভ্যুদয় হচ্ছে।

পূর্বাকাশে নবসূর্যোদয়ের আভা উঠতে না উঠতে পাখি যেমন পাখা বিস্তার ক'রে ডাকতে ডাকতে অনন্ত আকাশে উড়তে থাকে, তেমনি প্রেমালোকে অনন্তের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দাও, প্রেম-সমুদ্রে ছেড়ে দাও— "আত্মার ক্ষমতা কোথায় পাই?" ব'লে ব'সে থেক না। কোমর বাঁধ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, উঠে দাঁড়াও, দেখাও যে, সংসারে থেকেও মানবাত্মা নীচতার, পাপ-প্রলোভনের বশীভূত হয় না। তা হলে পরিবর্তন আসবে। ধর্ম যদি প্রাণে ধ'রে থাক, ধর্ম যদি জীবন-পথ আলো করে, তা হলে পরিবর্তন আসবে, শক্তি আসবে, দেশকে তুলে ধরতে পারবে। অধিক কি আর বলব! ভাইবোন, প্রার্থনা কর। মরার দিনে যেন বলতে না হয়, "'ও মা, তা ত হ'ল না। যেমন ক'রে ধর্ম পাব মনে করেছিলুম, তেমন ক'রে ত পেলাম না!" ইংরাজ যেমন যাবার সময় কিছু নিয়ে চ'লে গেল, তেমনি কি কিছু নিয়ে যেতে পারব? প্রার্থনা কর— প্রভু কৃপাময়, ধর্ম কি ছেলেখেলার জিনিস? ধর্ম কি দেখবার জিনিস? ধর্ম যে, হে ভগবান্, প্রাণে পাবার জিনিস। ধর্ম যে জীবন বদলাবার জিনিস, জীবন গড়বার জিনিস। সে ভক্তি কই? দাও ভক্তি দাও! চরণে মাথা রেখে বলছি, ভক্তের ব্যাকুলতা একবার দাও, তন্ময় ক'রে দাও, কিছু দাও, দাও। জীবন যে শেষ হচ্ছে। সন্তানদিগকে সে ভক্তি, ব্যাকুলতা, শক্তি দাও।

১৩২১

ধর্মসাধনের চতুর্থ উপায়

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুশ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

পরমাত্মাকে প্রবচন দ্বারা লাভ করা যায় না। যিনি কেবল বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, শাস্ত্রের বচন প'ড়ে গর্বে স্ফীত হয়ে থাকেন, শাস্ত্রে এই বলেছে, তা বলেছে— বচন তুলতে পারেন, তিনি ভগবান্‌কে পাবার উপযুক্ত নন। ন মেধয়া, প্রখরবুদ্ধিশালী তার্কিক চতুর হলেই যে ভগবান্‌কে লাভ করবেন, তা নয়। যে পরমাত্মাকে বরণ করে অথবা পরমাত্মা যাকে বরণ করেন, সে লাভ করে।

বিবাহে যেমন মেয়ে একজনকে বরণ করে, সেইরূপ ভগবান্‌কে বরণ করতে হয়। এই 'বরণ' কথাটি বিবাহেই প্রয়োগ করা হয়। এক ছেলে শত শত মেয়ে দেখেছে, কিন্তু কি মনে গেল, তার মধ্যে একজনকেই বরণ করলে। এক মেয়ে শত শত ছেলে দেখেছে, কিন্তু কি মনে গেল, তার মধ্যে একজনকেই বরণ করলে। মানুষ যখন তাঁকে জ্ঞানের বস্তু, আশার জিনিস, সারসত্য, প্রেমের জিনিস ব'লে ধরে, বলে, "তুমি আমার", তখন মানুষ তাঁকে বরণ করে। পরমাত্মা তার শরীর আপনার করেন, তিনিও তাকে বরণ করেন, তাকে বলেন, "এস, এস, তুমি আমার প্রিয়।" বিবাহেও দুই হতে বরণ আসে। এইরূপ ভগবান্‌কে যে বরণ করে, ভগবান্‌ও তাকে বরণ করেন— ইহাই ঋষিরা ব'লে গিয়েছেন।

তার পর গীতার বচন পাঠ করি—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, কর্মতেই তোমার অধিকার। ভাল যাহা, উচিত যাহা, তাহা করবে। যাতে কল্যাণ হবে তাই করবে। তুমি কৃতকার্য হবে কি অকৃতকার্য হবে, লোকে কি বলবে, তা ভাববে না। তুমি কর্মফলের প্রার্থী হবে না। সিদ্ধি-অসিদ্ধি বিষয়ে সমান হয়ে যাবে। একেই বলে যোগ।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

ভক্ত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন, ভয়ানক খায় যে তার যোগ হয় না, যে ইন্দ্রিয়সুখে ব্যস্ত সে যোগের অধিকারী নয়। একান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না। অতি নিদ্রাশীল বা অতি জাগরণশীলেরও যোগ হয় না। যে প্রয়োজনমত আহার-বিহার করে, সকল কর্ম নিয়মিত ভাবে করে, নিদ্রা ও জাগরণ আবশ্যকমত করে, সে যোগের অধিকারী, যোগ তার দুঃখ হরণ করে।

মানুষের সমাজে চারি শ্রেণীর ধর্মসাধক দেখা গিয়েছে।

এক, জ্ঞানের সাধক। এক দল আছেন যাঁরা জ্ঞানের দিক্‌টা ধরেছেন, সাধন করেছেন। তাঁরা ধর্মের সূত্র বেশ ক'রে পড়েছেন, নানা শাস্ত্রে কি বলে জানেন, ধর্মসমাজের ইতিবৃত্তে বেশ বিজ্ঞ। তাঁরা জ্ঞানে তৃপ্ত হয়ে থাকেন। তাঁরা জ্ঞানাভিমানী, অন্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকেন। গীতা কি বলেছে জান? ধর্মজ্ঞানে অহংকার জ'ন্মে যায়। এই ধর্মজ্ঞান সাধনের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। কেবল জ্ঞান পেলে সে জিনিস পাওয়া হ'ল না। তাহাদের জ্ঞান রেলওয়ের গাইড পুস্তকের মত। রেলওয়ে গাইডে আছে যে, কোন্ পথে কতটা স্টেশন পার হয়ে দার্জিলিং বা

লাহোর যেতে হয়, সেখানে কি কি দেখবার আছে, সব খবর পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে দার্জিলিং বা লাহোর দেখা হয় না। ধর্মের জ্ঞান যদি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ না ক'রে দেয়, তা হলে সে জ্ঞান বৃথা।

দুই, ভাব-সাধক। মানব-প্রকৃতিতে ভাবুকতা স্বাভাবিক। ধর্মে যে ভাবের উদয় হয়, তাতেই তাঁরা পরিতৃপ্ত। ছেলের প্রতি মা'র স্নেহ আছে, তাকে নিয়ে খেলেন, খাওয়ান, আদর করেন। ইহাই ভাব। সেইরূপ ভগবৎপ্রেমেরও ভাব আছে, তাতে পূর্ণ হয়ে ভাবুক প্রেমে গদগদ হয়ে যান। তাঁরা ভাবের বিকাশ ও প্রকাশকে প্রধান সাধন ও লক্ষ্য ক'রে থাকেন। ইহাও ঠিক রাস্তা নয়।

ভাব অনেক সময় কল্পনাকে আশ্রয় করে। গল্পে আছে— একজন লোক দোকান করেছে, ছাতু, চাউল, দাল প্রভৃতি নিয়ে দোকানে ব'সে চোখ বুজে আছে, ভাবছে, "ইহাতে কিছু লাভ হলে আমি অমুক জিনিসের ব্যবসা করব, তার পর লাভজনক খুব বড় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হব। এই রকম ক'রে আমার অনেক টাকা হবে, গাড়ি বাড়ি জুড়ি হবে।" সে দেখছে যেন সমুদয় হচ্ছে। "তা ব'লে বিবাহ ক'রে ভয়ে ভয়ে থাকব না, দারিদ্র্যে হীন হয়ে থাকব না, বুক ঠুকে বেড়াব। স্ত্রী যদি কোনও কথা বলে, স্ত্রীকে এক লাথি মারব।" পায়ের ঠেলায় তাঁর হাঁড়িকুড়ি ভেঙে গেল। তার চমক ভাঙল। তার ভাব হয়েছিল।

দুই বন্ধু একবার থিয়েটারে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখতে গিয়েছিল। থিয়েটার দেখতে দেখতে এমন মগ্ন হয়ে গেছে যে, একজন দুঃশাসন সেজে যখন দ্রৌপদীর কাপড় টানছে, অমনি সে ব'লে উঠেছে, "মার মার! লাগাও জুতো!" বন্ধু বললে, "থাম থাম! এ যে থিয়েটার!" তখন তার চেতনা হ'ল।

ভাব ধর্মজীবনের পক্ষে কম জিনিস নয়। তবে ভাবুকতার পথটা ঠিক নয়।

তিন, ক্রিয়া ধর্মের সাধক। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বাহ্য ক্রিয়াকর্মকেই ধর্ম ব'লে জানেন। দেশের লোক যা করে, শাস্ত্রে যে নিয়ম আছে, সাধুরা যা ব'লে গেছেন, তা পালন করাই ধর্ম মনে করেন। জমিদারবাবুর মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরি কিছুই বাধে না; কিন্তু বার মাসে তের পার্বণ করেন, নামসাধন, মালাজপ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ধর্মে ক্রিয়া যে থাকবে না, তা নয়। তবে ইহা একমাত্র পথ নয়। যখন দেখি যে, এ-সকল জীবনকে উন্নত করে না, তখনই বুঝি, বাহিরের ক্রিয়ায় প্রকৃত ধর্মসাধন হয় না।

চার, আধ্যাত্মিক ধর্ম। বর্তমান যুগের নবধর্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম, প্রাণের ধর্ম, প্রেমের ধর্ম। ধর্ম যখন বাহিরের জিনিস না হয়ে অন্তরের জিনিস হয়, তখন উহা মানুষকে নবজীবন দান করে। ইহাতে নব আনন্দ, নব শক্তি অনুভব করা যায়। ভগবানের নামে নব আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জেগে উঠে। পৃথিবীর মহাজনগণ এই ধর্মকেই বরণ করেছেন। এই ধর্ম যখন মানুষ লাভ করে, তখন ইহার কাছে সে আপনার সর্বস্ব ত্যাগ করে। বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ সকলের জীবনেই ইহা দেখা গিয়েছে। তাঁরা ভগবানের নাম করতে করতে নিজেদের ভিতরে এক পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন।

মহম্মদের বিষয় ভাবুন। ধনীর বংশে, পুরোহিতের বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, পুরোহিতের সম্মান তিনি পেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রাণ কি চাইল, কিছুতেই তিনি তৃপ্ত হলেন না। ভগবান্‌কে অন্তরের সহিত ডাকতে ডাকতে তাঁর হৃদয়-মধ্যে যেখানে নিরাশা ছিল, আশা জাগল। নব আশা, নব আকাঙ্ক্ষা, নব আনন্দ প্রাণে এল। কি আনন্দ পেলেন,

তখন দারিদ্র্য কিছুই নয়, লোকে তাঁকে শিয়াল-কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। মহম্মদকে মেরে ফেলবার জন্য চারিদিকে দাঁড়াল, তাঁকে মারবার চেষ্টা করতে লাগল। একবার তাঁর এক শিষ্য এসে বললে, "আমাকে আপনার কাপড় দিন, আমার কাপড় আপনি পরিধান ক'রে পাশের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। আমি শুনেছি; আজ রাত্রিতে জানালা ভেঙে ঢুকে আপনাকে মারতে আসবে। আমি আপনার কাপড় প'রে এই জানালার কাছে শুয়ে থাকব, সেই অবসরে আপনি অনেক দূর যেতে পারবেন।" মহম্মদ বললেন, "না, না, তা হবে না। তোমাকে তারা মেরে ফেলবে।" শিষ্য বললে, "না, আমি বলব, 'আমি অমুক, মহম্মদ নহি।' তারা আমাকে চেনে, মারবে না।" মহম্মদ পালিয়ে এক পর্বতগহ্বরে আশ্রয় নিলেন। এমন সময়ে এক মাকড়সা সেই গহ্বর-মুখে জাল বুনে দিল। শত্রুরা গহ্বর-মুখে জাল দেখে অন্য পথে চ'লে গেল।

কথা হচ্ছে এই যে, মহম্মদ ধনীর ছেলে, মক্কাতে সুখে থাকতে পারতেন, তিনি কিনা শেয়াল-কুকুরের মত পথে পথে ঘুরছেন। কেন? তিনি কিছু আনন্দ পেয়েছেন। নব আশা হৃদয়ে জেগেছে।

একবার যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, ক্লান্ত হয়ে মহম্মদ এক গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। শত্রু তাঁর মাথা কাটতে এসেছে। ঘুমন্ত অবস্থায় না কেটে তাঁকে জাগিয়ে বলল, "মহম্মদ, এখন তোমাকে রাখে কে?" মহম্মদ জোরের সহিত ব'লে উঠলেন, "কেন? প্রভু পরমেশ্বর।" এত জোরে বললেন যে, কেঁপে গিয়ে তার হাত হতে তরবারি প'ড়ে গেল। মহম্মদ সেই তরবারি উঠিয়ে বললেন, "বল, এখন তোমায় রাখে কে?" সে বলল, "তুমি রাখ।" মহম্মদ ব'লে উঠলেন, "রে কাপুরুষ, এমন বিপদেও ভগবানের নাম করতে পার না!" কোথা থেকে মহম্মদের এত শক্তি

এল? ভগবানের নাম ক'রে তাঁর প্রাণে নব শক্তি, নব আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল।

এই সাধনের দিক দিয়ে যদি না যাই, তবে কিছুই হ'ল না। যদি বাঁধা ধর্ম নিয়ে তৃপ্ত থাকলুম, নব আকাঙ্ক্ষা ও নব প্রেমে জীবন পরিবর্তিত হ'ল না, তবে কি হ'ল? কেবল ভাব, কর্ম নিয়ে থাকলে হবে না, নব আশা জাগবে না, নব আনন্দ হবে না। ব্রাহ্ম পরিবার এমন দেখতে চাই, যাদের দেখে মানুষ স্বার্থের উপর উঠবে, ইন্দ্রিয়পরতার সঙ্গে যে সংগ্রাম করছে তার হৃদয় বদলে যাবে। ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে কি হবে, যদি তাঁর নামে মানুষের হৃদয় বদলে না যায়? অতএব ধর্মসাধনের এই চতুর্থ উপায়— ভগবান্‌কে বরণ ক'রে, আত্মসমর্পণ ক'রে, তাঁর আরাধনা ক'রে নব আশা, নব আনন্দ, নব শক্তি, নব প্রেম আসবে।

প্রেমই এনে দেয় শক্তি। প্রেম যেখানে, সেখানে শক্তি আসে। ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের সময় এক ঘটনা হ'ল। ক্রমওয়েলের আদেশে একজনকে হত্যা করা হবে স্থির হ'ল। কারফিউ ঘণ্টা পড়বে, আর মারা হবে। সময় হ'ল, কিন্তু ঘণ্টা আর বাজে না। কেন? অনুসন্ধান করতে করতে দেখতে পাওয়া গেল যে, ঐ লোকটির প্রণয়িণী গির্জার দড়ি ও শিক বেয়ে উঠে ঘণ্টা বাজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। প্রেমের এই কাণ্ড দেখে লোকে অবাক্ হয়ে গেল। তার ফল হ'ল, হুকুম হ'ল আর তাকে মারা হবে না। প্রেমে কি শক্তি এনে দেয়!

প্রেমের শক্তি চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি। ভগবানে অকপট, ঐকান্তিক, সরল, বিনীত ভাবে যে একবার চিত্ত অর্পিত করে, কোথা থেকে যে তার শক্তি আসে, আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেতে হয়। তা না হলে মানুষ পাপে বাধা দিতে পারত না। ভগবানের চরণে যার প্রীতি, মতি, ভক্তি আছে, সে শক্তি পাবেই পাবে।

মাঘোৎসবের উপদেশ

ভাইবোন, তোমাদের বলছি, নাম শুনে শুধু তৃপ্ত থেক না, প্রেম আন। তার সঙ্গে নব শক্তি আসবে, নব আকাঙ্ক্ষা জাগবে, নূতন হবে। তোমাদের সংশ্রবে যারা আসবে, তারাও বদলে যাবে। অনেকের ভাষা ভাল না থাকতে পারে, কিন্তু যদি শক্তি থাকে, মানুষ তার সংশ্রবে এলে নিশ্চয়ই বদলে যাবে। তাই বলি, জ্ঞানের পথ নয়, শুধু ভাবুকতাও পথ নয়, ক্রিয়াকাণ্ড ধর্ম নয়। প্রেম, ভক্তি ও শক্তি যাতে এনে দেয়, সেই রাস্তা। জগদীশ্বর করুন, এ পথে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

১৩২২

নবযুগের ধর্ম

মানবের ধর্মচিন্তার মহা পরিবর্তনের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, যিনি এই দিনে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি কোরান হইতে মহম্মদীয় ধর্মের অর্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রথম একেশ্বরবাদের পরিচয় পান। বাইবেলের ধর্মের সহিত পরিচিত হইবার জন্য গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিয়া খ্রীষ্টীয় মূল ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। কাশীধামে বসিয়া পণ্ডিতদের কাছে ভারতীয় মূল ধর্মগ্রন্থ-সকল পড়িলেন। এই সব আদি পুস্তক পড়িয়া তাঁহার মনে ধারণা জন্মিল, এই যে একেশ্বরবাদ, তাহা ত সকল ধর্মের সার। একে সকল ধর্মের মূল ভিত্তি করিয়া দাঁড় করান যাক্। সকলকে তিনি এক উপাসনাক্ষেত্রে ডাকিলেন। বলিলেন, "যাহার যাহা বিশেষ রীতি আছে তাহা থাকুক। এস, আমরা সকলে এক ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।" এই আকাঙ্ক্ষায় এই ১১ই মাঘে তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডে গেলেন। সেখানে অসময়ে তাঁহার জীবন শেষ হইল। যে আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল তাহা ফুটাইয়া তুলিবার অবসর তাঁহার হইল না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের লৌকিক জীবনে, গার্হস্থ্য জীবনে যত সব অনুষ্ঠান রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে ভগবৎ-অর্চনার যোগ সংস্থাপনের চেষ্টা করেন। ছেলের জাতকর্ম হবে, তাহাতে ভগবানের অর্চনা কর; বিবাহে যখন দুটি প্রাণ মিলিত হবে, তখন ভগবানের অর্চনা কর; পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভগবানের অর্চনা কর। সামাজিক জীবনে এইরূপে ভগবৎ-অর্চনার প্রতিষ্ঠা করিবার তিনি চেষ্টা করিলেন।

পূর্বে যখন কোনও বিশেষ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, যখন কোনও

ধর্মকে ধারণ করিয়া সাধুরা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, এই যে ধর্মের নূতন আকাঙ্ক্ষা ও নূতন আদর্শ, তা আমাদের জাতিরই বিশেষত্ব। তার কারণ, একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, এক জাতির গ্রন্থ অন্য জাতির পাঠ করিবার সুযোগ ছিল না, এ জাতির সঙ্গে অন্য জাতির মিলনের সম্ভাবনা ছিল না। সকলেই মনে করিতেন, ধর্মটা তাঁহাদের জাতীয় সম্পত্তি; প্রত্যেক দেশের লোকেরা মনে করিতেন, তাঁহাদের আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপে ভারতীয় লোকেরা মনে করিলেন, তাঁহাদের ধর্ম অতি উচ্চ।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই দেশে ধর্মের দুইটি স্রোত ছিল। একটি সাধারণের পৌত্তলিকতা, অন্যটি ঋষিদের একেশ্বরবাদ। সকল প্রাচীন জাতিতেই ধর্মের এই দুটি স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেন, কিন্তু লৌকিক ক্রিয়াকলাপে বাধা দিতেন না। ঋষিরা অরণ্যে বাস করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। তার পরিচয় পাইতে হইলে একবার উপনিষদ পড়িয়া দেখুন। সেই শ্লোকগুলির মধ্যে যে গভীরতা আছে তাহা বর্ণনা করিবার গভীরতা আমার জীবনে নাই। কিন্তু লৌকিক ক্রিয়া সাধারণে রহিয়া গেল।

বর্তমানে ধর্মজগতে এক নূতন পরিবর্তন চলিয়াছে। সকল দেশের ধর্মগ্রন্থই মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠ্য হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম কোনও দেশবিদেশের জাতীয় সম্পত্তি হইয়া থাকিতেছে না। সকলেই ধর্মের সার্বজনীনতা ও উদার ভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হইতেছে। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ধর্মের এই ভাব আমাদের নিকট হইতেই সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ইহা মনে করিয়া অভ্রান্ত গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্র-বাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বর্তমান

যুগের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দেশবিদেশের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে এবং একে অন্যের ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিবার সুযোগ পাওয়াতে দেখিতে পাইতেছেন যে, সকলের মধ্যেই মিল রহিয়াছে।

তার পর জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি বর্তমানে যেরূপ হইতেছে, পূর্বে সেরূপ ছিল না। এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখিতে পাইতেছে যে, শাস্ত্রোক্ত সকল কথা অভ্রান্ত ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। বাইবেলে বর্ণিত রহিয়াছে, প্রথম দিনে এতটুকু সৃষ্টি হইয়াছিল, দ্বিতীয় দিনে এতটুকু হইয়াছিল ইত্যাদি, এইরূপে পাঁচ-সাত দিনে এই সুন্দর জগৎ সৃষ্টি হইয়া উঠিল। কিন্তু জ্ঞানালোচনা দ্বারা বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, পাঁচ-সাত দিন নয়, পাঁচ-সাত লাখ বছরে এই জগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও মানব-জাতির বিকাশের বর্ণনা শাস্ত্রের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস রাখিতে দিতেছে না।

সেইরূপ অভ্রান্ত গুরু -বাদও টিঁকিতেছে না। এক দেশের গুরু যাহা বলিয়াছেন, অন্য দেশের গুরুর উক্তির মধ্যেও তাহাই পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং কোনও বাক্যের জন্য কেহ বিশেষত্ব পাইতেছেন না। আবার অন্য দিকে নাস্তিকতা যে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তাহাও নীরব হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, ধর্ম যে মানুষ মানিয়াছে তাহা স্বাভাবিক কারণে নয়। কিন্তু এখন মানুষ দেখিতে পাইতেছে যে, ধর্মের মত সার্বজনীন, সার্বভৌমিক আর কিছুই নয়। মানুষ এখন নাস্তিকতা, অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরু -বাদ হইতে মুখ তুলিয়া লইয়াছে অথচ ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারিতেছে না। ধর্মাকাঙ্ক্ষা চারিদিকে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে।

যতই এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে ততই আধ্যাত্মিক, সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক একেশ্বরবাদ প্রবল হইয়া উঠিবে। মানুষ দেখিতে

পাইতেছে, দেবদেবী-বাদ মানবকে দিবার উপায় নাই। কিন্তু একেশ্বরবাদ, যাহা সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা ধারণ করিয়া যুগে যুগে সাধুমহাত্মারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সেই একেশ্বরবাদের উপরই মানবের সমুদয় সভ্যতা, উত্থান ও বিকাশকে স্থাপন করিতে হইবে। সকলেই স্বীকার করিতেছেন, মহত্ত্ব, নিঃস্বার্থতা, প্রেমের শক্তি ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া সম্ভব হয় না। 'যেহেতু' 'অতএব' দ্বারা মানুষকে উঁচু করিয়া দেওয়া যায় না। সংক্ষেপে বলি, জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, সংকল্পে দৃঢ়তা, কর্তব্যসাধনে নিষ্ঠা ও মানবে প্রেম বিচার বিতর্ক দ্বারা লাভ করা যায় না। জগতের মূলাধার, আদিকারণ ও প্রাণ যিনি, তাঁতে বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রীতি না জন্মিলে তাহা লাভ করা যায় না। সর্বদেশে এই ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে।

খ্রীষ্টানেরা দেখিতে পাইতেছেন, একেশ্বরবাদকে ধারণ না করিলে চলিবে না। আমাদের দেশেও যে ভাব ছিল তাহা বদলিয়া যাইবে এবং যাইতেছে। ভাব ছিল, জগতের উপর ও জীবনের উপর ঘৃণা। নিজেকে সকল থেকে আলাদা ভাবিয়া সাধন করাই উদ্দেশ্য ছিল। জগৎ ত্যাগ কর, মানুষকে ঘৃণা কর।

বর্তমানে শুভ দিন, শুভ ক্ষণ এসেছে। ঈশ্বরের লীলা কে বুঝিতে পারে? ভারতে সেই ধর্ম মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজকে লোকে এখনও সে চক্ষে দেখিতেছেন না, ব্রাহ্মসমাজের উপর লোকের সেরূপ ভাব নাই। ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়াছেন, নারীজাতির যথোচিত মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা ও শিক্ষা দিতেছেন, দেশের আরও উন্নতিকর বিষয়-সকলে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সুতরাং দেশের লোকের বিদ্বেষ ও বিরাগ জন্মান স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে কি হয়? যাঁরা বিদ্বেষ-বিরাগ

পোষণ করিতেছেন, তাঁরা বেশি ক'রে ঘরের ভাত খাবেন। আমি এখানে বসিয়া আছি ইহা যেমন সত্য, রজনীর অন্ধকারের পর আলোক আসিয়া এই ঘরকে উদ্‌ভাসিত করিয়াছে ইহা যেমন সত্য, আমার সম্মুখে এতগুলি লোক দেখিতে পাইতেছি ইহা যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে, জগতের উদ্ধারের জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য পূর্ণ পরাৎপর সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই দিনে সেই পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই আজ বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিবার দিন। এই ধর্ম-বিধান কেন ভারতবর্ষে আসিল? তার কারণ আমার বোধ হয় এই যে, ধর্ম বিষয়ে ভারতবর্ষ চিরকাল উদার। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, কোথায়? যেখানে এত বিরাগ, এত বিদ্বেষ, এত বিরুদ্ধ ভাব, সেখানে উদারতা কোথায়? কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। ধর্ম বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে খ্রীষ্টানেরা ভারী অনুদার। ভারতে নানা ধর্ম প্রচার ও ব্যাপ্ত হইয়াছে। এক ধর্মের পাশেই ঠিক তার বিপরীত অন্য ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। যদি এই সকলের বিবরণ পাইতে চান তবে প'ড়ে দেখুন একবার অক্ষয়-কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়'। যাহা হউক, বুঝি বা এই উদারতার জন্যই জগদীশ্বর ভারতবর্ষে এই ধর্মের অভ্যুত্থান করাইয়াছেন। ইহা নিশ্চিত, সুনিশ্চিত, অতি নিশ্চিত, অতীব নিশ্চিত, অত্যতি নিশ্চিত যে, জগতের কর্তা, বিধাতা, আশ্রয় ও পালক সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ তাঁর পূজা সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন। আমাদের বাহ্যিক রীতি ও প্রণালীর প্রভেদ কিংবা ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁর পূজা যে সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার যে আয়োজন হইতেছে তাহা আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ভক্ত মনীষীদিগের গ্রন্থাদি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁকে ধন্যবাদ যে, তিনি

আপনাকে জানিতে দিয়াছেন, আমাদের প্রেমকে পাইবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। আমরা ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এই বিশেষ দিনে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি।

১৩২৩

পরিশিষ্ট ১

এই উপদেশগুলি ১৩০৭ সালের পূর্ববর্তী হইলেও

প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয় নাই

মায়ের উপহার

আমাদের এ দেশের প্রথা এই যে, যে গৃহে ছোট ছোট [বালক-] বালিকা আছে সেই গৃহে যাইবার সময় আত্মীয় লোকে শূন্য হস্তে যান না। বিদেশ হইতে কেহ সমাগত হইলেই বালকবালিকাগুলি আনন্দকোলাহল করিয়া চারিদিকে ঘেরিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন তাহাদের হস্তে স্নেহের চিহ্ন -স্বরূপ কিছু না দিতে পারিলে মনে ক্লেশ হয়। এইজন্য পিতা বা পিতামহ বা পিতৃব্য বা পিতামহী প্রভৃতি গুরুজন যখন গৃহে আগমন করেন, তখন গৃহের শিশুদিগের জন্য কিছু না কিছু আ নিয়া থাকেন। কাহারও জন্য খেলানা, কাহারও জন্য নূতন বস্ত্র, যে শিশু যাহার উপযুক্ত তাহার জন্য তদ্রূপ দ্রব্য আনিয়া থাকেন।

গুরুজন গৃহে আসিলেই তাঁহাদের আগমনের চিহ্ন সকলেই দেখিতে পায়। কোনও শিশু নূতন কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছে, কেহ বা মিষ্টান্ন হস্তে খেলিতে গিয়াছে, কেহ নূতন খেলানা সঙ্গীদিগকে দেখাইতে গিয়াছে— পাড়ার লোকে সেই পরিবারের বালকবালিকাদিগকে দেখিয়া বলে, "ওরে, দাঁড়া দাঁড়া, তোদিগকে নূতন কাপড় দিলে কে?" তাহারা হাস্য করিয়া বলে, "কেন, আমাদের পিতামহী বাড়িতে আসিয়াছেন।"

আজ উৎসবের [দিন] যিনি আমাদের জননী আমাদের ঘরে আসিয়াছেন, তিনি কি শূন্য হস্তে আসিয়াছেন? তাঁহার এতগুলি পুত্রকন্যা যেখানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, যেখানে তাঁহার ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত এতগুলি সন্তান ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে, সেখানে কি তিনি শূন্য হস্তে আগমন করিতে পারেন? কখনই না। মাতা আজ আমাদের জন্য নানাবিধ দ্রব্য লইয়া আসিয়াছেন। যাহার যে-প্রকার অভাব তাহাকে তদ্রূপ দ্রব্য দিবেন বলিয়া আসিয়াছেন। তিনি আজ আমাদের জন্য বস্ত্র আনিয়াছেন। আমরা সংসারের পথে ধুলা-খেলা করিয়া তাঁহার

প্রদত্ত পুণ্যবসন মলিন ও ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি, তিনি আজ সে কাপড় খুলিয়া লইয়া আমাদিগকে নব বস্ত্র পরাইবেন।

আমরা মায়ের প্রদত্ত কাপড় মাথায় বাঁধিয়া পাড়ায় বাহির হইব। "আমাদের মা কেমন নূতন কাপড় দিয়াছেন, আমাদের মা কেমন নূতন কাপড় দিয়াছেন" বলিয়া পাড়ার লোককে দেখাইয়া আসিব। লোকে দেখিয়া পরস্পরের মুখ দেখাদেখি করিবে এবং বলিবে, "ওরে ভাই, এই হতভাগা লোকগুলো জীর্ণ বস্ত্র, ভিখারীর বেশ পরিয়া বেড়াইত, আজ ইহাদিগকে এমন বস্ত্র পরাইল কে? দেখ দেখ, তবে বুঝি ইহাদের ঘরে কে আসিয়াছে, তবে ইহাদের জননী ইহাদের ঘরে আসিয়াছেন।" আমরা উৎসব হইতে ফিরিলে আমাদিগকে দেখিয়া যদি লোকে বুঝিতে পারে যে, আমাদের ঘরে কেহ আসিয়াছিলেন, তাহা হইলেই বুঝিব, সার্থক উৎসবে আসিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন আমাদের উৎসবে আসা বিফল হইবে। পবিত্রস্বরূপ যদি উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আগমনের কোনও না কোনও চিহ্ন নিশ্চয় রাখিয়া যাইবেন।

১২৮৯। মধ্যাহ্ন

নির্ধারিত আচার্য উমেশচন্দ্র দত্তের অসুস্থতা হেতু শিবনাথ আচার্যের কার্য করেন

মহামেলা

উপদেশের উপসংহার

মাঘোৎসব যেন মহামেলার ন্যায়। মহামেলাতে যেমন কোন কোনও সময়ে ছেলে হারাইয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মোৎসবে গিয়া কখন কখনও ছেলে হারাইয়া যায়। সংসার-রাজ্য হইতে যদি একটি পাপী ব্রহ্ম-মেলাতে আসিয়াছিল, মেলা ভাঙিলে তাহাকে আর সংসার-রাজ্যে পাওয়া গেল না, পাপের ঘরে আর সে ফিরিয়া আসিল না। সংসারে তাহার জন্য হাহাকার উঠিল। সকলেই বলিতে লাগিল, উহাদের ছেলে হারাইয়া গিয়াছে।

স্ত্রী কিছুদিন অপেক্ষা করিলেন; পরে ভাবিলেন, "শুনিয়াছি, স্বামী মহাশয় ব্রহ্ম-মেলায় গিয়া হারাইয়া গিয়াছেন, একবার অনুসন্ধান করিয়া আসি পাওয়া যায় কি না।" খুঁজিতে আসিয়া তিনিও হারাইয়া গেলেন।

ছেলেটি গিয়াছিল, পরে বউটিও গেল, তখন জননী খুঁজিতে বাহির হইলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে সেই ব্রহ্ম-মেলাতে আসিলেন, আর অমনি তিনিও হারাইয়া গেলেন।

দেশ-মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই বলে, ব্রাহ্মসমাজ এক জাদুঘর— সেখানে যে খুঁজিতে যায়, সেই হারাইয়া যায়। ঈশ্বর করুন, ব্রাহ্মসমাজ এইরূপই হউক।

১২৯২

সমগ্র উপদেশ লিখিত হয় নাই

কুলপ্রদীপ

ভাই-ভগিনী! আশা করি ক্লান্ত হও নাই। আজি দেখ পিতার ঘরের কি শোভা! মন্দিরের গ্যালারির অর্ধেক অংশ আজি ভগিনীগণে পূর্ণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার মনে যে ভাবের উদয় হইতেছে, আজি আপনাদিগের সমক্ষে তাহা নিবেদন করিব।

একটি বাড়িতে অনেকগুলি স্ত্রীলোক ও একটিমাত্র বংশধর সন্তান আছে। তাহার অনেক পিসি, অনেক ভগ্নী। সে সন্তান সদাই দিদি, পিসিমা ও দাসদাসীর বুকে বুকে, কোলে কোলে ফিরে। তাহাকে কেহ মাটিতে নামায় না। সেই বংশধর সন্তানের কত আদর! পাড়ার লোকে বলাবলি করে যে, "ছেলে বয়ে না গেলে বাঁচি।" ছেলে ক্রমে বড় হইল। ভগিনী, পিসিদের বাড়ি হইতে রোজ নূতন নূতন পোষাক আসে। ক্লাসের ছেলেরা বলাবলি করে, "কোথা হইতে রোজ এ এত নূতন পোষাক পায়?" কেহ বা বুঝাইয়া দেয়, "উহার আবার নূতন পোষাকের ভাবনা কি? উহার কত দিদি, কত পিসি, তাহারা রোজ রোজ কত তত্ত্ব পাঠায়। উহার কত আদর! ও যে সাত মায়ের ছেলে।"

আমার মনে হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেই আদরের ছেলে। যার কাছে যাইতেছেন সেই আদর করিতেছে। যার যা আছে তিনি তাই দিতেছেন। কেহ লিখিয়া, কেহ বলিয়া, কেহ ভাবিয়া আপনা হইতে করিতেছেন। কেন উহার প্রতি এত যত্ন? উহা ভারতের কুলপ্রদীপ বংশধর বলিয়া। উহার দেব-অংশে জন্ম। পুরাকালে অসুরদের দৌরাত্ম্যে দেবতারা অস্থির হইয়া যখন নারায়ণের নিকট গিয়াছিলেন, তখন নারায়ণ তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা আপন আপন অংশ দিয়া এক নূতন দেব সৃষ্টি কর।" এ কালেও দেবাসুরে যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধে সেই নূতন দেবতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ভারত বহুকাল হইতে

পরপদদলীড়িত হইয়া, বহু শতাব্দী ধরিয়া অত্যাচার সহিয়া সহিয়া রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঈশ্বরের চরণে ভারতের ক্রন্দন পৌঁছিল, ঈশ্বর বলিলেন, "দেব-অংশে একজন জন্মিবে, সেই তোমার দুঃখ হরণ করিবে।" বুদ্ধের জ্ঞান, চৈতন্যের প্রেম, খ্রীষ্টের বিশ্বাস এবং মহাজনদের রক্ত লইয়া তিনি কুলপ্রদীপ বংশধর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে গড়িলেন। বড় দুঃখের বিষয় যে, আমরা ইহা আজিও বুঝিতে পারিতেছি না। ইউরোপ আমেরিকা কিন্তু আমাদিগের দিকে— সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে— সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে।

এতদিন যে প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই এখন তাহা হইতে চলিয়াছে। অভ্রান্ত গুরু ছাড়িয়া, শাস্ত্র ছাড়িয়া একেশ্বরবাদ থাকিতে পারে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা এতদিন হয় নাই; চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, মীমাংসা হয় নাই। দেশের মধ্যে জ্ঞানী লোক, চিন্তাশীল লোক তন্মনস্ক ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। চাহিয়া থাকিবারই ত কথা। বড় বড় কাজ করিবার জন্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। সত্যস্বরূপ নিরাকার ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিষ্ঠা করিতে, মানব-চরিত্রের হীনতা দূর করিয়া তাহাকে উন্নত করিতে, জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিতে, নারীকে শিক্ষা দান করিয়া উন্নত পবিত্র জীবনের অধিকার দিতে, দুঃখিনী বিধবার দুঃখ দূর করিতে, সমুদায় নরনারীকে উচ্চ পবিত্র স্বর্গীয় স্বাধীনতার পন্থা দেখাইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। উহাকে কি তবে কুলপ্রদীপ, আশা-স্থল বলিয়া লোকে মনে করিবে না?

বড় দুঃখের বিষয় এই যে, ইউরোপের লোকেরা আজিকালি আমাদের সম্বন্ধে বড আশা করিতেছেন না। তাঁহাদের মন নিরাশ হইতেছে। তাঁহারা বলিতেছেন, আমাদের দ্বারা কিছু হইবে না। ইহার কারণ কি? কারণ বাহিরের নহে। প্রকৃত কারণ দুইটি।

প্রথম কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্ম জীবনের আদর্শকেই সুস্থির ভাবে ধরিতে পারিতেছেন না। দশ, পনর, বিশ বৎসরের ব্রাহ্মেরাও দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। যে কয়জন অবশিষ্ট আছেন তাঁহারা যে ওরূপ করিবেন না, কে বলিল? আদর্শ যদি আমরা স্থির রাখিতে না পারি, তাহা হইলে কোনও মতে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিব না। আধ্যাত্মিকতা, নীতি, স্বাধীনতা, প্রেম ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ যেদিন ম্লান হইবে, সেইদিন আমাদের অধোগতি হইবে। যাঁহাদিগকে নেতা বলি তাঁহারাই যদি আদর্শ স্থির রাখিতে পারিলেন না, তবে আমরা কিরূপে পারিব? এই সকল ভাবিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের আস্থার হ্রাস হইতেছে।

দ্বিতীয় কারণ, গৃহবিবাদ ও অসদ্‌ভাব। ভারতে বিশ কোটি লোকের বাস। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম-সংখ্যা আট শত। এই মুষ্টিপ্রমাণ লোকে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহা কি আশা করিতে পারা যায়? তাহার উপর আবার এই এক মুষ্টি লোকের শক্তি কলহ, মতভেদ ও ভ্রাতৃবিরোধে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। সেইজন্যই লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে।

এই দুইটি অনিষ্ট নিবারণ করিতে হইবে। এক দিকে যেমন উজ্জ্বল বিশ্বাস চাই, তেমনি আর-এক দিকে মিলন চাই। পরস্পর স্বাধীন থাকিয়াও মিলিত হইতে হইবে। ঐকতান বাদনে সেতার, এসরাজ প্রভৃতি যন্ত্রসকল যে যার আপনার সুরে বাজে, অথচ সমস্ত মিলিত হইয়া এক তানে বাজে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সর্বদা এই দৃষ্টান্ত দিতেন। ব্যক্তিত্ব ঘুচিবে না অথচ মিলন থাকিবে, এক ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া সকলে নিজ নিজ কার্য করিবেন। যখন উদ্দেশ্য এক, তখন অমিল হইবে কেন?

ঈশ্বরের কাছে অপরাধ স্বীকার কর। কি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াছ! ভাবিয়া দেখ, কি করিয়াছ। কেবল পরস্পরকে ছোরাছুরি মারিয়াছ,

কেবল পরস্পরের সমালোচনা করিয়াছ। নিজের সমালোচনা কর। পাঁচখানা বাজনা এক সুরে বাজে না কি? এই কয় দিন তাহার দৃষ্টান্ত কি দেখিলে না? এই কয় দিন কেমন হইতেছে! যে পারিতেছে সে গাইতেছে। মানুষগুলা সব যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। এখন সব মলিনতা ঘুচিয়া গিয়াছে, এখন সকলেরই এক সুর।

আমাদের ঈশ্বর, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, আদর্শ সব এক। আপনাকে যত ভুলিয়া যাইবে তত সকলে এক হইবে, তত সকলে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবে। এমনি করিয়া লাগিয়া দেখ দেখি, শক্তি হয় কি না। মানুষের প্রতিকূলতা-বিদ্রূপ তুলারাশির মত ব্রহ্মকৃপা-বলে উড়িয়া যাইবে। ভয় পাইও না। ব্রহ্মকৃপার জয় নিশ্চয়ই হইবে। আবার পর বৎসরে যেন দুঃখের কথা শুনিতে না হয়। প্রতিজ্ঞা কর, যেন ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পার। ঢাকা, লাহোর যেখানে যে থাক, সকলেরই এক আকাঙ্ক্ষা, আশা ও উদ্দেশ্য। সকলে এক সুরে বাজিবে। এই ভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা কর।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কি সুবিধা! এখানে কোনও লোক অগ্রসর হইয়া বলিতেছে না যে, "আমাকে আশ্রয় কর, পরিত্রাণ পাইবে।" ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে কেহ আবরণ হইতে পারিতেছে না। কে খাওয়াইতেছে, কার অভয়-বাণী প্রাণে শুনিতেছ? তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম। আমাদের উপর তাঁহার কত আদর! তিনিই এই মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই যে বাড়িতে এত লোক খাইতেছে, কে টাকা দিয়াছে? আমরা গরিব, কোথায় টাকা পাইব? কত ব্যয় হইতেছে, কে টাকা দিয়াছে? প্রভু দিয়াছেন। যদি বল, এই মন্দির কে সাজাইয়া দিয়াছে? আমি বলিব, আমাদের জন্য মা সাজাইয়াছেন।

ভাই-ভগিনী! আমরা তোমাদের আদর-যত্ন করিতে পারি নাই।

তাহার জন্য দুঃখ করিও না। বাপের বাড়ি আসিয়া কে কবে অপরের আদরের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে? সেখানে সকলেই আপনি সব দেখিয়া শুনিয়া লয়, আপনার ইচ্ছামত আহার-বিহার করে। ভগিনী! যদি তোমাদিগকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাদিগকে বলিও, "বাপের বাড়ি গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম, মানুষগুলা ব্রহ্মনামে পাগল হয়েছে, নহিলে কাদায় পড়িয়া কাঁদে কেন?" ব্রহ্মকৃপার জয়! ব্রহ্মকৃপার রাজ্য নামিয়াছে। পাপের দুর্গ কম্পিত ও সুসমাচার প্রচারিত হউক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ! দশ বৎসরের বালক! তোমার দেবাংশে জন্ম, তুমি কুলপ্রদীপ। তুমি বাঁচিয়া থাক। আমাদিগকে তুমি রাখিবে। দেবাশীর্বাদ, প্রভুর আশীর্বাদ পাইয়াছ, তুমি আমাদিগকে রাখিবে। আমাদের কর্কশ কথায় আমাদিগকে ফেলিয়া যাইও না।

ব্রহ্ম-চরণে এস সকলে পড়ি, দেখি, পরিত্রাণ হয় কি না, ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হয় কি না। যাহারা ছাড়িয়া গিয়াছে তাহাদের নাম ধরিয়া পিতার কাছে কাঁদি; যাহারা পাপে ডুবিয়াছে, এস, তাহাদের জন্যও পিতার কাছে খুব কাঁদি। সকলে বল, "এমন কৃপা ফেলে কোথায় গেলে, বল কোথা আর জুড়াবে হৃদয়।" সত্যের জয় হইবেই হইবে; অহংকারের জয় হইবে না। পাপ চাপা দিয়া কি আগুন নির্বাণ করা যায়? ব্রহ্মাগ্নি দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, আর অগ্নিকাণ্ড হইবে। সম্মুখে কার ঘর? ছেলে সামলাও। নগরবাসী! রাত্রে ঘুমাইতেছ, দ্বিপ্রহর রজনীতে তোমাদের গৃহে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে, তখন দেখিবে আর রক্ষা নাই।

প্রবৃদ্ধ জলোচ্ছ্বাসের ন্যায়, হিমালয়-নিঃসৃত গঙ্গার ন্যায় ব্রহ্ম-চরণপদ্ম হইতে মুক্তির সমাচার নামিয়া আসিতেছে। পাপীর পরিত্রাণ এবার নিশ্চয়, ঈশ্বরের জয় নিশ্চয়।

১২৯৪। সায়াহ্ন

মানব-জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান

একেশ্বরবাদ প্রচার জগতে নূতন নহে। প্রাচীন উপনিষদ্ গ্রন্থ-সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার অনেক গ্রন্থ একেশ্বরবাদে পরিপূর্ণ। প্রাচীন হিন্দু একেশ্বরবাদের এই একটা প্রকৃতি ছিল যে, তাহা সাধারণ মনুষ্যের জীবনকে স্পর্শ করিত না। পণ্ডিতে পণ্ডিতে সে বিষয়ে আলাপ হইত; জ্ঞানিগণই সে-সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন ও সেই সকল মত পোষণ করিতেন। যাঁহারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোনও সময়ে বা সাধারণ লোকের অবলম্বিত ক্রিয়াকলাপকে উপহাস করিতেছেন, আবার আর-এক সময়ে নিজেরাই তাহার অনুষ্ঠান করিতেছেন। এক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিতেছেন যে, সেই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া মানুষ যদি সহস্র বৎসর হোম যাগযজ্ঞ করে, তাহাতেও কোনও ফল হয় না। আবার সেই ঋষিই হয়ত যাগযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এইরূপে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় পণ্ডিতদিগের উক্তিসকল পাঠ করিলেও উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সক্রেটিস, প্লেটো, ইপিকৃটেটস, মার্কস অরিলিয়স প্রভৃতি সুধীগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদিগের অনেকেও সাধারণ জনমণ্ডলীর অবলম্বিত মত ও অনুষ্ঠানকে বিদ্রূপ করিতেন, অথচ কার্যকালে সেই সকল মানিয়া চলিতেন।

ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানকে যে আবার মানব-জীবনে রাখিয়া দেখিতে হইবে, মানব-জীবন কিরূপ দাঁড়ায়— এ চিন্তা প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণের মনে উদয় হয় নাই। ব্রাহ্মধর্মের এই শিক্ষা। ব্রাহ্মধর্ম উপদেশ দিয়াছেন যে, এই ব্রাহ্মধর্মকে প্রথমে ব্যক্তিগত জীবনে রাখিয়া দেখিতে হইবে, তাহার প্রভাবে জীবন কিরূপ দেখায়। তৎপরে পরিবারে রাখিয়া দেখিতে হইবে, পারিবারিক জীবন কিরূপ হয়। তৎপরে সামাজিক জীবনে

রাখিয়া দেখিতে হইবে, সে জীবন তাহার সঙ্গে মিলে কি না। পরে রাজনীতিতে রাখিয়া দেখিতে হইবে, রাজনীতি কিরূপ হয়। ইহাই ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের দিকেও দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রাম উদয় হইতেছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন লোকে প্রথম প্রথম সেই পুরাতন বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের ভাবই গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানকে গৃহীর ধর্ম ও জনসমাজের কল্যাণকর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু প্রথম প্রথম লোকে তাঁহার সে ভাব পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তৎপরে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রথমে ভাবিলেন, ভাল, এই ব্রহ্মজ্ঞানকে জীবনে রাখিয়া দেখি। অমনি তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ব্রাহ্ম হইয়াছি সুতরাং মিথ্যা বলিতে পারিব না, ব্রাহ্ম হইয়াছি সুতরাং ঘুষ লইতে পারিব না, ব্রাহ্ম হইয়াছি সুতরাং পৌত্তলিকতাচরণ করিতে পারিব না ইত্যাদি বিশ্বাস ও তদনুরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও ব্রহ্মজ্ঞানকে যে পারিবারিক জীবনে রাখিতে হইবে, এ বিশ্বাস ব্রাহ্ম-সাধারণের মনে জন্মে নাই।

তৎপরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র আসিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মধর্মকে পারিবারিক জীবনে রাখিতে হইবে। অমনি নারীগণের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া গেল। গৃহধর্মের মূল রমণী, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্মের জ্যোতি দিতে হইবে, এই সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মন্দিরে নারীদিগের জন্য আসন কর, ব্রাহ্মিকা সমাজ স্থাপন কর, এই সকল চেষ্টা দেখা যাইতে লাগিল।

ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানকে সামাজিক জীবনে রাখিবার চেষ্টা হইল।

অমনি বিবাহনিয়মের সংস্কার, নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্মকে পারিবারিক জীবনে যেরূপ করিয়া রাখা উচিত তাহা আমরা এখনও রাখি নাই। এখনও ত কত শত ব্রাহ্ম পরিবার রহিয়াছে যেখানে প্রতিদিন পরব্রহ্মের পূজা হয় না; এমন অনেক ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যাঁহাদের এখনও এ বিশ্বাস জন্মে নাই যে, এই ব্রাহ্মধর্ম তাঁহাদের পক্ষে যেমন কল্যাণকর তেমনই তাঁহাদের পত্নীদিগের পক্ষেও কল্যাণকর। এ দিকে তাঁহারা উপাসনাকালে বলিয়া থাকেন, দেবদুর্লভ নামসুধা। কিন্তু এ কিরূপ দেবদুর্লভ নামসুধা, যাহা নিজ পরিবারে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে না? বাজারে বাহির হইয়া যদি একটি সুন্দর কপি কি দুইটি ভাল কমলালেবু পাও, অমনি কিনিয়া বাড়িতে আনিতে ইচ্ছা কর; কিন্তু এ কিরূপ দেবদুর্লভ নামসুধা, যাহা নিজে পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছ অথচ গৃহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ না? এরূপ সময় আসিয়াছে যখন আর ব্রাহ্মধর্মকে বাহিরে রাখিলে চলিবে না। ত্বরায় ইহাকে গৃহে ও পরিবার-মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদিগকে যত্নশীল হইতে হইতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে এ বিষয়ে মনোযোগী করুন।

১২৯৬। সাধনা

বিশ্বাস ও নির্ভর

বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ-চরিত্র সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, এক দিকে একটি অসহায় শিশু, অপর দিকে একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা। ঐ অসহায় শিশুকে রক্ষা করিবার কেহই নাই, অবলম্বনের কিছুই নাই, তবুও তাহার সাহস কত; দাঁড়াইবার স্থান নাই, তবুও সে দাঁড়ায়। অপর দিকে প্রবলপরাক্রান্ত রাজা তাহার উপর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। "আমার সন্তান হইয়া আমার সমক্ষে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে!" এই ক্রোধে তিনি নানা উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া শিশুকে পরাজয় করিতে কৃতসংকল্প।

এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, এই দুইজনের দুই বিভিন্ন স্থলে নির্ভর রহিয়াছে। শিশুর নির্ভর ঈশ্বরের উপরে; রাজার নির্ভর নিজ শক্তির উপরে, ধনের উপরে। এই যে দুই-জাতীয় চরিত্র এক স্থানে সন্নিবেশ করা হইয়াছে, জগতে এইরূপ দুই-জাতীয় চরিত্র সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা যীশুকে যখন হত্যা করা হয়, সেই চিত্র একবার মনে করিয়া দেখ। এক দিকে প্রতাপশালী য়িহুদী পুরোহিতগণ দণ্ডায়মান, রোমের সমগ্র রাজশক্তি তাঁহাদের অনুকূল; অপর দিকে একমাত্র সূত্রধরের সন্তান। তিনি নিজের কথা নিজে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "পাখির বাসা আছে, শেয়াল-কুকুরের গর্ত আছে, কিন্তু আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" রাজশক্তিহীন, বলহীন, পৃথিবীর মানসম্ভ্রম-বিহীন গরিবের সন্তান; অপর দিকে পরাক্রান্ত রাজশক্তি এবং পুরোহিতগণ।

যীশু যখন দেখিলেন, সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহার শিষ্যরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ইলি, ইলি, লামা সবাক্তানি— হে পিতা, হে পিতা! কেন তুমি

আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ ?” কেমন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর! দেখ এখানে কাহার জয়। হিরণ্যকশিপুর না প্রহ্লাদের ? য়িহুদী রাজার না গরিব সূত্রধর-তনয়ের ?

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন ঈশ্বর-উপাসনা আরম্ভ করিলেন, তখন সহরের অনেক লক্ষপতি ধনীরা তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে, “পুঁটি মাছের পোঁটার মতন রামমোহনের ধর্মের পোঁটা বাহির করিয়া দিব।” এঁরাই হিরণ্যকশিপু এবং রামমোহন প্রহ্লাদ। তাঁহাদের নির্ভর ছিল ধনের উপরে, জুড়ি গাড়ির উপরে, অতএব তাঁহারা হিরণ্যকশিপু।

রামমোহন রায়ের মৃত্যু হইলে পর অনেক উপাসক তাঁহার ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই মনে করিল, তাঁহার ধর্মের আগুন নিভিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোথায় যে একটু স্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত রহিয়াছিল, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ পুনরায় ঘরে আগুন ধরিল, দেখিতে দেখিতে আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাই আজ ব্রাহ্মসমাজের এইরূপ অবস্থা। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ছড়াইয়াছে, দুই শতেরও অধিক উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগতে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় ঈশ্বর-বিরোধী ব্যক্তির আশা কখনই পূর্ণ হয় না।

প্রকৃত বিশ্বাসীর লক্ষণ কি ? অকপটচিত্তে ঈশ্বরে নির্ভর করা। বিশ্বাসী যদি নিজকে দেখিতে পাইত, তবে তাহার ভয় হইত। বিশ্বাসী ব্যক্তি নিজকে দেখিতে পায় না। যে নিজকে ভুলিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই সত্য বলিয়া ধারণা করিতে পারে, সেই প্রকৃত বিশ্বাসী।

সকল ছাড়া সহজ, কিন্তু রাজসিক ভাব পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। কোনও মেলায় গেলে মানুষ কিছু না কিছু হারাইয়া আসে। সভায় গিয়ে

জুতো হারায়, গায়ের কাপড় হারায়। বল ত ভাইবোন! কে নিজকে হারাইবে? ঘরে গিয়া কে বলিবে, "নিজকে হারাইয়া আসিয়াছি"? কয়জন লোক এইরূপ ভাব লইয়া এখানে আসিয়াছ? যদি দশজন এইরূপ-ভাবাপন্ন লোক থাক, তাহা হইলেই দুর্গজয় হইবে। প্রহ্লাদ হওয়া বড়ই কঠিন। তোমার পার্থিব বলের কামানের গোলা কিরূপে তাহার বিশ্বাসের শরীরকে বিদ্ধ করিবে? এইরূপ বিশ্বাসের বলে যদি ব্রাহ্মগণ বলী হইতে পারে, তাহা হইলে আর ভাবনা থাকিবে না। "সকল জগৎ এক দিকে, তবুও কাহাকে গ্রাহ্য করিব না"— এইরূপ বিশ্বাসী হওয়া চাই। এরূপ হইতে হইলে নিজেকে ঈশ্বর-চরণে দিতে হয়। নিজকে না ছাড়িলে প্রেম হয় না। নিজকে ছাড়িলেই জগতের সাধুদিগের সঙ্গে, বন্ধুদিগের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলন হইবে। নিজকে ছাড়, মিলন আরম্ভ হইবে। প্রকৃত বিশ্বাসীর নিকট হিরণ্যকশিপুর পরাজয় হইবে। "জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ", কৃষ্ণকে পাইয়া পাণ্ডুপুত্রগণ জয়ী হইয়াছিলেন। অতএব হে ব্রাহ্ম ভ্রাতা-ভগিনীগণ! জীবনে সুখদুঃখ, প্রতিকূল অবস্থা আসিবে; কিন্তু প্রেমের বিরোধী কাজ কখনই করিও না। যদি সর্বান্তঃকরণে হৃদয়কে ঈশ্বর-চরণে দিতে পার, তবে হিরণ্যকশিপুর ভয় নাই। অতএব এস সবে আজ বলি, "আমাদের কাহার মাথা বড় হইবে, কাহার মাথা ছোট হইবে, তাহা আমরা জানি না। হে প্রভু, তোমার জয় হউক। তোমার ইচ্ছার জয় হউক।" ঈশ্বর করুন, আমরা যেন নিজকে তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে পারি।

১৩০১। সায়াহ্ন

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন উপদেশের কয়েকটি অংশ প্রথম সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাহার কয়েকটি এখানে সংকলিত হইল

পোষা পাখি ও বনের পাখি

১৮ পৃষ্ঠা। ৩ ছত্র। "গৃহে ফিরিতে পারে?" ইহার পরে

ব্রাহ্ম ভাই! ব্রাহ্মসমাজে একটি লোককে আসিতে দেখিয়া যদি তোমার সেইরূপ আনন্দ হয়, তবে কি আর কেহ এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে পারে? কেহ এখানে প্রবেশ করিয়া যদি দেখে তাহার আগমনে আনন্দকোলাহল উঠিয়াছে, তবে কি এ আকর্ষণ ছাড়িয়া কেহ যাইতে পারে? তাহা না দেখিয়া যদি দেখে প্রণয় নাই, সদ্ভাব নাই, কাহারও প্রতি প্রাণের টান নাই, তবে যাহারা এখানে আসিবে তাহারা যে ফিরিয়া যাইবে। ধর্মসমাজে সকলকে মুক্তির মন্ত্রে আকর্ষণ করিতে হইবে এবং সকলের জন্য প্রেমের দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। একটি ভাই যদি বিপথ হইতে ফিরিয়া আসে, তবে আনন্দ করিব; একটি ভাই যদি অনুতাপ করিয়া আসেন, সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া আনন্দধ্বনি করিব; এ রাজ্যে পাপীর উদ্ধার দেখিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিব।

১৮ পৃষ্ঠা। ৬ ছত্রের পর

ব্রাহ্মসমাজকে যদি বাস্তবিক পাপী-জনের আশ্রয়স্থান করিতে বাসনা হয়, দুঃখীদিগের হাতে ধরিয়া অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সহায়তা করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে মুক্তির লক্ষণ দেখাইতে হইবে। আমাদিগের মধ্যে সে চিহ্ন কই, যাহা দেখিয়া সংসারের পাপী সকল ভুলিয়া এখানে দৌড়িয়া আসিবে? পাপী-জগৎকে আকর্ষণ করিবার পূর্বে আমাদিগের মুক্তিলাভ করিতে হইবে। কিরূপে আমরা মুক্ত হইব? যে দণ্ডে পবিত্রতার আধারপুরুষে আত্মা বিহার করিতে আরম্ভ করিবে, সেই সময় হইতে মুক্তি আরম্ভ হইবে। যেখানে প্রীতি সেইখানেই মুক্তি। এ প্রীতি পাইলে বন্ধনপাশ ছিন্ন হয়, পাপ-

প্রলোভনের চিহ্ন তিরোহিত হয়, মুক্ত হইতেছি— স্পষ্ট বুঝিতে পারি। পরমেশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাবে আশ্রয় পাইয়া অনুভব করিতে পারি যে, নবজীবন লাভ করিয়াছি। এই প্রকারে যে আত্মা মুক্ত ও স্বাধীন হয়, তাহার আর ধর্মপ্রচারের জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে হয় না, শব্দাড়ম্বরে জনাকীর্ণ গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে হয় না। তাহার এমন এক মাধুরী জন্মে, যে দেখে তাহারই মন ভুলে। যে তাহার মুখ দেখে সেই বুঝিতে পারে, লোকটি মুক্তি পাইয়াছে। এরূপ লোকের মুখ দেখিলে প্রাণে আরাম হয়, ধর্মোৎসাহ বর্ধিত হয়, পাপাসক্তি ম্লান হয়, মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়।

ধর্ম সমাজের জীবনী-শক্তি

৪৮ পৃষ্ঠা। ১৩ ছত্রের পর

সমাজের মধ্যে দেখি, কেহ জ্ঞানপ্রধান, কেহ ভাবপ্রধান, কেহ কর্ম-প্রধান। মানবীয় অজ্ঞতাতে জ্ঞানী যিনি তিনি বিবেচনা করেন, "এ ভাবুক লোকটা ইহার মধ্যে কেন? ইহার এখানে প্রয়োজন কি আছে? এ হয় আমার মত হউক, নতুবা ঈশ্বরের ঘর হইতে বাহির হইয়া যাউক।" ভাবুক যিনি তিনি বিবেচনা করেন, "ঐ লোকটা কেন ওরূপ 'জ্ঞান জ্ঞান' করে, ও ব্যক্তি ধর্মরাজ্যে কেন? উহার ক্ষেত্র ত জগতে আছে, সেখানে কেন যায় না? এখানে মরিতে থাকে কেন? ও হয় আমার ন্যায় হউক, নতুবা বাহির হইয়া যাউক।" কর্মী যিনি তিনি বলেন, "নরসেবাই ঈশ্বরের সেবা। সে সেবাতে যার প্রবৃত্তি নাই, তাহার প্রেমের মূল্য কি আছে? ও ভাবুক লোকটাকে আমি দেখিতে পারি না, ও ব্যক্তি ধর্মরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? উহার দ্বারা ধর্মরাজ্যে কি উপকার হইবে?"

এরূপ ভাবে আমাদের অবিশ্বাসের গভীরতাই প্রকাশ করে। যিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর আমাদিগকে আনিয়াছেন, তিনি কখনই এ কথা বলিতে পারেন না। তুমি কে হে বাপু, যে, খোদার উপরে আবার কারিগরি করিবে? জ্ঞানী, তুমি যে কর্মীকে তাড়াইতে চাও, তুমি কি মনে কর, ও ব্যক্তিকে আনা পরমেশ্বরের ভুল হইয়া গিয়াছে? এখন তোমাকে সেই সংশোধন করিয়া লইতে হইবে? এই বেদীর উপরিস্থিত পুষ্পগুচ্ছটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তা কর, যদি ইহার সমুদায় ফুলগুলি গোলাপ হইত, যদি সমুদয়গুলি এক বর্ণের এক আকারের ও এক গন্ধের হইত, তাহা হইলে এটি এত স্পৃহণীয় হইত কি না?

কখনই না। কিন্তু যে মালী এটিকে করিয়াছে সে বুদ্ধিমান্, কারণ সে নানা বর্ণের নানা আকৃতির নানা গন্ধের ফুল ইহাতে দিয়াছে, তাহাতে ইহার বিচিত্রতা ও সৌন্দর্য বাড়িয়াছে। সেইরূপ মনে কর, যে অনন্ত-লীলাময় মালী এই ব্রাহ্মসমাজটিকে পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় বাঁধিতেছেন, তিনি গূঢ়-কল্যাণোদ্দেশেই বিচিত্র ভাব ও বিচিত্র শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকেই ইহার মধ্যে আকৃষ্ট করিয়াছেন। জ্ঞানী ভাই, তুমি এই তোড়াতে থাকিবে, কর্মী ভাই, তুমি ঐ ভাবুকের পাশেই বসিবে। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে। তোমরা যদি পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু অনুদার ও অক্ষমাশীল হও, তাহাতে প্রকাশ পাইবে যে, ব্রহ্মশক্তি জীবন-রূপে তোমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন না।

৪৮ পৃষ্ঠা। ১৬ ছত্র। "মুখশ্রীর শোভা।" ইহার পর

ধর্মসমাজের অনেক প্রকার বাহ্যিক শ্রী-সৌন্দর্য থাকিতে পারে। আমাদের এই মন্দিরটি কেমন সুন্দর, এখানে অনেকে কেমন সুন্দর সাজিয়া আসেন, কেমন বড় বড় গাড়ি দ্বারে দাঁড়ায়। এ-সকল বাহ্যিক শোভার দিকে যাহার দৃষ্টি আবদ্ধ, সে মূর্খ। এই বাহ্য শোভার মধ্যেও মৃত্যুর কদর্যতা লুকাইয়া থাকিতে পারে।

৪৯ পৃষ্ঠা। ১৫ ছত্র। "দিতে হইবে।" ইহার পরে

কি আশ্চর্য স্বার্থনাশের কথা! এরূপ কার্যপ্রণালী বর্তমান সময়ের উপযোগী কি না সে প্রশ্নের বিচার এখন করিতেছি না। কিন্তু এই নিয়মের নিঃস্বার্থতার ভাব সকলে একবার গ্রহণ করুন, এবং আপন আপন হৃদয় দিয়া তুলনায় বিচার করুন। ব্যাপারটা যে কত কঠিন তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। আমাদের মধ্যে প্রস্তাব হইয়াছে যে, যাহার মাসিক আয় ২৫৲ টাকার অল্প তাহাকে টাকা-পিছু

এক পয়সা করিয়া সমাজের জন্য দান করিতে হইবে এবং যাহাদের আয় ২৫৲ টাকার অধিক তাহাদিগকে টাকা-পিছু দেড় পয়সা করিয়া দিতে হইবে। অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায় যাহা করিয়াছে ও প্রতিদিন করিতেছে তাহার সহিত তুলনায় ইহা কিছুই নয় বলিলেও হয়, অথচ দেখা যাইবে কত সময় হস্ত ইহাতে সংকুচিত হইবে।

তুমি আমার ঢাল

৫২ পৃষ্ঠা। ২২ ছত্র। "তাঁহারা ব্রহ্মনামের ঢাল" হইতে উপদেশের শেষাংশের পরিবর্তে

জগতের লোক ইঁহাদিগকে পাগল বলিত। স্থূলদর্শী সংসারের লোক বুঝিতে পারিত না যে, ইঁহারা যাহা প্রচার করিতেছেন তাহা জয়যুক্ত হইবে। ঈশার জীবনে দেখা যায়, তাঁহাকে যখন ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাঁহার মাথায় "King of the Jews" লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। লোকে উপহাস করিয়া "মহারাজার জয়" বলিয়া প্রণাম করিয়াছিল। এ উপহাসের কারণ কি ছিল? লোকে মনে করিয়াছিল, একটা সূত্রধর-তনয় কতকগুলি জেলেমালা লইয়া আবার য়িহুদীদের রাজা হইবে! তাহারা কি বুঝিতে পারিয়াছিল যে, যীশু কেবল য়িহুদীদের নয়, কিন্তু জগতের রাজা হইবেন? লোকে তাঁহাকে বাতুল মনে করিয়াছিল। তাহা ত করিবেই। দশজনে যেমন ভাবে, যেমন করে, তেমন না করিলেই বাতুল হইতে হয়, লোকের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়।

ব্রাহ্মেরা যে লোকের বিরাগভাজন হইতেছে, লোকে যে ইহাদিগের প্রতি এত তর্জনগর্জন করে, তাহার কারণ কি? ইহারা কি লোকের সর্বনাশ করে? ইহারা কি মহারানীর বিদ্রোহী প্রজা, দেশের শত্রু? ইহারা কি পাপের উপদেশ দেয়? সোজা কথা এই— দশজনে যাহা বলে, দশজনে যাহা করে, ইহারা তাহা করে না। দশজনে বলে, বিশ্বাস থাকুক না থাকুক পুতুলপূজা কর; ইহারা তাহা করে না। দশজনে বলে, নারী-দিগকে ঘৃণিত করিয়া রাখ, বালিকাদিগকে মারিয়া ফেল; ইহারা তাহা বলে না। ইহাতে যে ব্রাহ্ম ভয় পায় সে যেন "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" এই কথা না বলে, "সত্যের জয়" না বলে— ধিক্ সেই অবিশ্বাসী ব্রাহ্মকে। বিরাগ-ভাজন ত হইতেই হইবে, তাহা পরিত্যাগ করা যাইবে না। দশজনের

মত করিতে পারিলে লোকের প্রিয় হইতে পারিতাম, কিন্তু লোকানুরাগ ত উদ্দেশ্য নয়। দশজনে যাহা করে, তাহা করিতে পারি না বলিয়াই ত বিরাগভাজন হই। যদি বল, "দশজনে যাহা করে তাহা করিতে পার না কেন"— ইহার উত্তর দিতে পারি না। সত্য বুঝিয়াছি, পরমেশ্বর এইরূপ চলিতে বাধ্য করিয়াছেন বলিয়া চলিয়াছি। প্রহার করিলে কি হইবে? নির্যাতন করিলে কি হইবে? বৃথা, বৃথা। তবে ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনী, উৎসবের দিনে তোমাদিগের পিঠে আজ ঢাল বাঁধিতে হইবে। কিসের ঢাল? ব্রহ্মনামের ঢাল। তাহাতে লেখা থাকিবে— "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারই ডাক।"

এ মন্ত্র কি লইয়াছ? না "আমার কেউ না যাক্, শুনে চলি ধরারই ডাক" এই মন্ত্র লইয়াছ? ঈশ্বর-মন্ত্র জপিতেছ, না পাপের মন্ত্র জপিতেছ? ঈশ্বরের সেবায় প্রস্তুত, না নিজের সেবায় প্রস্তুত? আমি জানি, অনেক ব্রাহ্ম কোন্ মন্ত্র জপেন— "সব থাক্, শুনে চলি ধরার ডাক। আমার যেন কোনও ক্ষতি না হয়, কেহ বিরক্ত না হয়। সহজে ধর্ম করিয়া যাই।" ইহা হবে না। হয় নাই. হইতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়। যদি ধর্ম চাও, ঈশ্বর চাও, এ কথা বলিতেই হইবে— "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারই ডাক।"

এ কথার কি উপযুক্ত হইয়াছি? ব্রাহ্মসমাজ যে মলিন হইয়াছে তাহার কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আজও যে আমরা বলিতে পারি নাই. "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারই ডাক।" আজও এ মধুর ডাক শুনিলাম না। হে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা, ঢাল বাঁধিবে কি? জগতে সংগ্রাম করিব না, ফাঁকি দিয়া, জাল টিকিট দিয়া ধর্ম করিব— হবে না, তাহা হবে না। বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট সকলে বলিতেছেন, "হবে না, হবে না।"

মফস্বলে কত ব্রাহ্ম নির্যাতন ভোগ করেন, সময়ে সময়ে হয়ত মনে করেন, "সবই কি পরমেশ্বরকে দিব? তবে যে সব যায়!" এরূপ ভাবিলে চলিবে না। আজ প্রতিজ্ঞা করিতেই হইবে। ভাই বলিয়া, আজ পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিতেছি, আজ প্রতিজ্ঞা করিতেই হইবে। প্রাণমন ঈশ্বরকে দিতেই হইবে। এস, প্রতিজ্ঞা করি। ঢাল বাঁধিতেই হইবে।

আমাদের মধ্যে কে ঢাল বাঁধিয়া দিবে? এ ঢাল মানুষ বাঁধিতে পারে না। শুনিয়াছি, স্পার্টা দেশে বীরজননীগণ বীর পুত্রদের পৃষ্ঠদেশে ঢাল বাঁধিয়া দিয়া বলিতেন, "হয় জয়ী হইও, নতুবা মরিও।" আজ মা'র কাছে যাইয়া আমরা বলি, "ঢাল বেঁধে দাও, যে যায় যাক্।" লোকে বলিবে, ইহারা বাতুল হইয়াছে, এত অল্প লোক কি করিবে? আমি বলি, ঐ ব্রহ্মকৃপার নিশান পবন-হিল্লোলে উড়িতেছে। জগৎ-জয় হইবেই হইবে। স্পার্টার জননী যেমন বলিতেন, "হয় জয়ী হইও, না হয় মরিও", জগৎ-জননী সেরূপ বলিবেন না। তাঁহার নিকট "হয়, নয়" নাই। তিনি বলিবেন, "জয়"। যত আঘাত করিবে, অমনি ঢাল ফিরাইয়া ধরিব। যত গালি দিবে, নিন্দা করিবে, ততই বলিব, "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারই ডাক।"

কি মধুর ডাক, নিরাকারের ডাক! তোমরা কি শুনিয়াছ? কি রকম ডাক? কোন্ কানে শুনা যায়? শুনিয়াছ কি? যদি না শুনিয়া থাক, অপেক্ষা কর। নিশ্চয় তিনি ডাকেন। কর্তব্য যা বুঝিব, করিব। বাহিরের চক্ষু অন্ধ করিয়া, কর্ণ বধির করিয়া, তিনি যে কর্তব্য দেখান তাহাতে ডুবিব। জগতের লোকে বলিবে, "এদের বাপ-মা কে আছ, ধর-না। এরা যে মরিল, পুড়িল।" বলিতে না বলিতে ব্রাহ্ম ব্রহ্মচরণে ডুবিল। ধন গেল, মান গেল, যশ গেল— নির্যাতন কষ্ট পেয়ে লোকগুলি গেল। ওগো যাই,

আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, ভাল ক'রে যাই। যাইতে পার নাই বলিয়াই ত সর্বনাশ হইয়াছে। আমরা যাই, ঢাল বাঁধি পিঠে— যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারই ডাক। কে আছিস, অস্ত্র নিক্ষেপ কর্। ঐ যে ব্রহ্মনামের ঢাল পিঠে বেঁধেছি, আমরা মরিব না।

এমন যদি কিছু ভিতরে থাকে, যাহার জন্য ঢাল বাঁধা যায় না, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আজ ব্রহ্ম দুই দল করিয়াছেন। কে কোন্ দলে যাবে ঠিক কর। এস, সকলে বলি, আমরা এই দলে যাইব। দেখ, জগতের দলে কত লোক, কত বি-এ, এম্-এ, রাজা, মহারাজা— ওগো ব্রাহ্ম, তোমরা ঐ দলে যাবে? এই গরিব হত-ভাগাদের দলে যাবে না? ব্রাহ্ম, যাও, যাও। এখনও হয় নাই। এখনও চক্ষু খোলে নাই। যাও, স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে থাক। আর যে ব্রাহ্ম প্রস্তুত আছ, এস ব্রহ্মের ঢালের দলে।

ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনী, চল আজ জগজ্জননীর নিকট যাই। আজ যে যাবার দিন, আজও কি যাবে না? এমন উৎসবের দিন, ভক্ত-সঙ্গ ত আর পাবে না। এমন দিনেও কি এ কথা বলবে না, "যে যায় যাক্. যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারই ডাক"? তবে যে বঞ্চিত সকলে হয়। একবার বিশ্বাসী হও, ঈশ্বরের চরণে সকলে সাহস কর। মানুষের কথায় কি সাহস হইবে, স্বয়ং জগতের রাজা বলিতেছেন। তবু বলি, ভয় পাইও না। অসহায় বলিয়া ভয় পাইও না। জ্বলুক সোনার অক্ষরে— "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারই ডাক।" তবে সকলে এই ঢাল পরি। এমন বলশালী কেহ হয় না। আজ কি মা ঢাল বাঁধিবেন না? করুণার ঢাল বাঁধিয়া জগতে প্রেরণ করিবেন না? এস, বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করি, অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি। সকলে যোগ দাও, প্রার্থনা দ্বারা ভাইএর কাজ কর।

১০ পৃষ্ঠা। ৮ ছত্রের পর

ধর্মের কথা কি লোকের কানের কাছে বলিলেই হইল? মনে করিলে এক মাসের মধ্যেই এই কলিকাতা সহরের সকল লোককে ব্রাহ্ম-ধর্মের কথা শুনাইতে পারি। ব্যাণ্ড বাজাইয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া, পাড়ায় পাড়ায় মীটিং করিয়া, কীর্তনের দল বাহির করিয়া অতি সহজেই এক মাসের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের নাম সহরের সকল লোকের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? ব্রাহ্মধর্মের কথা শুনাইলেই কি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার হইল?

১০ পৃষ্ঠা। ১৪ ছত্রের পর

দুজন লোকের মন বদলাইবার ভার দিলে আমি নাচার। এই পনর বৎসরের মধ্যে আমি ত অনেক বক্তৃতা করিয়াছি, অনেক উপদেশ দিয়াছি, ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই গিয়া ব্রাহ্মধর্মের নাম শুনাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু, ভাই রে, ক'জনের হৃদয় বদলাইয়াছি? যদি কাহারও হৃদয় বদলাইবার সাহায্য হইয়া থাকে, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, তবে মনে করি, আমার প্রচারক হওয়া সার্থক হইয়াছে। দশজন লোকের যদি হৃদয় বদলাইয়া থাকে, তবে জীবন সার্থক মনে করি। কিন্তু দশ হাজার লোক যে আমার বক্তৃতা শুনিয়াছে, তাহাতে প্রচার হয় নাই। যদি পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া, হৃদয় পরিবর্তন হওয়া প্রচার হয়, তবে দেখ, সে প্রচারক কে আছে! বক্তৃতা বেশ করিতে পারিব; আধ্যাত্মিক বিষয়ের কূট প্রশ্ন-সকল জিজ্ঞাসা কর, বেশ পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া দিব; যদি জিজ্ঞাসা কর, "যোগ কাহাকে বলে?" তবে বেশ বুঝাইয়া দিতে পারিব। কিন্তু ভাই, আমাকে

ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ

যদি জিজ্ঞাসা কর, আমার যোগ কতটা হইয়াছে, তবে যে লজ্জা পাই! ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কি কথায় হইবে? যদি দেখ যে, ব্রাহ্মধর্মের জন্য স্বার্থনাশ করিতে প্রস্তুত, ইহার জন্য কিছু stake করিতে প্রস্তুত, তবে আমি বলি, তাহা দ্বারা প্রচার হইবে। যদি নিজের স্বার্থসুখের পথটি বেশ পরিষ্কার রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে যাও, সে রকম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার হইবে না। রেখে দাও ও বক্তৃতা! স্বার্থনাশ স্বার্থনাশ, স্বার্থনাশ— ত্যাগেনৈক, ত্যাগ হইলেই হয়। ইহার দৃষ্টান্ত জগতে যথেষ্ট।

১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২ জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লোকান্তরিত হন ১৩২৬ সালের ১৩ আশ্বিন। এই সুদীর্ঘ কালের বিভিন্ন বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১১ মাঘের উপাসনায় আচার্য শিবনাথ যে-সকল উপদেশ প্রদান করেন, তাহা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইল। মাঘোৎসবের প্রধান দিবসে শিবনাথের উদ্দীপনাপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী উপাসনা ও উপদেশে কত নরনারীর প্রাণ উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, কত জীবন পরিবর্তিত হইয়াছে— আর সব বাদ দিয়াও সেই হিসাবে এই উপদেশগুলির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

বিভিন্ন সময়ে বিবৃত হওয়ার জন্য এই উপদেশগুলির বিভিন্ন স্থানে ভাবগত ও বিষয়গত পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। তাহা হইলেও প্রত্যেক উপদেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তাহাও রক্ষা করা হইয়াছে।

১৩০৮ সালে ব্রাহ্ম সাধনাশ্রম হইতে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৩০৭ পর্যন্ত প্রদত্ত উপদেশসমূহ তাহাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। বর্তমান পুস্তকের প্রথম ১২৫ পৃষ্ঠায় তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। এই সংস্করণে মূলতঃ পূর্ব সংস্করণের পাঠ অনুসৃত হইয়াছে, কেবল কয়েকটি স্থানে পুরাতন 'তত্ত্বকৌমুদী' দেখিয়া পাঠ সংশোধিত হইল।

১৩০৮ সালের ১১ মাঘ শিবনাথ উপাসনা করেন নাই। ১৩০৯ ও তৎপরবর্তী উপদেশগুলি ইতিপূর্বে কোনও গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, পুরাতন 'তত্ত্বকৌমুদী'র পৃষ্ঠা হইতে এই পুস্তকে সংকলিত হইল। 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশকালে অনেকগুলি উপদেশ অসংস্কৃত অবস্থায় মুদ্রিত হওয়ায় উহার বিভিন্ন স্থলে ভাষার অসংগতি লক্ষিত হয়। শ্রুতিকটু কয়েকটি অসংগতি এই সংস্করণে সংশোধন করা হইয়াছে। ধর্মের সম্ভাবনীয়তা, পরিত্রাতা ঈশ্বর, বর্তমান যুগ ও পারমার্থিকতা, প্রকাশ-মন্দির, প্রেমের ধর্ম, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধর্ম, উপাসনা, ধর্মের

প্রয়োগ, ধর্ম প্রাণে পাওয়া, ধর্মসাধনের চতুর্থ উপায়, নবযুগের ধর্ম— এই উপদেশগুলিতে কোনও শিরোনামা ছিল না, বর্তমান গ্রন্থে তাহা যোগ করা হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকে ১৩০৭ সালের পূর্ববর্তী কয়েকটি উপদেশ মুদ্রিত হয় নাই। বর্তমান পুস্তকের প্রথম পরিশিষ্টে পুরাতন 'তত্ত্বকৌমুদী' হইতে সেগুলি সংগৃহীত হইল। সব-কয়টির শিরোনামাই নূতন সংযুক্ত হইয়াছে। ১২৯৩ সালের ১১ মাঘ সায়াহ্নেও শিবনাথ উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উপদেশটি লিখিত হয় নাই।

প্রথম সংস্করণে প্রকাশকালে একাধিক উপদেশের 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত পাঠের বিভিন্ন অংশ, সম্ভবত স্বয়ং শিবনাথ কর্তৃক, পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কয়েকটি পরিত্যক্ত অংশ মূল্যবান্ বোধে দ্বিতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১১ মাঘ ১২৮৫। 'কৃষকের আশা' উপদেশটি উক্ত অনুষ্ঠানের পরে উপাসনায় বিবৃত হয়। ১০ মাঘ ১২৮৭ মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয়। এই বৎসরই প্রথম ১১ মাঘের উপাসনা নবনির্মিত মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়, উপদেশ— 'সমর্পণ'।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৫	ঐ রাজ্যে	ও রাজ্যে
৫	১৪	পিতা আর তাহাকে	পিতা তাহাকে আর
৬	৩	পরিজন	পরিজনগণ
১০	শেষ ছত্রের পূর্বে বসিবে :		চর-সকল ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। তিনি তাঁহার
১১	৪	প্রাঙ্গণ	প্রাঙ্গণ পর্যন্ত
১৩	১৫	ফিরিয়া	ফিরাইয়া
১৫	৯	হইল। সকলে	হইল, কেমন সুন্দর রূপ প্রকাশিত হইল। সকলে
১৫	২১	কাড়িয়া লইতে	কাড়িয়া লইলে
১৬	১০	পশ্চাৎ পশ্চাৎ	তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
৪১	৩	পাপ এত	পাপতাপ এত
৪৫	২	বলিয়াছেন	বলিতেছেন
৪৫	৬	বেড়াইতেছে	বেড়াইতেছেন
৬০	৩	জ্ঞানকর্মভ্যাং	জ্ঞানকর্মাভ্যাং
৬০	১২	জগৎতত্ত্ব	জগৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব
৬১	১৮	কূলে	কূপে
৬৪	১৫	আবেদন	আস্বাদন
৭৫	২১	তাহাতেও অপূর্ব	তাহাতেও প্রাণে অপূর্ব
৭৮	৮	মানব-সমাজ বন্ধ	মানব সমাজ-বন্ধ